কিশোর থ্রিলার
তিন গোয়েন্দা
ভলিউম ৫৩
রকিব হাসান
N172SE
সেবা
প্রকাশনী

মাছেরা সাবধান	:	৫–৫৬
সীমান্তে সংঘাত	:	৫৭–১৩০
মরুভূমির আতঙ্ক	:	১৩১–২০০

তি. গো. ভ. ২২	(চিত্রা নিরুদ্দেশ, অভিনয়, আলোর সংকেত)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ২৩	(পুরানো কামান, গেল কোথায়, ওকিমুরো কর্পোরেশন)	৪০/-
তি. গো. ভ. ২৪	(অপারেশন কক্সবাজার, মায়া নেকড়ে, প্রেতাত্মার প্রতিশোধ)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ২৫	(জিনার সেই দ্বীপ, কুকুরখেকো ডাইনী, গুপ্তচর শিকারী)	৪১/-
তি. গো. ভ. ২৬	(ঝামেলা, বিষাক্ত অর্কিড, সোনার খোঁজে)	৪১/-
তি. গো. ভ. ২৭	(ঐতিহাসিক দুর্গ, তুষার বন্দি, রাতের আঁধারে)	৪১/-
তি. গো. ভ. ২৮	(ডাকাতের পিছে, বিপজ্জনক খেলা, ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ২৯	(আরেক ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, মায়াজাল, সৈকতে সাবধান)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৩০	(নরকে হাজির, ভয়ঙ্কর অসহায়, গোপন ফর্মুলা)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৩১	(মারাত্মক ভুল, খেলার নেশা, মাকড়সা মানব)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩২	(প্রেতের ছায়া, রাত্রি ভয়ঙ্কর, খেপা কিশোর)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ৩৩	(শয়তানের থাবা, পতঙ্গ ব্যবসা, জাল নোট)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৩৪	(যুদ্ধ ঘোষণা, দ্বীপের মালিক, কিশোর জাদুকর)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩৫	(নকশা, মৃত্যুঘড়ি, তিন বিঘা)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩৬	(টক্কর, দক্ষিণ যাত্রা, গ্রেট রবিনিয়োসো)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩৭	(ভোরের পিশাচ, গ্রেট কিশোরিয়োসো, নিখোঁজ সংবাদ)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩৮	(উচ্ছেদ, ঠগবাজি, দীঘির দানো)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩৯	(বিষের ভয়, জলদস্যুর মোহর, চাঁদের ছায়া)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৪০	(অভিশপ্ত লকেট, গ্রেট মুসাইয়োসো, অপারেশন অ্যালিগেটর)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৪১	(নতুন স্যার, মানুষ ছিনতাই, পিশাচকন্যা)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৪২	(এখানেও ঝামেলা, দুর্গম কারাগার, ডাকাত সর্দার)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৪৩	(আবার ঝামেলা, সময় সুড়ঙ্গ, ছদ্মবেশী গোয়েন্দা)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৪৪	(প্রত্নসন্ধান, নিষিদ্ধ এলাকা, জবরদখল)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৪৫	(বড়দিনের ছুটি, বিড়াল উধাও, টাকার খেলা)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৪৬	(আমি রবিন বলছি, উল্কির রহস্য, নেকড়ের গুহা)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৪৭	(নেতা নির্বাচন, সি সি সি, যুদ্ধযাত্রা)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৪৮	(হারানো জাহাজ, শ্বাপদের চোখ, পোষা ডাইনোসর)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৪৯	(মাছির সার্কাস, মঞ্চভীতি, ডীপ ফ্রিজ)	৩৩/-
তি. গো. ভ. ৫০	(কবরের প্রহরী, তাসের খেলা, খেলনা ভালুক)	৩১/-
তি. গো. ভ. ৫১	(পেঁচার ডাক, প্রেতের অভিশাপ, রক্তমাখা ছোরা)	৩২/-
তি. গো. ভ. ৫২	(উড়ো চিঠি, স্পাইডারম্যান, মানুষখেকোর দেশে)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৫৩	(মাছেরা সাবধান, সীমান্তে সংঘাত, মরুভূমির আতঙ্ক)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৫৪	(গরমের ছুটি, স্বর্গদ্বীপ, চাঁদের পাহাড়)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৫৫	(রহস্যের খোঁজে, বাংলাদেশে তিন গোয়েন্দা, টাক রহস্য)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৫৬	(হারজিত, জয়দেবপুরে তিন গোয়েন্দা, ইলেট্রনিক আতঙ্ক)	৩০/-
তি. গো. ভ. ৫৭	(ভয়াল দানব, বাঁশিরহস্য, ভূতের খেলা)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৫৮	(মোমের পুতুল, ছবিরহস্য, সুরের মায়া)	৩০/-

মাছেরা সাবধান

প্রথম প্রকাশ: ২০০১

পানিতে যতটা সম্ভব দ্রুত পাক খেয়ে ঘুরে গেল মুসা। শত্রুর মুখোমুখি হলো।

বিরাট একটা প্রাণী!

'খাইছে!' চমকে গিয়ে এমন চিৎকার করে উঠল সে, মুখ থেকে ছিটকে পড়ল স্নরকেল। অক্টোপাস! প্রায় ওর সমান বড়। উঠে আসছে ধীরে ধীরে।

মাউথপীসটা ধরে এনে আবার মুখে লাগাল সে। সরে যাবার চেষ্টা করল অক্টোপাসের কাছ থেকে।

অক্টোপাসের শুঁড় গলা পেঁচিয়ে ধরল তার।

পানির মধ্যেই চিৎকার করে উঠল সে।

শুঁড়টা মানুষের হাতের মত মোটা।

গলায় প্রচণ্ড চাপ। নিচের দিকে টেনে নামাতে চাইছে ওকে।

আবার চিৎকার করে উঠল সে।

দম নেয়ার জন্যে মাথাটা পানির ওপরে তুলে আনল। মুখ উঁচু করে চিৎকার করতে গেল সাহায্যের জন্যে। স্বর বেরোল না ঠিকমত।

টের পেল, আরেকটা শুঁড় তার কোমর পেঁচিয়ে ধরছে।

পা ছুঁড়তে শুরু করল সে। লাথি মারতে লাগল পানিতে। ছুটাতে পারছে না।

টানতেই আছে শুঁড়গুলো…টানছে…টানছে…

তারপর সব কিছু কালো হয়ে গেল।

জ্ঞান হারাচ্ছে নাকি? নাহ্। অন্ধকারটা অন্য কারণে। কালি ছুঁড়েছে জানোয়ারটা। অক্টোপাসের কালি।

চোখ বন্ধ করে ফেলল সে। শরীর মুচড়ে মুচড়ে শুঁড় ছাড়ানোর চেষ্টা করল। পারল না। পেছন থেকে গায়ের ওপর জানোয়ারটা চেপে থাকায় সুবিধে করতে পারছে না সে। শুঁড়গুলো আরও জোরে চাপ দিতে লাগল ওকে।

দম আটকে যাচ্ছে তার। ফুটফুট করে বুদ্বুদ বেরোতে লাগল মুখ দিয়ে। পাগলের মত দাপাদাপি করছে ওপরে ওঠার জন্যে।

দুজনের লড়াইয়ের ফলে প্রবল আলোড়ন পানিতে। অক্টোপাসের কালিতে কালো পানি।

শুঁড়ের চাপ বাড়ছে। চাপ বাড়ছে পেটে।

দম নিতে পারছে না সে। নড়তে পারছে না।

তলিয়ে যাচ্ছি আমি! শেষ! খতম! ভাবছে।

ফুসফুস ফেটে যাওয়ার অবস্থা।

না না! আমি মরতে চাই না! অন্তত এ ভাবে নয়! অক্টোপাসটাকে ছাড়ানোর কোন না কোন উপায় নিশ্চয় আছে।

প্রচণ্ড শক্তিতে ঝাড়া দিয়ে নিজের ডান হাতটা ছাড়িয়ে নিল সে। চোখের নাগাল পাবে না। তাহলে চোখ টিপে ধরতে পারত ওটার। দেখতেই পাচ্ছে না। তবে জানোয়ারটার বেগুনী পেটটা দেখতে পাচ্ছে। কেমন অদ্ভুত। ঠিক অক্টোপাসের মত লাগছে না। তর্জনী লম্বা করে পিস্তলের মত সামনে বাড়িয়ে দিল সে।

দম ফুরিয়ে যাওয়ায় লাল-হলুদ তারা নাচতে শুরু করেছে চোখের সামনে। সময় ফুরিয়ে আসছে। যে কোন মুহূর্তে জ্ঞান হারাবে।

মনের জোর আর গায়ের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে আঙুলটা সামনে ঠেলে দিল আরও।

খোদা, কাজ যেন হয়!

আঙুলটা অক্টোপাসের পেটে লাগিয়ে কাতুকুতু দেয়া শুরু করল সে।

দুই

কাতুকুতু! কাতুকুতু!

শরীর মোচড়ানো শুরু করল অক্টোপাস।

কাতুকুতু! কাতুকুতু!

ঢিল হয়ে এল শুঁড়।

হচ্ছে! হচ্ছে! কাজ হচ্ছে! অক্টোপাসের গায়ে কাতুকুতু আছে! যদিও কারও মুখে কখনও শোনেনি এমন খবর। পদ্ধতিটা তার নিজের আবিষ্কার।

পেছনে বাঁকা হয়ে গেল জানোয়ারটার বিশাল দেহ। ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিতে চাইল মুসাকে।

দুজনেই ভেসে উঠল পানির ওপর।

'থামো, মুসা, থামো!' মুখ উঁচু করে মানুষের ভাষায় চিৎকার করে উঠল অক্টোপাস। 'হি-হি! উহ্, সহ্য হচ্ছে না আর! হি-হি!'

মুসার হাত চেপে ধরল অক্টোপাস।

ঢিল হয়ে গেল মুসার স্নায়ু।

রবিন!

মজা করছিল তার সঙ্গে।

আমি একটা গাধা! মনে মনে গাল দিল মুসা। এতটাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল, সত্যি সত্যি অক্টোপাসে ধরেছে কিনা খেয়াল করেও দেখেনি।

'আগে মনে করতাম শুধু ভূতের ভয় পাও,' হাসতে হাসতে বলল রবিন। 'এখন দেখছি অক্টোপাসকেও।'

'আসলে...আসলে...' কথা খুঁজে পাচ্ছে না মুসা।

'আসলে কি?'

'আসলে...ঠিক বোঝাতে পারব না।'

'কেন? তুমি তো সাগরকেই বেশি পছন্দ করো।'...

'এখানকার সাগরের নামে যে সব বদনাম কানে এসেছে, তাতে ভড়কে ছিলাম মনে মনে।'

'ভড়কে গেলে মরতে হয়!' উপদেশ দান করে পানিতে ডোবাডুবি শুরু করল আবার রবিন।

বোকা বানানোর খেলায় এ ভাবে হেরে তেতো হয়ে গেল মুসার মন। রবিনকে কি করে হারানো যায় ভাবতে লাগল। বুদ্ধির খেলায় ওকে হারানো সহজ হবে না। তবু!

এখানে ওরা ছুটি কাটাতে এসেছে। সেই সঙ্গে গবেষণা। জলজ প্রাণী নিয়ে গবেষণা। ছুটির শেষে স্কুলের বায়োলজি ক্লাসে জমা দিতে হবে ওদের গবেষণার রিপোর্ট।

চারপাশের সাগরের দিকে তাকাল সে। ক্যারিবিয়ান সাগরের টলটলে সবুজ পানি। কিশোরের এক অভিযানপ্রিয় বিজ্ঞানী চাচা ডক্টর হিরন পাশা, যাঁকে হিরুচাচা ডাকে ওরা, যাঁর সঙ্গে আগেও অ্যাডভেঞ্চারে অংশ নিয়েছে, তাঁর সঙ্গী হতেই এখানে এসেছে ওরা।

হিরন পাশা কিশোরের আপন চাচা নন, ওর বাবার চাচাত ভাই। বাপের একমাত্র ছেলে। ব্যবসা-বাণিজ্য করে প্রচুর টাকা কামিয়েছেন হিরুচাচার বাবা। তিনি নেই। মারা গেছেন বেশ কিছুদিন হলো। মাকে হারিয়েছেন আরও আগে। হিরুচাচার বাবা দ্বিতীয়বার বিয়ে করেননি। ছেলের জন্যে এত ধনসম্পত্তি রেখে গেছেন, কয়েক পুরুষ ধরে বসে খেলেও ফুরাবে না। কাজেই নিশ্চিন্তে অ্যাডভেঞ্চার আর বৈজ্ঞানিক কাজে আত্মনিয়োগ করার সুযোগ পান হিরুচাচা।

বর্তমানে ক্যারিবিয়ান সাগরের জলজ প্রাণী নিয়ে গবেষণা করছেন তিনি, বিশেষ করে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় মাছের ব্যাপারে তাঁর বেশি আগ্রহ। প্রায় বছরখানেক ধরে আছেন এখানে। তাঁর ভাসমান গবেষণাগারটা একটা বোট, নাম 'জলপরী'। নোঙর করে আছে একটা প্রবাল-প্রাচীরের কাছে।

হিরুচাচার গবেষণায় সাহায্য করছে তিন গোয়েন্দা, সেই সঙ্গে ছুটিতে আনন্দ।

সাঁতার কাটা, ডোবাডুবি বেশির ভাগ মুসা আর রবিনই করে। কিশোর থাকে বোটে, ল্যাবরেটরিতে সময় কাটানোটাই তার পছন্দ। জলজ প্রাণী নিয়ে গবেষণার মধ্যে অদ্ভুত এক আনন্দ পাচ্ছে সে, গোয়েন্দাগিরির চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

আজ প্রবাল দেখার জন্যে পানিতে নেমেছিল মুসা আর রবিন। আগুনের মত লাল অগ্নিপ্রবাল। কাছে গেলে ক্ষতি নেই, কিন্তু ছোঁয়া লাগলে সর্বনাশ। মুসার সেটা জানা। কারণ ভুল করে একবার এর ওপর দাঁড়িয়েছিল। ওর মনে হয়েছিল, জ্বলন্ত কয়লার ওপর পা রেখেছে।

এবার আর অসাবধান হয়নি। কাছে এসে প্রবাল আর জলজ জীবন দেখছিল মুগ্ধ হয়ে। উজ্জ্বল রঙের মাছেরা কেউ দল বেঁধে ঘুরছে, কেউ একা। বিপদের গন্ধ পাওয়া মাত্র মুহূর্তে অবিশ্বাস্য গতিতে দূরে সরে যায়, কিংবা সুড়ুৎ করে গর্তে ঢুকে পড়ে।

এই সময় রবারের বেগুনী পোশাক পরে, অক্টোপাস সেজে এসে তাকে আক্রমণ করে রবিন। শুঁড়গুলো যে ওর হাত, আতঙ্কের মধ্যে সেটাও লক্ষ করেনি মুসা। বিশেষ টিউব থেকে কালি ছুঁড়ে পানি কালো করে দিয়েছিল রবিন।

রবিনকে বোকা বানানোর বুদ্ধিটা মাথায় আসতে বোটের দিকে সাঁতরানো শুরু করল মুসা। পাশে ঝোলানো সিঁড়ি বেয়ে ডেক-এ উঠে এল। সুন্দর, মজবুত একটা জলযান। পঞ্চাশ ফুট লম্বা। বিশাল খোলা ডেক। নিচে রয়েছে গবেষণাগার, রান্নাঘর আর ঘুমানোর জন্যে কয়েকটা কেবিন।

নির্জন সাদা ডেকটা রোদে পুড়ছে। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দুপুরের কড়া রোদ।

হিরুচাচা বোটে নেই। কয়েক মাইল দূরের অন্য এক বিজ্ঞানীর জাহাজে গেছেন। দিন কয়েক থাকবেন। গবেষণার বিষয়বস্তু প্রচুর বলে এই এলাকায় বিজ্ঞানীদের বেশ আনাগোনা।

কিশোরকে দেখা গেল না ডেক-এ। নিশ্চয় গবেষণাগারে রয়েছে। গুড। তার চালাকির উপায়টা কাউকে দেখতে দিতে চায় না। বুঝে ফেললে মজা নষ্ট।

স্তূপ করে রাখা কতগুলো লাইফ জ্যাকেটের ভেতর থেকে একটা চারকোনা ধূসর রবারের বালিশ বের করল সে। ফুলিয়ে নিলে এটা ধরে ভেসে থাকা যায়। ফুঁ দিয়ে সামান্য ফুলিয়ে নিলে কোনাগুলো ঠেলে বেরোবে। পেটের নিচে খোঁচা দিলে লাগবে হাঙরের পাখনার মত।

প্রবাল-প্রাচীরের দিকে তাকাল সে। পানিতে মুখ ডুবিয়ে দেখছে রবিন। এদিকে নজর নেই। ভাল।

বালিশটা ফুলিয়ে নিয়ে নিঃশব্দে পানিতে নেমে এল মুসা। সাঁতরাতে শুরু করল। রবিনের কাছাকাছি এসে ডুবসাঁতার দিয়ে এগোল।

কয়েক মিনিট পর মাথা তুলল রবিনকে নিশানা করার জন্যে।

মাথা তুলতেই কানে এল চিৎকার।

'হাঙর! হাঙর!' বলে চেঁচাচ্ছে রবিন। নজর মুসার দিকে নয়, উল্টো দিকে।

মুসাও দেখল। হাঙরের পিঠের ত্রিকোণ পাখনা।

আসল হাঙর!

তিন

'খাইছে!' আতঙ্কিত চিৎকারটা আপনাআপনি বেরিয়ে এল মুসার মুখ থেকে।

তিমির সমান বড়!

কোথা থেকে এল? এই এলাকায় এত বড় হাঙর আছে হিরুচাচা তো বলেননি। এত বড় হাঙর যে হয় সেটাও জানা ছিল না তার।

ভেসে উঠছে ওটা। ঢেউয়ের দোলায় দুলছে। রুপালী-সাদা দেহটার দিকে তাকিয়ে হাঁ হয়ে গেল মুসা।

বিশাল চোয়াল খুলে বন্ধ করল হাঙর। ভয়ঙ্কর শব্দ হলো। ভেসে এল পানির ওপর দিয়ে।

'জলদি, রবিন! বোটের দিকে পালাও!' বলেই বালিশ ছুঁড়ে ফেলে প্রাণপণে সাঁতরাতে শুরু করল মুসা। বুকের মধ্যে পাগল হয়ে উঠল যেন হৃৎপিণ্ডটা। জোরে! আরও জোরে!—তাগাদা দিল নিজেকে।

'মুসা, তোমার দিকে যাচ্ছে!' পেছন থেকে চিৎকার করে উঠল রবিন।

ফিরে তাকাল মুসা।

বিশাল ধূসর পাখনাটা পানি কেটে তীরবেগে ছুটে আসছে।

ওটার সঙ্গে পাল্লা দেয়া সম্ভব নয়। তবু যতটা দ্রুত পারল বোটের দিকে সাঁতরে চলল দুজনে। হাঙরটা কতটা কাছে এল দেখার জন্যে ফিরে তাকাল মুসা।

ভোঁস ভোঁস করে বাতাস বেরোচ্ছে নাক-মুখ দিয়ে। পৌঁছে গেল বোটের কাছে। সিঁড়ি খামচে ধরল। রবিন এখনও আসেনি।

'আরে জলদি করো না! জলদি!' চিৎকার করে উঠল মুসা।

এগিয়ে আসছে হাঙর। কাঁচের মত স্থির কালো চোখ দুটো দেখতে পাচ্ছে মুসা। হাঁ করা মুখে করাতের দাঁতের মত সারি সারি দাঁত।

রবিন কাছে আসতেই ধাক্কা দিয়ে তাকে সিঁড়িতে তুলে দিল মুসা। তাড়াতাড়ি ওঠার জন্যে চিৎকার করতে লাগল।

সে নিজে যখন উঠল, হাঙরটা পৌঁছে গেছে তখন। চোখা নাকের ডগার গুঁতো লাগল তার পায়ে। অল্পের জন্যে হাঙরের দাঁত থেকে পা'টা বেঁচে গেল তার। বুড়ো আঙুলের কয়েক ইঞ্চি দূরে বিকট শব্দ করে বন্ধ হলো হাঙরের চোয়াল।

ডেক-এ উঠে পড়ল রবিন। ফিরে বসে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে দিল মুসাকে টেনে তোলার জন্যে।

ডেক-এ উঠে রেলিঙে ঝুঁকে নিচে তাকাল মুসা। হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক।

নাক ঘুরিয়ে চলে যাচ্ছে হাঙরটা। কিছুদূর গিয়েই গোত্তা খেয়ে ঘুরল। সাবমেরিনের মত সোজা ধেয়ে আসতে লাগল আবার বোট লক্ষ্য করে।

অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে এল মুসার মুখ থেকে।

চোখা মাথাটা দিয়ে প্রচণ্ড গতিতে বোটের পাশে গুঁতো মারল হাঙরটা।

থরথর করে কেঁপে উঠল বোট। দুলে উঠল ভীষণ ভাবে।

রেলিং আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে রইল দুজনে।

'সর্বনাশ!' চিৎকার করে বলল মুসা। 'বোট আক্রমণ করেছে!'

আবার ঘুরল হাঙর।

এগিয়ে যাচ্ছে।

ঘোরার অপেক্ষা করছে দুজনে।

কিন্তু ঘুরল না আর। পানিতে প্রবল আলোড়ন আর ঘূর্ণিপাক তুলে তলিয়ে গেল।

ডেক-এ উঠে এসেছে কিশোর। জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার?'

'হাঙর!' জানাল মুসা।

'কোথায়?' পানির দিকে তাকাল কিশোর।

শান্ত হয়ে এসেছে পানি। রোদে চকচক করছে। ছোট ছোট স্বাভাবিক ঢেউ

বাড়ি মারছে বোটের গায়ে।

অদৃশ্য হয়ে গেছে হাঙরটা।

'কই?' পানির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'কিছুই তো দেখছি না।'

'ছিল,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রবিন। 'মস্ত একটা হাঙর। তাড়া করেছিল আমাদের। বোটের গায়ে গুঁতো মেরেছিল।'

'হাঙর?' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কিশোর। 'হাঙরে তো এ ভাবে বোট আক্রমণ করে শুনিনি। তা ছাড়া জলপরীর মত এতবড় বোটকে ওভাবে দুলিয়ে দেয়াটা সোজা কথা নয়।'

'বললাম না বিশাল!' রবিন বলল। 'সাধারণ হাঙরের দশ গুণ বড়!'

'না না, বিশ গুণ!' মুসা বলল। 'তিমির সমান।'

নিচের ঠোঁট কামড়াল কিশোর। গাল চুলকাল। 'কিন্তু ক্যারিবিয়ানে এত বড় হাঙর আছে, শুনিনি তো কখনও। ক্যারিবিয়ান কেন, পৃথিবীর কোন অঞ্চলেই তিমির সমান হাঙর নেই।'

'তাহলে এটা এল কোত্থেকে?' কিশোরের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল মুসা। রবিনের দিকে ফিরল, 'রবিন, তুমি দেখেছ না? হাঙরই তো ছিল, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন, 'কোন সন্দেহ নেই তাতে।'

'চলো, নিচে,' কিশোর বলল। 'আমার কাছেও চমকে দেয়ার মত খবর আছে। ল্যাবরেটরিতে চলো, নিজের চোখেই দেখবে।'

কিশোরকে অনুসরণ করে নিচের ডেক-এ গবেষণাগারে নেমে এল মুসা ও রবিন।

এক কোণে রাখা বড় ট্যাংকের মত একটা বড় অ্যাকুয়ারিয়াম। তাতে কুকুরের সমান বড় একটা রূপালী মাছের দিকে হাত তুলল কিশোর।

চোখ বড় বড় হয়ে গেল রবিনের। 'এমন মাছ তো জীবনে দেখিনি!'

'আমিও না,' জবাব দিল কিশোর। 'কি করে যে ট্যাংকের মধ্যে গজিয়েছে, খোদাই জানে!'

বলে কি! এ তো ভুতুড়ে কাণ্ড! ট্যাংকের মধ্যে চক্কর দিতে থাকা মাছটা চেনা চেনা লাগছে মুসার, কিন্তু চিনতে পারছে না। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন: এল কোন্‌খান থেকে ওটা?

'কিছুই বুঝতে পারছি না আমি,' যেন মুসার মনের কথা পড়তে পেরে বলল কিশোর। 'তোমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে, ভূতের কারসাজি। এ রকম চেহারার এত বড় মাছ জীবনেও দেখিনি। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় মাছের ওপর লেখা যতগুলো বই পেয়েছি হিরুচাচার লাইব্রেরিতে,' টেবিলে রাখা বইয়ের স্তূপের দিকে আঙুল তুলল সে, 'সব ঘেঁটে দেখেছি। কোথাও ওটার কথা লেখা নেই। তবে,' একটা বই টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগল সে।

বইটার নাম পড়ে রবিন বলল, 'এটাতে তো সব ছোট জাতের মাছের কথা লেখা।'

'মজাটা তো সেখানেই,' ওল্টানো বন্ধ করল না কিশোর। একটা পাতায় এসে থামল।

একটা মাছের রঙিন ফটোগ্রাফ।

তাতে টোকা দিল কিশোর, 'দেখো, প্রচুর মিল।'

চার

বইটা টেবিলে চিত করে বিছিয়ে তিনজনেই তাকিয়ে রইল ছবিটার দিকে। ছবি দেখে মনে হচ্ছে অবিকল ট্যাংকের মাছটাই। কিন্তু ছবির নিচে ক্যাপশন: গ্রীষ্মমণ্ডলীয় মিনো, এক ইঞ্চি লম্বা।

'মিনো!' বিশ্বাস করতে পারছে না রবিন। 'অসম্ভব!'

ট্যাংকের দিকে তাকাল আবার মুসা। ট্যাংকের মাছটা প্রায় চার ফুট লম্বা।

'দেখি, দাও তো?' কিশোরের হাত থেকে বইটা নিয়ে মিলিয়ে দেখতে চলল রবিন। ট্যাংকের কাছে এসে দাঁড়াল।

তার পেছনে এসে দাঁড়াল মুসা আর কিশোর।

'আমি দেখেছি,' কিশোর জানাল। 'ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে পরীক্ষা করেছি ছবিটা।'

'তাই তো! সব এক!' বিড়বিড় করতে লাগল রবিন। 'আঁশ...আঁশের রেখা...দাগ! কিন্তু মিনো...মিনো এত বড় হয় কি করে? গোল্ডফিশ আর মিনোর মধ্যে তফাৎ হলো...।'

গোল্ডফিশ!

'খাইছে!' চিৎকার করে উঠল মুসা। 'আজ সকালে খাবার দিতে ভুলে গেছি ওগুলোকে।'

নিজের কেবিনে দুটো গোল্ডফিশ পুষছে মুসা। মিঠা পানির মাছ। আসার সময় কিনে নিয়ে এসেছিল।

মনে পড়তেই দৌড় দিল মুসা। সারি সারি কাঁচের বোতলে বোঝাই কেবিনেটটার কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল। বোতলগুলোতে বাদামী রঙের ঘোলাটে তরল। প্ল্যাঙ্কটন। মাছ আর বহু জলজ প্রাণীর প্রিয় খাবার। প্রবাল-প্রাচীরের কাছের প্ল্যাঙ্কটন বেড থেকে নমুনা হিসেবে তুলে এনে বোতলে ভরে রেখেছেন হিরুচাচা।

কি ভেবে একটা বোতল তুলে নিল মুসা। দেখতে চায়, মিঠা পানির মাছ এ জিনিস পছন্দ করে কিনা।

প্যাসেজওয়ে ধরে হেঁটে এসে দাঁড়াল নিজের কেবিনের সামনে।

বন্ধ দরজার পাল্লা ঠেলে খুলে মাছগুলোর উদ্দেশে বলল সে, 'অ্যাই যে, খুদে বন্ধুরা, আর কোন চিন্তা নেই। নতুন খাবার নিয়ে এসেছি তোমাদের জন্যে।'

গোল পাত্রটায় ঘুরে বেড়াচ্ছে দুটো ঝলমলে গোল্ডফিশ। পাত্রের তলায় শুঁড় বের করে দিয়ে অলস ভঙ্গিতে পিছলে হাঁটছে একটা ছোট শামুক। ওটা দারুণ মনে সাগর থেকে তুলে এনে রেখে দিয়েছে মুসা।

বোতল খুলে খানিকটা প্ল্যাঙ্কটনের সুপ পাত্রের মধ্যে ছেড়ে দিল মুসা। পরিষ্কার

পানিতে বাদামী ধোঁয়ার মত ছড়িয়ে পড়তে লাগল প্ল্যাঙ্কটন।

মুহূর্তে ওপরে ভেসে উঠে তাতে ঠোকর মারতে শুরু করল একটা গোল্ডফিশ। অন্যটাও এসে যোগ দিল প্রথমটার সঙ্গে। খাবার নিচে নামার অপেক্ষা করছে শামুকটা।

মাছ, শামুক, দুটোরই পছন্দ হয়েছে এ খাবার। মুচকি হেসে বেরিয়ে এল কেবিন থেকে।

ল্যাবরেটরিতে ঢোকার সময় কানে এল কিশোরের কথা, 'কিছু একটা নিশ্চয় ঘটছে এই এলাকায়,' রবিনকে বলছে সে। 'অদ্ভুত কোন কিছু!'

পাঁচ

পরদিন সকাল। ডেক-এ বেরিয়ে এসেছে মুসা আর রবিন। কিশোর গবেষণাগারে। মিনোটাকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে।

ডেক-এ কড়া রোদ। গরমকালে ক্যারিবিয়ানে ভীষণ গরম পড়ে। মাথা ধরে যাচ্ছে মুসার।

না, ভাল লাগছে না মোটেও। সাঁতারের পোশাক টেনে নিয়ে পরতে আরম্ভ করল সে। প্রবালের রাজ্যে ঘুরে আসাটা বরং অনেক আনন্দের। গরমের অত্যাচার থেকেও বাঁচা যাবে।

মাস্ক আর স্নরকেল মুখে লাগিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল মুসা।

'যাচ্ছই তাহলে?' রবিনের প্রশ্ন।

রবিনের ভয়টা কোনখানে বুঝতে পারছে মুসা। 'হ্যাঁ। যা গরমের গরম, একটা সেকেন্ড আর বোটে থাকতে পারছি না আমি।'

'আমিই বা বসে থাকি কেন? চলো, আমিও যাই।' সাঁতারের পোশাক টেনে নিয়ে পরতে আরম্ভ করল রবিন।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে কয়েক ফুট ওপর থেকে লাফ দিয়ে পড়ল মুসা। রবিন নামল তার পাশে।

'নামাটা বোধহয় উচিত হলো না,' রবিন বলল। 'হাঙরটা যদি কাছাকাছি থাকে?'

'অকারণে ভয় পাচ্ছ,' জবাব দিল মুসা। 'কালকের পর আর একবারও দেখিনি ওটাকে। ভয় নেই। খারাপ কিছু ঘটবে না আজ।'

'তুমি কি করে জানলে?'

'জানি। মন বলছে।'

এটা কোন যুক্তি হলো না, জানে রবিন। তবু প্রতিবাদ করল না আর। রোদ ঝলমলে সকাল। সাগরের পানি লেকের পানির মত শান্ত। এমন দিনে কি আর ঘটবে? নিজেকে বোঝাল সে।

রোদ চকচকে পানি কেটে সাঁতরে চলল দুজনে। পানিতে মুখ ডোবালেই নানা রকম মাছ চোখে পড়ছে।

পানিতে মাথা ডোবানোর পর রবিন আরেকবার মাথা তুলতেই 'হাঙর! হাঙর!' বলে চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

চমকাল না রবিন। মুসা তাকে ভয় দেখাচ্ছে বুঝতে পেরে হাসল। আলতো চাটি মারল মুসার মাথায়।

হাসাহাসি করতে করতে এগিয়ে চলল ওরা। মাঝে মাঝে মাথা উঁচু করে দিগন্তের দিকে তাকায়। হাঙরের পাখনা চোখে পড়েনি এখন পর্যন্ত।

ডুব দিল দুজনে। কমলা-সবুজ এক ধরনের ছোট মাছের ঝাঁক প্রায় ছিটকে ছিটকে সরে যাচ্ছে এদিক ওদিক, মনে হচ্ছে যেন টলটলে পানিতে রোদের কণা ছিটাচ্ছে। মাছগুলোকে অনুসরণ করে প্রবাল-প্রাচীরের কাছে চলে এল ওরা।

কি সব চেহারা প্রবালের, আর কি তার রঙ! অপূর্ব! গাঢ় লাল রঙের একটা প্রবালের টিলার চারপাশ ঘিরে অলস ভঙ্গিতে সাঁতার কাটছে নানা রকম মাছ।

পানির ওপর দিয়ে চুইয়ে নামছে যেন সূর্যালোক। টিলার চূড়াটাকে লাগছে রূপকথার দুর্গের মত।

গর্ত থেকে বেরিয়ে এল ছোট একটা কাঁকড়া। দুই ডুবুরিকে দেখে সুড়ুৎ করে ঢুকে গেল আবার গর্তে।

হলুদ মাছের ঝাঁক ওপরে উঠে যাচ্ছে। পানির ওপরিভাগে ভাসমান প্ল্যাঙ্কটনের বেড ওদের লক্ষ্য। সেই জিনিস, যেগুলো বোতলে ভরে রেখেছেন হিরুচাচা।

তাকিয়ে আছে মুসা। মাছগুলো ঠোকরানো শুরু করেছে। ওর গোল্ডফিশটার মত।

কিছুক্ষণ পর ভেসে উঠে মুখ থেকে স্নরকেলটা খুলে ফেলল সে।

'রবিন?'

দেখতে পেল না ওকে।

আবার ডাকল, 'রবিন!'

প্রবাল-প্রাচীরের অন্য পাশে পানিতে দাপাদাপি চোখে পড়ল তার।

রবিনের ফ্লিপারটাও পলকের জন্যে চোখে পড়ল বলে মনে হলো। নড়ে উঠে ডুবে গেল।

মুসাও সাঁতরে গেল ওদিকটায়। পানির নিচে রবিনকে দেখতে পেল। মনে হচ্ছে কোন কিছুর দিকে নজর রেখেছে সে। ফ্লিপার নেড়ে সাঁতরে সরে যাচ্ছে দ্রুত।

পানির তলায় চিৎকার করে লাভ নেই। শুনতে পাবে না রবিন।

এত মনোযোগ দিয়ে কি দেখছে সে?

কাছে আসতে রবিনের অন্যপাশে এক টুকরো মেঘের মত কি যেন ভাসতে দেখল মুসা।

সাগরে কত নেমেছে, কিন্তু এ রকম জিনিস কখনও চোখে পড়েনি।

রবিনের চোখ অন্যদিকে। ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে বিচিত্র মেঘটার দিকে। দেখতে পায়নি ওটাকে।

মুসাকে আতঙ্কিত করে দিয়ে হঠাৎ নড়ে উঠল ওটা। এগিয়ে আসতে লাগল রবিনের দিকে। হালকা গোলাপী রঙ। নরম রবারের মত দেহ।

মুসার চোখের সামনে ছড়িয়ে বড় করে ফেলতে লাগল দেহটা। গোলাপী রঙের

একটা প্যারাশুটের মত। বিশাল।

জিনিসটা কি? কোনমতেই চিনতে পারছে না মুসা। ঘুরল রবিন। এখনও কি দেখেনি?

'রবিন!' চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করল মুসার। 'সরে এসো! বিপদ!'

কিন্তু লাভ নেই। পানির নিচে চিৎকার করার কোন মানে হয় না।

সাঁতরাতে শুরু করল মুসা। পানিতে লাথি মারছে ইচ্ছে করে। দাপাদাপি করে এগোচ্ছে, যাতে ফিরে তাকায় রবিন। ইঙ্গিতে তখন সাবধান করতে পারবে তাকে।

কিন্তু তাকাল না রবিন। নিচের দিকে তাকিয়ে কি যে দেখছে সে, সে-ই জানে। সরতে সরতে গিয়ে পড়ল গোলাপী জিনিসটার গায়ে।

চোখের পলকে আলখেল্লার মত তাকে জড়িয়ে ফেলল গোলাপী জীবটা।

পুরো ঢেকে দিতে চাইল নিজের শরীর দিয়ে।

ছয়

আতঙ্কিত একটা মুহূর্ত। স্থির, স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে মুসা।

হঠাৎ বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন তার দেহে। মাস্কটা টান দিয়ে খুলে ফেলে সাঁতরে চলল রবিনের দিকে।

রবিনকে ঢেকে ফেলেছে গোলাপী জিনিসটা। কিন্তু কাঁচের মত স্বচ্ছ বলে তার দেহের ভেতর দিয়েও ছটফট করতে দেখা গেল রবিনকে। নিজেকে মুক্ত করতে চাইছে রবিন।

এ কোন জন্তুরে বাবা! অবাক হয়ে গেছে মুসা। কি হতে পারে?

ঢোক গিলল সে।

গুলিয়ে উঠল পেটের মধ্যে।

মাথা নিচু করে ডাইভ দিল। লক্ষ্য গোলাপী গোলকটার জোড়াটা, রবিনকে গিলে নেয়ার জন্যে দুদিক থেকে এসে যেখানে মিলিত হয়েছে দুটো ধার।

মুক্ত করার একটাই উপায় দেখতে পেল সে। তার নিজেরও ওটার মধ্যে ঢুকে যাওয়া।

প্রথমে হাতটা ঢুকিয়ে দিল সে। তারপর মাথা লাগিয়ে ঠেলতে শুরু করল ভেতরে।

মুখে লাগছে পিচ্ছিল দলা দলা পদার্থ। লাল শিরাগুলোর ঘষা লেগে চামড়া খসখসে হয়ে যাচ্ছে।

দম বন্ধ করে ঠেলেঠুলে রবিনের পায়ের কাছে হাত আর মাথাটা নিয়ে গেল সে। হাত আরেকটু ঢোকাতে পারলে ওর পা চেপে ধরে হয়তো টেনে বের করে আনা সম্ভব হবে।

নাড়ির মত দপদপ করছে গোলকটা। শোষণ করে নেয়ার মত ভেতরের দিকে টানছে।

ফুসফুস ফেটে যাওয়ার উপক্রম হলো তার। দম আর রাখতে পারবে না বেশিক্ষণ।

ঠেলে দিচ্ছে হাত। আরও! আরও!

হ্যাঁ। হয়েছে। রবিনের ফ্লিপার ঘিরে চেপে বসল তার আঙুল।

টান দিল। জোরে।

আরও জোরে।

নড়তে আরম্ভ করল রবিন।

উঁহু!

হচ্ছে না!

রবিনকে নড়াতে পারল না। টানের চোটে ওর ফ্লিপারটা খুলে চলে এল।

ওটা ছেড়ে দিয়ে আরও ওপরে হাত বাড়াল সে। রবিনের পা চেপে ধরে টান দিল।

কিন্তু এবারও নড়াতে পারল না রবিনকে।

আঠাল গোলাপী বস্তুটা ঘিরে ফেলল দুজনকেই। মুসার মনে হচ্ছে, বাতাসের অভাবে ভেতরটা ফেটে যাবে তার।

জিনিসটা কি এখন আর বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না মুসার। জেলিফিশ। ক্রমেই চেপে নিজের দেহ আরও শক্ত করে আনছে ওটা।

চাপ দিয়ে মেরে ফেলার ইচ্ছে দুজনকে।

নড়তে পারছে না মুসা। মগজ চলছে তীব্র গতিতে।

কি করে বেরোবে? ছুটবে কি ভাবে?

কোন পথ নেই। শেষ হয়ে যাচ্ছে ওরা।

জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে যে কোন মুহূর্তে। আর একটা সেকেন্ডও বাতাস ছাড়া বাঁচতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না···

হঠাৎ চাপ শিথিল করে ফেলল জেলিফিশ। ভয়ঙ্কর একটা শব্দ করে আলাদা হয়ে গেল আলখেল্লার ঘের।

খুলে গেছে।

একটা সেকেন্ড সময় নষ্ট না করে বেরিয়ে এল মুসা। রবিনকে টেনে নিয়ে উঠতে শুরু করল।

ভুস করে ভেসে উঠল পানির ওপরে। হাঁ করে বাতাস টানতে লাগল।

বাঁচা গেল!

হাঁ করে ঢোক গিলছে। বাতাস খাচ্ছে। আহ্! বাতাস যে কি মিষ্টি!

বেগুনী হয়ে গিয়েছিল রবিনের মুখ। আবার রঙ ফিরতে শুরু করল গালে।

'কেমন লাগছে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

মাথা ঝাঁকিয়ে বুঝিয়ে দিল রবিন, ভাল। দম নিতে ব্যস্ত এখনও।

'সত্যি? কথা বলতে পারবে?'

মাথা ঝাঁকাল আবার রবিন। 'হ্যাঁ। এত ভাল জীবনে লাগেনি।'

'কিন্তু ঘটনাটা কি?' নিজেকেই প্রশ্ন করল মুসা। 'জেলিফিশটা আমাদের ছেড়ে দিল কেন?'

পানিতে মুখ নামাল আবার সে। পরিষ্কার পানিতে দেখতে পেল ওদের কয়েক ফুট নিচে ভাসছে জেলিফিশটা। ওদের কথা যেন বেমালুম ভুলে গেছে।

মস্ত আরেকটা জেলিফিশকে ওটার কাছে দেখা গেল। পানিতে ডানার মত ছড়িয়ে দিল নিজের শরীরটা। প্রথম জেলিফিশটাকে ধরার চেষ্টা করল।

প্রথমটাও কম বড় না। বিনা লড়াইয়ে আত্মসমর্পণ করার কোন ইচ্ছে নেই। বাধা দিল। ছটাৎ করে শব্দ হলো, ডানায় ডানায় চাপড় লাগার। ধাক্কার চোটে এত জোরে পানিতে আলোড়ন উঠল, পেছনে ছিটকে পড়ল মুসা আর রবিন।

আবার যখন মুখ নামাল মুসা, দেখতে পেল ধস্তাধস্তি করছে দুটোতে। জড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করছে একে অন্যকে। চাপড় লাগছে। শরীর বাঁকাচ্ছে। নিজের দেহে ঢুকিয়ে ফেলতে চাইছে অন্যকে। আস্ত গিলে ফেলতে চাইছে।

আবার চাপড়। আবার।

পানিতে ঘূর্ণিপাক শুরু হলো। সেই সঙ্গে প্রবল আলোড়ন।

একে অন্যের আকর্ষণ থেকে টান মেরে সরে গিয়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল।

'এখানে থাকা আর নিরাপদ না,' চিৎকার করে বলল মুসা। 'কোন ভাবে ওই দুটোর মাঝখানে পড়ে গেলে দেখতে হবে না আর।'

ওপরেও আবহাওয়া বদলে গেছে হঠাৎ করে। প্রবল বাতাস .ইছে। বড় বড় ঢেউ।

সাঁতরাতে শুরু করল ওরা। ঢেউয়ের দোলার মধ্যে সাঁতরানোও কঠিন।

সাদা ফেনায় ভরে গেছে পানি। নিচে তাকিয়ে জেলিফিশ দুটোকে দেখার অবস্থা নেই আর। কিন্তু লড়াই যে চলছে অনুভব করতে পারছে ওরা।

মস্ত আরেকটা ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল গায়ে। ফিরে তাকাল মুসা। রবিনকে দেখতে পেল না।

গেল কোথায়!

ফেনার মধ্যে পাগলের মত খুঁজে বেড়াতে লাগল ওকে মুসার চোখ।

আবার তলিয়ে গেল নাকি?

আবার একটা ঢেউ ভেঙে পড়ল মাথার ওপর।

মাথা তুলে চিৎকার করে উঠল মুসা, 'রবিন, কোথায় তুমি?'

ভেসে উঠল রবিনের মাথা। মুখ দিয়ে ফুচুৎ ফুচুৎ করে পানি মেশানো বাতাস ছাড়ল। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। হাত চেপে ধরে ওকে ভাসিয়ে রাখার চেষ্টা করল মুসা। একই সঙ্গে লড়াই চালিয়ে গেল ঢেউয়ের সঙ্গে।

কয়েক মিনিট পর ক্লান্ত ভঙ্গিতে বোটের ডেক-এ নিজেদের টেনে তুলল ওরা।

'অদ্ভুত কাণ্ড!' ডেক-এ গড়িয়ে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রবিন। 'এতবড় জেলিফিশ তো জন্মেও দেখিনি! জানতামই না এমন বড় হয়।'

'কিশোরকে বলিগে, চলো।'

সিঁড়ি বেয়ে ল্যাবরেটরিতে নেমে এল দুজনে। কিশোরকে দেখতে পেল না।

'কিশোর?' চিৎকার করে ডাকল মুসা। 'কোথায় তুমি?'

'আমি রান্নাঘরে দেখে আসি,' রবিন বলল।

মুসা চলল কেবিনে দেখতে। না। নেই। ছোট্ট কেবিনটা খালি।

'রান্নাঘরে নেই,' ডেকে বলল রবিন। 'কোনখানেই তো দেখছি না।'

'কিশোর! কিশোর! কোথায় তুমি?' চিৎকার করে ডাকতে লাগল মুসা।

জবাব এল না।

কেঁপে উঠল রবিনের বুক। প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে।

ঢোক গিলে কোনমতে বলল মুসা। 'ও…ও তো উধাও!'

সাত

পেটের মধ্যে খামচি দিয়ে ধরল মুসার। গুরুটা হলো কি!

কিশোর গায়েব! হিরুচাচাও নেই। সাগরের মাঝখানে একটা ছোট্ট বোটে সে আর রবিন একা।

'কি করব এখন?' কাঁপা গলায় ফিসফিস করে বলল মুসা।

'আতঙ্কিত হওয়া চলবে না,' জবাব দিল রবিন। কিন্তু তার গলাও কাঁপছে। 'মগজ খাটাও। কোথায় যেতে পারে ও? কি কাজে? হয়তো আমাদের মতই গরম লাগছিল বলে সাঁতার কাটতে নেমেছে সাগরে।'

'সাঁতার? উঁহু,' মাথা নাড়ল মুসা। 'তাহলে দেখতে পেতাম।'

'উল্টো দিক দিয়ে যদি নেমে থাকে?' চঞ্চল হয়ে দৃষ্টি ঘুরে বেড়াচ্ছে রবিনের। শান্ত থাকার চেষ্টা করছে। 'কিংবা নৌকা নিয়েও বেরোতে পারে। নৌকাটা আছে কিনা দেখে আসি চলো। এমনও হতে পারে, আমাদের দেরি দেখে খুঁজতে গেছে।'

'তাই তো! চলো, দেখে আসি।'

তাড়াহুড়া করে ডেক-এ উঠতে শুরু করল মুসা। মুঠি শক্ত হয়ে গেছে।

ডেক-এ নৌকাটা না থাকলে আশা আছে। ধরে নেয়া যেতে পারে, ভালই আছে কিশোর।

কিন্তু যদি নৌকাটা ডেক-এ জায়গামতই বাঁধা থাকে, আর কিশোর বোটে সত্যি না থাকে…

তাহলে কি?

ডেক-এ উঠে নৌকাটা যেখানে থাকে সেখানে দৌড়ে এল মুসা।

সর্বনাশ! দম বন্ধ হয়ে এল তার।

আছে নৌকাটা। নিয়ে বেরোয়নি কিশোর।

'মুসা, আমার ভয় লাগছে,' ফিসফিস করে বলল রবিন।

ভয় মুসারও লাগছে। কিন্তু স্বীকার করল না। বিপদের সময় এখন মাথা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

'প্রতিটি কেবিনে, বোটের প্রতিটি ইঞ্চি জায়গা খুঁজে দেখব আগে, চলো,' মুসা বলল। 'বাথরুমেও যেতে পারে। আমাদের ডাক হয়তো শুনতে পায়নি।'

মুসাকে অনুসরণ করে সিঁড়ি বেয়ে আবার নিচের ডেক-এ নামতে শুরু করল রবিন। রেলিং ধরে নামছে। অর্ধেক নেমেছে, হঠাৎ থরথর করে কাঁপতে শুরু করল

রেলিংটা।

'কি করছ?' ফিরে তাকাল মুসা।

'কই, আমি কিছু করছি না,' জবাব দিল রবিন। 'নিজে নিজেই কাঁপছে।'

পুরো সিঁড়িটাই কাঁপতে আরম্ভ করল এরপর।

হচ্ছেটা কি? লাফ দিয়ে সিঁড়ির গোড়ায় নেমে পড়ল মুসা।

দুলে উঠে কাত হয়ে গেল বোটটা।

খপ করে রেলিং ধরে ফেলল আবার মুসা। নইলে পড়ে যেত।

'খাইছে!' চিৎকার করে উঠল সে। 'ভূতের আসর হলো নাকি!'

'ভূমিকম্প! ভূমিকম্প!' মুসা বলল।

'ভূমিকম্প হয় কি করে?' মনে করিয়ে দিল রবিন। 'পানিতে রয়েছি আমরা। পানিতে ভূমিকম্প টের পাওয়া যায় না।'

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে পড়ল ওরা। আরও কাত হয়ে গেল বোট। কেবিনের দেয়ালে গিয়ে জোরে ধাক্কা খেল দুজনে।

ল্যাবরেটরি পেরিয়ে এল। কেবিনেটে প্লাঙ্কটনের বোতল ঠোকাঠুকির ঝনঝন শব্দ হলো। আলগা যা কিছু আছে সব নড়ছে। শব্দ হচ্ছে। রান্নাঘর থেকে কাঁচ ভাঙার শব্দ ভেসে এল।

প্যাসেজ দিয়ে নিজের কেবিনের কাছে চলে এল মুসা। কিন্তু ঢুকতে পারল না। রাস্তা বন্ধ।

'খাইছে রে!' বলে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল সে। 'ওই দেখো!'

দৌড়ে এল রবিন। 'কই?'

দেখতে পেল। দৈত্য! নাকি দানব!

দরজা আগলে রয়েছে মস্ত একটা প্রাণী। চকচকে, কালো, মসৃণ দেহ। পিঠটা গোলাকার। সাদা ঘন এক ধরনের জঘন্য আঠাল পদার্থের ওপর বসে রয়েছে।

এ রকম জীব কখনও দেখেনি আগে।

না কথাটা ঠিক না। দেখেছে কোথাও। পরিচিত লাগছে।

'কি-কি-ক্কি ওটা?' তোতলানো শুরু করেছে রবিন।

নড়ে উঠল দানবটা। ঝাঁকি খেল দেহ।

মাথাটা বেরিয়ে এল। লম্বা, ধূসর, রস গড়ানো, বিশাল এক পোকার মত। লম্বা লম্বা দুটো অ্যান্টেনার মত শুঁড় বেরিয়ে আছে মাথা থেকে।

'মুসা...' মুসার হাত আঁকড়ে ধরল রবিন, 'আমার মনে হয় ওটা শামুক!'

'তাই তো,' বিস্ময়ের ধাক্কাটা হজম করতে সময় লাগল মুসার। 'শামুকই। দানব শামুক।'

'বোটে এল কি করে?'

'আমারও তো সেই প্রশ্ন। এত বড়ই বা হলো কি করে? পুরো প্যাসেজটা জুড়ে রয়েছে।'

ধীরে, অতি ধীরে আঠা আঠা পিচ্ছিল পদার্থ লেগে থাকা মাথা উঁচু করল প্রাণীটা। বড় বড় বিষণ্ন, টলটলে চোখ মেলে ওদের দিকে তাকিয়ে গুঙিয়ে উঠল।

'বের করো! তোলো আমাকে!' ককানো শোনা গেল।

আট

মুসার হাত খামচে ধরল রবিন। নখ বসে যাচ্ছে মুসার হাতে। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে শামুকটার দিকে।

আতঙ্কিত হয়ে পড়ল মুসা। 'আরি, আবার কথাও বলে!'

'আরে, কি হলো? তোলো না!' বলে উঠল শামুকটা।

ভূত কিনা ভাবছে মুসা। দৌড় দেয়ার জন্যে প্রস্তুত।

'আরে, ভুতুড়ে কিছু না!' আবার বলে উঠল শামুকটা। 'তোলো, তোলো জলদি!'

দম আটকে যাওয়ার জোগাড় হলো দুই গোয়েন্দার।

ব্যাপারটা প্রথমে মাথায় ঢুকল রবিনের। এ ভাবে ভড়কে না গেলে প্রথমবার কথা শুনেই বুঝে যেত। কিশোরের কণ্ঠ। কি সর্বনাশ! তবে কি শামুক হয়ে গেছে কিশোর পাশা!

'আটকা পড়েছি আমি। শামুকটার নিচে,' আবার বলল কিশোর। 'শ্বাস নিতে পারছি না। জলদি বের করো। তোলো! তোলো!'

শামুকটার নিচে দুর্বল ভঙ্গিতে হাত নড়তে দেখল এতক্ষণে মুসা। হাতটা প্রায় ঢেকে রয়েছে শামুকের দেহনিঃসৃত সাদা ঘন আঠাল পদার্থে।

'বাপরে বাপ কি ঘন!' বলে উঠল মুসা। 'একেবারে শেভিং ক্রীম।'

'আরে কথা তো পরেও বলতে পারবে!' কিশোর বলল। 'নাকে ঢুকতে শুরু করেছে এগুলো। মরে যাব তো!'

'কিন্তু কি করব?' কিশোরকে নয়, নিজেকেই প্রশ্নটা করল রবিন। 'কি ভাবে বের করব?'

জবাব দিল না কিশোর।

'নাকের ফুটো বন্ধ হয়ে গেলে সর্বনাশ হবে,' মুসা বলল। 'দম আটকে মরবে ও।'

বিশাল শামুকের খোলসটার নিচ থেকে বেরিয়ে এল গোঙানির শব্দ।

'জলদি করা দরকার,' তাগাদা দিল রবিন।

'আমি শামুকটাকে কাত করছি,' মুসা বলল। 'তুমি ওকে টেনে বের করে নিয়ে আসবে।'

'আচ্ছা।'

আবার গুঙিয়ে উঠল কিশোর।

'একটু রাখো, বের করছি,' মুসা বলল।

শামুকটাকে ঠেলতে আরম্ভ করল সে। অসম্ভব ভারী। সামান্যতম নড়ল না।

'জোরে ঠেলো। আরও জোরে।' ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বলল রবিন। দুই হাত বাড়িয়ে রেখেছে টেনে বের করে আনার জন্যে।

নিচু হয়ে কাঁধ লাগিয়ে ঠেলতে লাগল মুসা। তা-ও নড়ানো গেল না শামুকটাকে।

'দাঁড়াও দাঁড়াও,' রবিন বলল। 'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। ওই শামুকের আঠা।'

'তাতে কি?'

'ওটাই আমাদের সাহায্য করবে।' শামুকটার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল রবিন। 'কাত করা যখন যাবে না, বরং ওই আঠার ওপর দিয়ে পিছলে সরানোর চেষ্টা করতে হবে।'

শামুকের নিচে বিচিত্র শব্দ করছে কিশোর। মুখে ঢুকে গেছে নিশ্চয় আঠা, গলায় চলে যাচ্ছে।

পেট গুলিয়ে উঠল রবিনের। উঁক উঁক করে বমি ঠেকাল।

পেছন থেকে শামুকের খোসায় দুই হাত রেখে দাঁড়াল দুজনে। ঠেলা মারতে হবে। চিৎকার করে রবিন বলল, 'রেডি, ওয়ান, টু, থ্রী!'

গায়ের জোরে ঠেলতে শুরু করল দুজনে। সামান্য নড়ল এবার শামুকটা।

'আরও জোরে!···হেঁইও!'

ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে শামুকটা। বেরিয়ে আসছে কিশোরের দেহ। জোরে একটা শেষ ঠেলা মারতেই পুরো সরে গিয়ে ধুপ করে মেঝেতে বসল শামুকটা।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল কিশোর। আপাদমস্তক সাদা হয়ে আছে শামুকের আঠায়।

কেশে উঠল সে। মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল আঠার দলা। মুখ বিকৃত করে বলল, 'উঁহু, গন্ধ!'

'কি হয়েছিল, কিশোর?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

আঙুল দিয়ে চোখ থেকে আঠা সরাল কিশোর। 'কি হয়েছে বুঝতেই পারিনি। হঠাৎ করেই কাঁপতে শুরু করল বোটটা। পড়ে গেলাম। পরক্ষণে একটা বিকট শব্দ···তারপর দেখি ওই দৈত্যটা আমার গায়ের ওপরে।'

শামুকটার দিকে এতক্ষণে ভাল করে তাকানোর সুযোগ পেল মুসা। প্যাসেজওয়েতে দাঁড়িয়ে থেকে ক্রমাগত আঠা বের করছে। কোথা থেকে এল ওটা? শামুক এতবড় হয় কি করে?

'মনে হলো হাওয়া থেকে এসে উদয় হয়েছে,' কিশোর বলল।

'মাছের পাত্রে রাখা আমার শামুকটার মত লাগছে,' সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। 'কিন্তু ওটা তো খুদে, এই এট্টুখানি। কড়ে আঙুলের মাথার সমান।'

'কিশোর,' রবিন জানাল, 'ইয়া বড় বড় দুটো জেলিফিশ দেখে এলাম আমরা। গাড়ির সমান একেকটা। চিপে শেষ করে দিচ্ছিল আমাদের। আরেকটু হলেই গেছিলাম।'

'তাই নাকি?' রবিনের দিকে ঘুরল কিশোর। 'জেলিফিশ? এত বড়? হচ্ছেটা কি এখানে?'

'হবে আবার কি? ভূত! ভূতের কাণ্ড···'

মুসার কথা শেষ না হতেই দুলে উঠে কাত হয়ে যেতে শুরু করল বোট। ভারসাম্য হারিয়ে চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

আরও কাত হয়ে গেল বোট। দেয়ালে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে পড়ল তিনজনেই।

'আবার কি হলো?' রবিনের প্রশ্ন।

'জলদি রেলিং চেপে ধরো,' চেঁচিয়ে বলল কিশোর। 'উল্টে যাচ্ছে মনে হয়!'

নয়

একপাশে কাত হয়েই আছে বোটটা। সোজা হওয়ার নাম নেই আর। শামুকটাও পিছলে গিয়ে ধাক্কা খেল দেয়ালে।

টেবিলগুলো মেঝের ওপর দিয়ে ছুটে গেল সেদিকে। দেয়াল থেকে ছবি খসে পড়ল।

দেয়ালে শক্ত করে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তিন গোয়েন্দা। আরও কাত হয়ে গেছে বোট। ধরতে গেলে এখন বোটের দেয়ালে চিত হয়ে শুয়ে আছে তিনজনে।

'হচ্ছেটা কি?' বুঝতে পারছে না রবিন।

মুসার কেবিনে বিকট শব্দ। বোট কাত হয়ে যাওয়ায় আপনাআপনি খুলে গেল দরজাটা। ভারী কি যেন ধস্তাধস্তি করছে কেবিনে।

'কি ওটা?' কেবিনের দরজার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে মুসা। 'সবগুলো ভূত গিয়ে আসর জমিয়েছে নিশ্চয় আমার কেবিনে!'

ধুড়ুস! ধুড়ুস! ধুড়ুস! শব্দ হয়েই চলেছে কেবিনে।

'আসলেই তো! কি ওটা···' বিড়বিড় করল কিশোর।

ঢোক গিলল রবিন। 'মনে হচ্ছে আরেকটা দানব!'

ধুড়ুস! ধুড়ুস! ধুড়ুস!

'দেখতে যাচ্ছি আমি,' কিশোর বলল।

দাঁড়ানোর চেষ্টা করল সে। কাত হয়ে থাকা মেঝেতে কোনমতেই সেটা সম্ভব হলো না।

'হামাগুড়ি দিয়ে দেখো,' রবিন বলল।

ইঞ্চি ইঞ্চি করে প্যাসেজের দেয়াল ঘেঁষে এগিয়ে চলল কিশোর। পেছনে চলল দুই সহকারী।

দরজার কাছে চলে এল কিশোর। পাল্লার হাতল চেপে ধরে উঠে দাঁড়াল কোনমতে। বিচিত্র ভঙ্গিতে কাত হয়ে রয়েছে ঘরটা। কারনিভ্যলের ফান হাউজের মত।

দরজাটা দুলছে। সেই সঙ্গে দুলছে কিশোরও। হাতল ধরে প্রায় ঝুলে আছে। ছেড়ে দিলেই পিছলে চলে যাবে কেবিনের মেঝের ওপর দিয়ে। হামাগুড়ি দিয়ে প্যাসেজে ফিরে আসাও কঠিন হয়ে যাবে, কারণ ঢালু মেঝে বেয়ে ওপরে উঠতে

হবে তখন।

ধুড়ুস! ধুড়ুস! ধুড়ুস!

কেবিনের মধ্যে হয়েই চলেছে শব্দ। মেঝেতে জোরে জোরে বাড়ি মারছে যেন প্রচণ্ড শক্তিশালী কোন দানব, কিংবা কোন কিছুকে ধরে আছাড় মারছে।

কিশোরের পেছন থেকে গলা উঁচু করে মুখ বাড়িয়ে ভেতরে দেখার চেষ্টা করছে মুসা আর রবিন।

ধুড়ুস! ধুড়ুস! ধুড়ুস!

বাড়ছে শব্দটা।

খোদাই জানে কি হচ্ছে ভেতরে! তাকানোর সাহস পাচ্ছে না।

দরজায় দাঁড়িয়ে কোনমতে ভেতরে তাকাল কিশোর।

'সর্বনাশ!' কথা সরতে চাইছে না তার। 'গোল্ডফিশ!'

মেঝেতে পড়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে মুসার গোল্ডফিশের পাত্র। মাছ দুটো নিচে পড়ে লেজের বাড়ি মারছে।

বিশাল দানবে পরিণত হয়েছে ওগুলো।

ধুড়ুস! ধুড়ুস! ধুড়ুস!

লেজ দিয়ে বাড়ি মারায় শব্দ হচ্ছে ওরকম করে। তক্তার মেঝেতে আছড়ে পড়ছে ওগুলোর বিশাল লেজ।

'বাপরে! কি জিনিস কি হয়ে গেছে!' পেছন থেকে শোনা গেল মুসার ফিসফিসে কণ্ঠ।

'কিসে বানাচ্ছে এত বড়?' রবিনের প্রশ্ন।

'আর কিসে? ভূতে!'

মাছগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে তিনজনে। প্রথমে দানবে পরিণত হলো মিনো মাছটা। তারপর শামুক। তারপর গোল্ডফিশ। সাগরে দেখে এসেছে তিমির সমান বড় হাঙর, গাড়ির সমান জেলিফিশ। বিশ্বাস করা কঠিন।

ঘটনাটা কি? ভাবছে কিশোর। সব কিছু এ ভাবে বড় হয়ে যাচ্ছে কেন?

'দেখেটেখে মনে হচ্ছে ডাইনোসরের যুগে চলে এসেছি আমরা,' মুসা বলল। 'সমস্ত প্রাণীই প্রকাণ্ড।'

'সব নয়,' শুধরে দিল রবিন, 'কিছু কিছু। এবং রহস্যটা সেইখানেই। কোন কারণে অস্বাভাবিক বড় হয়ে যাচ্ছে প্রাণীগুলো।'

মাথা ঝাড়া দিয়ে যেন মগজের ভেতরটা পরিষ্কার করে নিল কিশোর। 'ওসব ভাবনা পরেও ভাবা যাবে। আপাতত বর্তমান সমস্যাটার সমাধান করা দরকার।'

'বর্তমান সমস্যাই তো এটা,' রবিন বলল।

'না, কেন বড় হচ্ছে সে-রহস্য সমাধানের কথা বলছি না,' কিশোর বলল। 'দানবগুলোর ভারে যে বোট কাত হয়ে গেছে সেটা ঠিক করতে হবে আগে। কোন্ সময় কাত করে উল্টে দেবে আল্লাহই জানে।'

ভয় পেলেও গোল্ডফিশ দুটোর দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে মুসা। বড় হয়ে যেন আরও ঝলমলে, আরও চকচকে হয়ে গেছে। উজ্জ্বল সোনালি রঙ। পোর্টহোল দিয়ে আসা রোদের আলোয় কানকোর ছিটছিট কালো দাগ আর আঁশগুলো রামধনুর

রঙ নিয়ে চমকাচ্ছে।

'এগুলোকে তাড়াতাড়ি বের করে দেয়া দরকার,' কিশোর বলল।

'কি ভাবে?' রবিন বলল, 'জানালা দিয়ে তো বের করা যাবে না।'

'তা তো যাবেই না। বেরোবে না। টেনেটুনে ডেক-এ নিয়ে যেতে হবে।'

'তারপর?' মুসা জানতে চাইল।

'সাগরে ফেলব,' জবাব দিল কিশোর। 'এ ছাড়া উপায় কি?'

'অতবড় দানবের জায়গা একমাত্র সাগরেই করা সম্ভব,' রবিন বলল।

'কিন্তু গোল্ডফিশ তো মিষ্টি পানির মাছ,' মুসা বলল।

'নোনা পানিতে ফেললে মারা যাবে বলছ তো? এ ছাড়া আর কোন উপায়ও নেই,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল কিশোর। 'এখানে থাকলেও বাঁচানো যাবে না। যে ভাবে বোট কাত করে ফেলেছে, নিয়ে গিয়ে যে নদীতে ফেলে আসব তারও উপায় নেই। বোট চালানোই যাবে না। ডুবে যাবে।'

ঠিকই বলেছে কিশোর। চুপ হয়ে গেল মুসা।

'কিন্তু ডেক-এ নেব কি করে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'তোমরা দুজন লেজের দুই মাথা ধরে টান দাও,' কিশোর বলল। 'আমি মাথার দিকে ঠেলছি।'

লেজের বাড়ি মারছে এখনও মাছ দুটো। তবে বেশিক্ষণ আর পারবে না। শুকনোয় পড়ে দম শেষ হয়ে এসেছে। মারা যেতে দেরি নেই।

লেজ ধরতেই রবিনের হাতে প্রচণ্ড এক বাড়ি মারল একটা মাছ। 'আউ!' করে উঠে ছেড়ে দিল সে। বোঝা গেল, জ্যান্ত অবস্থায় নেয়া সম্ভব হবে না।

মুখ হাঁ করে বাতাস গিলে অক্সিজেন নেয়ার চেষ্টা করছে মাছ দুটো। কিছুক্ষণ আকুলি-বিকুলি করে, লেজ আছড়ে মারা গেল অবশেষে।

কাত হয়ে আছে মেঝে। টেনে ওপরের দিকে তোলা মুশকিল। অনেক কষ্টে ঠেলেঠুলে নিয়ে আসা হলো মাঝ বরাবর। তাতে ভারসাম্য ফিরে পেল বোট। সোজা হলো আবার।

এরপর বহুত কায়দা-কসরৎ করে প্যাসেজ দিয়ে বের করে এনে সিঁড়ি দিয়ে ওপরের ডেক-এ টেনে তোলা হলো মাছ দুটোকে। সাহায্য করল শামুকের পিচ্ছিল আঠা। ওগুলো লুব্রিকেটিঙের কাজ করল।

মাছ দুটোকে পানিতে ঠেলে ফেলার পর আর দাঁড়ানোর শক্তি নেই ওদের। ডেক-এ বসে হাঁপাতে লাগল।

'আরও একটা বিরাট কাজ বাকি রয়ে গেল,' রবিন বলল। 'শামুকটাকে কি করব?'

'ফেলতে হবে, আর কি,' জবাব দিল কিশোর।

'মাছের তো ধরার জায়গা ছিল বলে টেনে তুলতে পেরেছি। ওটাকে?'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও, জিরিয়ে নিই,' হাত তুলল কিশোর। 'ব্যবস্থা একটা হবেই।'

জিরিয়ে নিয়ে আবার নিচের ডেক-এ নেমে এল তিনজনে। চতুর্দিকে ভাঙা কাঁচের টুকরো, মেঝেতে পানি, যত্রতত্র লেগে থাকা শামুকের আঠা; দেখে মনে হচ্ছে এক মহাপ্রলয় ঘটে গেছে এখানে। এককোণে চুপ করে বসে আছে শামুকটা।

'কি ভাবে বের করব ওকে?' আবার জিজ্ঞেস করল রবিন।

খানিকক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে থেকে ঘনঘন নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। কোন বুদ্ধি বের করতে না পেরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'আপাতত থাক এখানে। দেখি, পরে, ভেবেচিন্তে। কিছু তো করতে হবেই।'

মেঝেতে লেগে থাকা আঠায় পা পড়তেই ধড়াস করে আছাড় খেল মুসা। শিক্ষা হয়ে গেল একবারেই। আঠার দিকে চোখ রেখে সাবধানে সে-সব ডিঙিয়ে এসে কেবিনে ঢুকল মুসা।

কী অবস্থা হয়ে আছে!

সব কিছু তছনছ।

মেঝেতে পানি। শামুকের আঠা। জিনিসপত্র অগোছাল। মেঝে মোছার জন্যে ন্যাকড়া বের করতে আলমারির দিকে এগোল সে। দাঁড়িয়ে গেল হঠাৎ।

একটা শব্দ শুনেছে মনে হলো।

কান পাতল। হ্যাঁ। পদশব্দ। ওপরের ডেক-এ।

'কিশোর?' ডাক দিল জোরে।

'আমি এখানে,' কিশোরের জবাব এল ল্যাবরেটরি থেকে। পরিষ্কার করছে।

রবিন বেরিয়ে এল তার কেবিন থেকে। মুসাকে জিজ্ঞেস করল, 'শুনছ?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'ডেক-এ উঠেছে কেউ।'

তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। প্রথমে তাকাল মুসার দিকে। তারপর রবিন। সবশেষে ছাতের দিকে।

'আমরা তো তিনজনেই নিচে,' বলল সে, 'তাহলে ডেক-এ কে হাঁটে?'

কি যে শুরু হলো! পা টিপে টিপে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল ওরা। উঠে এল ওপরে। বিকেলের কড়া রোদ যেন চাপড় মারল চামড়ায়।

'কই, কাউকে তো দেখছি না,' মুসা বলল।

'পেছনে তাকালেই দেখবে,' গমগম করে উঠল একটা ভারী কণ্ঠ।

ঘুরে দাঁড়াল ওরা।

তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে।

দশ

[illegible] দাঁড়ানো ওরা। পরনে হাফপ্যান্ট। গায়ে বোতাম লাগানো ঢোলা শার্ট। [illegible]

যে ভদ্রলোক কথা বলেছেন, তিনি লম্বা, ছিপছিপে। লম্বা বাদামী চুল, চোখে চশমা। বাঁয়ে দাঁড়ানো লোকটা বেঁটে, গাট্টাগোট্টা, রোদেপোড়া বাদামী চামড়া। ডানের লোকটার কোঁকড়া চুল। লম্বা, বাঁকানো নাক।

অপরিচিত। বোটে কি করছে ওরা? মুসা ভাবছে।

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল কিশোর। 'আপনাদের তো চিনলাম না, স্যার?'

লম্বা ভদ্রলোক কথা বললেন, 'ঘাবড়ে দিইনি তো তোমাদের? জিজ্ঞেস না করে এ ভাবে উঠে আসার জন্যে দুঃখিত। কিন্তু মনে হলো কিছু একটা ঘটছে এ বোটে? কি হয়েছে? বোটটাকে বিপজ্জনক ভাবে কাত হয়ে যেতে দেখেছি।'

অপরিচিত এই লোকগুলোকে সত্যি কথাটা বলতে নিষেধ করছে কিশোরের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। 'ও কিছু না। জিনিসপত্র সরাতে গিয়ে একপাশে বেশি রেখে দিয়েছিলাম। ভারে কাত হয়ে গেছিল। সরিয়ে দিতেই ঠিক হয়ে গেছে।'

কোথা থেকে এল লোকগুলো? ভাবছে সে। কিনারে এসে দাঁড়াল। ওদের বোটটার সঙ্গে আরেকটা বোট বাঁধা।

'তোমাদের বোটটার কাত হওয়া দেখে মনে হচ্ছিল, উল্টে যাবে,' লম্বা ভদ্রলোক বললেন। 'ভাবলাম, তোমাদের সাহায্য লাগতে পারে।'

'না না, এখন সব ঠিক হয়ে গেছে,' দুই সহকারীর দিকে তাকিয়ে সমর্থন খুঁজল সে, 'তাই না?'

'তা হয়েছে,' মুসা বলল। 'কিন্তু শা...'

কাঁধ খামচে ধরে তাকে থামিয়ে দিল কিশোর। এত জোরে খামচি দিল, ব্যথা পেল মুসা। চোখ বুজে ফেলল।

অবাক লাগছে তার। সব ঠিক আছে বলছে কেন কিশোর?

গোল্ডফিশ পরিণত হচ্ছে দানবে, শামুক হয়ে যাচ্ছে দৈত্য–সব কিছু ঠিক থাকে কি করে?

'সাহায্য করতে আসার জন্যে অনেক ধন্যবাদ আপনাদের,' মুসার কাঁধ ছেড়ে দিল কিশোর। ডলতে লাগল মুসা।

'না না, ঠিক আছে,' হেসে বললেন লম্বা ভদ্রলোক। 'নাবিকদের কেউ বিপদে পড়লে সাহায্য করার জন্যে ছুটে যাওয়াটা আমার স্বভাব।'

হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। 'আমি ডক্টর ব্রোগ। এরা আমার সহকারী, বিজ্ঞানের কাজে নিবেদিত প্রাণ; লেস হুইটল, কিপ কাপলান।' গাট্টাগোট্টা লোকটার নাম লেস। কোঁকড়া-চুল, বাঁকা নাকওয়ালা লোকটা কিপ।

হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিল কিশোর। 'আমি কিশোর পাশা। ওরা আমার বন্ধু–মুসা আমান, আর ও রবিন মিলফোর্ড।'

'হাই, কিডস,' বলে পরিচিত হওয়ার ভঙ্গি দেখালেন ডক্টর ব্রোগ। মুসাকে দেখিয়ে বললেন, 'এই ছেলেটাকে দেখে তো মনে হচ্ছে দুর্দান্ত সাঁতারু।'

হাসল কিশোর, 'ঠিকই ধরেছেন।'

'হুঁ। ডক্টর হিরন পাশার বোটে কি করছ তোমরা? কিছু হন নাকি তোমাদের?'

'আমার চাচা,' জবাব দিল কিশোর। 'আমরা জুনিয়র সাইন্টিস্ট। মেরিন বায়োলজিতে কোর্স করছি। গবেষণা করতে এসেছি এখানে।'

'অ, তাই নাকি। খুব ভাল। তোমার চাচা কোথায়? নিচে?'

'না। ডক্টর ডেকারের বোটে গেছেন। কি একটা জরুরী বিষয়ে খবর দিয়েছেন ডেকার। আসতে দু'চার দিন দেরি হবে।'

'তারমানে বোটে তোমরা একা?'

'একা কোথায়, স্যার?' হেসে বলল কিশোর। 'এই যে তিনজন।'

'বাহ্, রসিকতাবোধও আছে,' ডক্টর ব্রোগও হাসলেন। 'ভাল।'

পায়চারি শুরু করলেন তিনি। ডেক-এ টহল দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। একধারে ফেলে রাখা দড়িদড়া আর অন্যান্য সরঞ্জামগুলো দেখলেন। ছায়ার মত সঙ্গে লেগে রইল দুই সহকারী।

ফিরে এসে তিন গোয়েন্দার মুখোমুখি দাঁড়ালেন আবার তিনি। কিশোরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার একটা জাহাজও আছে। ভাসমান ল্যাবরেটরি। বেশি দূরে না এখান থেকে। বিশেষ প্রয়োজন না হলে ওটাকে নড়াই না, বোট নিয়েই ঘুরে বেড়াই।'

লম্বা দম নিয়ে বুক ভরে নোনা বাতাস টেনে নিলেন তিনি। 'মেরিন বায়োলজি একটা সাংঘাতিক সাবজেক্ট, তাই না? সাগরের রহস্য নিয়ে গবেষণা। সত্যি ইনটারেস্টিং।'

আবার পায়চারি শুরু করলেন ডক্টর ব্রোগ। তাঁর পাশে পাশে হাঁটতে লাগল কিশোর। 'হ্যাঁ, ইনটারেস্টিং। কি নিয়ে গবেষণা করছেন আপনি, স্যার?'

দুই সহকারীর দিকে তাকালেন ডক্টর ব্রোগ। যে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসেছে ওরা, সেটার গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি।

'আমাদের এখন যেতে হবে,' ডক্টর ব্রোগ বললেন।

কিশোরের মনে হলো, ইচ্ছে করে তার প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন তিনি।

'সাহায্য করতে আসার জন্যে অনেক ধন্যবাদ,' আবারও বলল কিশোর।

সিঁড়িতে নামতে গিয়েও কি ভেবে ঘুরে দাঁড়ালেন ডক্টর ব্রোগ। 'ও ভাল কথা, অজব কিছু নিশ্চয় দেখতে পাওনি এখানকার পানিতে, তাই না?'

'আজব?' যেন শব্দটা এই প্রথম শুনল, এমন ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল কিশোর, 'তার মানে?'

'এই ধরো উদ্ভট মাছ, অস্বাভাবিক জলজ প্রাণী, পাখি, এ সব আরকি।'

'দেখিনি মানে!' কিশোর জবাব দেয়ার আগেই বলে উঠল মুসা, 'যত দুনিয়ার অস্বাভাবিক প্রাণীতে বোঝাই এখানকার সাগর! সঙ্গে করে গোল্ডফিশ নিয়ে এসেছিলাম দুটো, মিষ্টি পানির মাছ নোনা আবহাওয়ায় কেমন থাকে দেখার জন্যে—গেল দানব হয়ে। সাগরে জেলিফিশ দেখলাম গাড়ির সমান। হাঙর, তিমির সমান...আঁউ!'

প্রচণ্ড এক গুঁতো খেয়েছে পাঁজরে। কিশোর মেরেছে।

মুসাকে থামিয়ে দিয়ে তার দিকে অবাক হয়ে তাকানোর ভান করল কিশোর, 'তাই নাকি? এ রকম জিনিস দেখেছ!'

রবিন কিছু বলছে না। বুঝে গেছে, ডক্টর ব্রোগকে বিশ্বাস করতে পারছে না কোন কারণে কিশোর। কিন্তু মুসার মগজে সেটা ঢুকল না। সে বলেই চলল, 'কেন, বললাম না তোমাকে, ভুলে গেছ? রবিনকে জিজ্ঞেস করো না, সে-ও দেখেছে। আরেকটু হলে আমাদের ধরে...' পাঁজরে গুঁতো খেয়ে আবার আঁউক করে উঠল সে। রেগে গেল। 'কি হলো? মারছ কেন?'

হাসিমুখে বলল কিশোর, 'তোমার রসিকতা করার স্বভাবটা আর গেল না। যখন-তখন যেখানে-সেখানে রসিকতা...হাহ্ হাহ্ হাহ্!'

কিন্তু ডক্টর ব্রোগ হাসলেন না। ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেছেন। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন মুসার দিকে। 'সত্যি তাহলে দেখেছ এ সব। ব্যাপারটা খুব খারাপ হয়ে গেল তোমাদের জন্যে, মুসা। আর তোমাদের ছাড়া যায় না।'

'মানে?' বোকা হয়ে গেল মুসা। 'কি করবেন?'

'অনেক বেশি দেখে ফেলেছ তোমরা,' বহুদূর থেকে ভেসে এল যেন ডক্টর ব্রোগের কথা। 'তোমাদের নিয়ে কি করা যায় এখন সেটাই ভাবছি।'

তুড়ি বাজালেন তিনি। এগিয়ে এল দুই সহকারী।

এগারো

'আপনিও, স্যার এই বেকুবটার কথা বিশ্বাস করলেন?' যেন কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে মুসার কাঁধে হাত রাখল কিশোর। 'চিরকালই ওর উল্টোপাল্টা দেখার স্বভাব।'

'উন্মাদ,' কিশোরের কথায় তাল দিল রবিন।

'গল্প বানানোর ওস্তাদ,' কিশোর বলল।

'নাম্বার ওয়ান মিথ্যুক,' রবিন বলল। 'সবাই জানে সেটা।'

'বিশ্বাস করুন, স্যার,' অনুরোধের সুরে বলল কিশোর, 'অবাস্তব অস্বাভাবিক কিছু দেখিনি আমরা। দানব গোল্ডফিশ! হুহ্! গাঁজা আর কাকে বলে। আপনি তো একজন জীববিজ্ঞানী, স্যার, গোল্ডফিশ যে দানবীয় হয় না আপনার চেয়ে কে আর ভাল জানে।'

কথা বলার জন্যে মুখ খুললেন ডক্টর ব্রোগ। ঠিক এই সময় ঘটল অঘটনটা।

ধুড়ুস! ধুপ!

দরজাটা প্রায় ভেঙে ফেলে লাফ দিয়ে এসে ডেক-এ পড়ল শামুকটা। সিঁড়ি বেয়ে উঠে চলে এসেছে।

'আরি, চলে এল!' চিৎকার করে উঠল মুসা।

একটা ভুরু উঁচু করে ফেললেন ডক্টর ব্রোগ। রবিন আর কিশোরের দিকে তাকালেন। 'তাহলে ও একটা উন্মাদ, গল্প বানানোর ওস্তাদ, নাম্বার ওয়ান মিথ্যুক, তাই না?'

'শুধু মিথ্যুক না, স্যার!' নিজেদের কথায় অটল রইল্ রবিন। 'একটা ছাগল! গাধা! গরু! মাথায় গোবর পোরা!'

চুপ করে রবিনের গালিগুলো হজম করল মুসা। বোকামি যা করার করে ফেলেছে। বেশি কথা বলার জন্যে পস্তাচ্ছে এখন।

খপ করে মুসার একটা হাত চেপে ধরল লেস। মুচড়ে নিয়ে এল পিঠের ওপর। আরেক হাতে ঘাড় চেপে ধরল।

'ছাড়ুন! ছাড়ুন আমাকে!' ককিয়ে উঠল মুসা। 'লাগছে তো!' পেছনে পা চালিয়ে লেসের হাঁটুর নিচে লাথি মারার চেষ্টা করল। লাগাতে পারল না। লোকটার

গায়ে সাংঘাতিক জোর। তার কিছুই করতে পারল না সে।

'চুপ!' ধমক দিল লেস। 'চেঁচালে হাত ভেঙে দেব।'

বাঁকা-নেকো লোকটা ধরল রবিনকে।

'ওদের ছেড়ে দিন!' কিশোর বলল।

মুসার ওপর লেসের হাতের চাপ আরও শক্ত হলো তাতে।

'সরি, কিশোর,' শান্তকণ্ঠে বললেন ডক্টর ব্রোগ। 'তোমাদের মত কয়েকটা ছেলের ক্ষতি করতে ভাল লাগছে না আমার। কিন্তু অতিরিক্ত খুঁতখুঁতে তোমরা। নাকটা একটু বেশিই গলিয়ে ফেলেছ। আমার গবেষণার কথা জেনে ফেলেছ।'

'কিসের গবেষণা?' জানতে চাইল কিশোর। 'বিশ্বাস করুন, সত্যি কিছু জানি না আমরা। কোন কিছুতে নাকও গলাইনি।'

কিশোরের কাঁধে অস্বাভাবিক লম্বা একটা হাত রাখলেন ডক্টর ব্রোগ। 'একটা সাংঘাতিক কাজে হাত দিয়েছি আমি। পৃথিবীর রূপই বদলে যাবে তাতে। মানুষের একটা মস্তবড় সমস্যার সমাধান করে দেবে।'

'সেটা কি?'

'ক্ষুধা।'

'কি ভাবে?'

'হাহ্‌-হা! শোনার খুব আগ্রহ, তাই না?' হাসি ফুটেছে ডক্টর ব্রোগের মুখে। 'ঠিক আছে, বলছি। ওই প্রবাল-প্রাচীর ঘেরা কিছু জায়গার পানিতে প্ল্যাঙ্কটন বেড়ে গ্রোথ হরমোন ইনজেক্ট করে দিয়েছি আমি। যে সব মাছ আর অন্যান্য প্রাণী সেই প্ল্যাঙ্কটন খাচ্ছে, বড় হয়ে যাচ্ছে। নিজের চোখেই তো দেখতে পেয়েছ।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'কিন্তু তাতে ক্ষুধা সমস্যার সমাধানটা হচ্ছে কি ভাবে?'

'দেখো, মানুষ হিসেবে আমি খারাপ নই,' ডক্টর ব্রোগ বললেন। 'পৃথিবীবাসীকে আমি সাহায্য করতে চাই। আমি মাছকে বড় করে ফেলতে চাইছি দুনিয়ার অনাহারী মানুষের মুখে আহার জোগানোর জন্যে। পৃথিবীর একটি মানুষও আর না খেয়ে থাকবে না কখনও।'

'ছাড়ুন আমাকে!' চিৎকার করে উঠল মুসা। 'ব্যথা লাগছে!'

ছাড়ল না লেস। যে ভাবে ধরে রেখেছিল, সে-ভাবেই রাখল।

'এটা তো বড় বেশি জ্বালাচ্ছে,' লেস বলল।

'ছেড়ে দাও,' ডক্টর ব্রোগ বললেন। 'আপাতত।'

মুসাকে ছেড়ে দিল লেস। তবে পেছনে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল। মুসা কিছু করার চেষ্টা করলেই ধরবে আবার।

'আপনার গবেষণাটা সত্যি বেশ ইনটারেস্টিং মনে হচ্ছে, স্যার,' কিশোর বলল। 'সব খুলে বলুন না। কতখানি সফল হয়েছেন?'

'অনেকটাই। তবে কিছু কিছু খুঁত রয়ে গেছে এখনও,' হাসিটা চওড়া হলো ডক্টর ব্রোগের। নিজের গবেষণা নিয়ে আলোচনা করতে ভালই লাগছে তাঁর। 'ঠিক আছে, খুলেই বলি। গ্রোথ হরমোনটা বানিয়েছি আমি মাছের হরমোন থেকে। কাজেই মাছ জাতীয় প্রাণীর ওপর যে রকম কাজ করে ওটা, অন্য প্রাণীর ওপর করে না। খুঁত থেকে যায়। মাছ আর অন্যান্য প্রাণী যেগুলো ডিম পাড়ে–যেমন কাছিম,

শামুক, এ সবের ওপরও ভাল ফল দিয়েছে। পাখির ওপর মোটামুটি। সম্ভবত ওরাও ডিম পাড়ে বলে। তবে সিলমাছ, তিমি এ সব প্রাণীকে ওই প্ল্যাঙ্কটন খাইয়ে দেখেছি, প্রতিক্রিয়া হয়। বড় তো হয়ই না, চেহারা-সুরৎ বদলে গিয়ে উদ্ভট বিকৃত প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়। আরও একটা ব্যাপার, মাছের ওপর এই হরমোন ক্রিয়া করে ধীরে, কয়েক ঘণ্টা লেগে যায়, কিন্তু স্তন্যপায়ীদের ওপর কাজ করে অস্বাভাবিক দ্রুত–গরম রক্তের জন্যেই হবে হয়তো–কয়েক মিনিটেই পরিবর্তিত হয়ে যায়।…গিনিপিগ আর সাদা ইঁদুরকে খাওয়ানোয় কি হয়েছে কল্পনা করতে পারো?'

'ডাইনোসর হয়ে গেছে,' বলে উঠল মুসা।

'উঁহু,' হেসে মাথা নাড়লেন ডক্টর ব্রোগ। 'আকার মোটামুটি একই রকম রয়েছে, সেই সঙ্গে মাছের যত রকম দেহযন্ত্র সব গজানো শুরু করেছে, এমনকি গায়ে আঁশ পর্যন্ত। মাছের লেজ, মাছের কানকো সব গজিয়ে-ফজিয়ে আজব এক প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়েছে। মজার ব্যাপার হলো, মরেনি একটা প্রাণীও। পানিতে ছেড়ে দিতে দিব্যি সাঁতার কেটে বেড়াতে লাগল। তারমানে বোঝো। উভচর। ডাঙায়-পানিতে সমান বিচরণ। মোটামুটি সব ধরনের প্রাণীর ওপরই গবেষণা চালিয়েছি আমি, একটা প্রাণী বাদে। পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান প্রাণীটি।'

'সেটা কি?' জানতে চাইল রবিন।

হাসলেন ডক্টর ব্রোগ। 'মানুষ।'

'বলেন কি!' রবিন অবাক। 'তা-ও করবেন নাকি?'

'দোষ কি?'

'উন্মাদ!' বিড়বিড় করল রবিন।

রাগলেন না ডক্টর ব্রোগ। 'পৃথিবীবাসী যখন আমার গবেষণার সুফল পেতে শুরু করবে, রোজ সালাম করবে শত-কোটি বার। দুঃখের বিষয়, সেটা দেখার জন্যে হয়তো তোমরা তখন বেঁচে থাকবে না…হ্যাঁ, যা বলছিলাম, এখন পর্যন্ত সরীসৃপ আর মাছ জাতীয় প্রাণীর ওপর পুরোপুরি সফল হয়েছি আমি, ডিমপাড়া গরম রক্তের প্রাণীর ওপর আংশিক, স্তন্যপায়ীদের ওপর একেবারেই বিফল। তবে সব কিছুই ঠিক করে ফেলব আমি। আমার অসাধ্য কিছু নেই।'

'তা তো বুঝলাম,' মুসা বলল। 'কিন্তু আমাদের নিয়ে কি করবেন এখন?'

ভ্রূকুটি করলেন ডক্টর ব্রোগ। 'অনেক বেশি জেনে ফেলেছ তোমরা।'

'তাতে কি?' কিশোর বলল। 'আপনার গবেষণার কথা কাউকে বলব না আমরা। ভাল কাজই তো করতে চাইছেন আপনি।'

'সেটা তোমরা ভাবছ,' ডক্টর ব্রোগ বললেন। 'কিন্তু অনেকেই মানতে চাইবে না। আমার গবেষণা বন্ধ করার জন্যে খেপে উঠবে। সে-জন্যেই তোমাদের জেনে ফেলাটা আমার জন্যে বিপজ্জনক।'

'কিন্তু আমরা কাউকে না বললেই তো হলো।'

'সেটাই তো চাই আমি,' শীতল হয়ে গেল ডক্টর ব্রোগের কণ্ঠ। হাসিটা মিলিয়ে গেছে হঠাৎ করে। 'শিওর হতে চাই, যাতে কোনমতেই কাউকে না বলতে পারো।'

দুই সহকারীর দিকে তাকালেন তিনি। 'নিয়ে যাও ওদের।'

মুসা বাধা দেবার আগেই আবার তাকে চেপে ধরল লেস। ছুরি দেখিয়ে ডক্টর

ব্রোগের বোটে উঠতে বাধ্য করল তাকে আর রবিনকে।

কিশোরকেও নিয়ে আসা হলো।

হুইল ধরলেন ডক্টর ব্রোগ। দড়ি কেটে দিল কিপ। ইঞ্জিন স্টার্ট দিলেন ডক্টর ব্রোগ। বাধা দেয়ার কোন সুযোগই পেল না তিন গোয়েন্দা। খোলা সাগরের দিকে বোটের নাক ঘোরালেন ডক্টর ব্রোগ।

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাদের?' চিৎকার করে উঠল মুসা। 'কি করবেন আমাদের নিয়ে?'

বারো

'ঢোকো!' ধাক্কা দিয়ে কিশোরকে সরু একটা প্যাসেজে ঢুকিয়ে দিল লেস। পেছন থেকে কিপের ধাক্কা খেয়ে তার গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল মুসা। রবিনকেও ঢোকানো হলো একই ভাবে।

'কোথায় নিচ্ছেন?' আবার জিজ্ঞেস করল মুসা।

'গেলেই দেখবে,' রুক্ষকণ্ঠে জবাব দিল লেস।

খুদে একটা রান্নাঘরে নিয়ে আসা হলো ওদের। ছোট একটা দরজা দিয়ে বদ্ধ একটা কেবিনে ঠেলে দেয়া হলো। টেবিল-চেয়ার আছে। একটা চেয়ারের সঙ্গে কিশোরকে বাঁধল লেস।

'এ সবের কোন প্রয়োজন ছিল না,' কিশোর বলল। শান্ত থাকার চেষ্টা করছে।

'সেটা আমরা বুঝব,' কর্কশ স্বরে জবাব দিল লেস।

রবিনকেও বেঁধে ফেলল ওরা। লেসের কাছে ছুরি আছে। কিপ বের করে এনেছে একটা স্পীয়ারগান। মারাত্মক অস্ত্র। এ জিনিস দিয়ে পানির নিচে মাছ শিকার করা হয়। হাঙরের মত বড় প্রাণীও মেরে ফেলা যায়। তীক্ষ্ণধার বর্শার মত লম্বা জিনিসটা শরীরের যে কোন জায়গাতেই লাগুক, এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যাবে। সুতরাং বাধা দেয়ার সাহস করল না তিন গোয়েন্দা। সুযোগের অপেক্ষায় থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ ভাবল কিশোর।

'আরে, প্যাচটা ঢিল করুন না!' মুসাকে বাঁধার সময় চেঁচিয়ে উঠল সে। 'রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে তো!' কথা শুনছে না দেখে দিল কিপের হাতে কামড়ে।

চিৎকার করে উঠল কিপ। 'বাপরে বাপ! ছেলে না বিচ্ছু! কামড়ে দিয়েছে!'

লেস বলল, 'তুমিও কামড়ে দাও।'

বড় বড় দাঁত বের করে মুসাকে দেখাল কিপ। তবে কামড়াল না। দড়ির গিঁটও শক্ত করতে এল না আর, কামড় খাওয়ার ভয়ে।

যাক, কামড়টায় কাজ হয়েছে—ভেবে সন্তুষ্ট হলো মুসা। বাঁধনটা ঢিল রয়ে গেছে।

তিন গোয়েন্দার ওপর চোখ বোলাল কিপ আর লেস।

'হয়েছে,' সঙ্গীকে বলল লেস। 'চলো, কিছু খেয়ে নেয়া যাক। লাঞ্চের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে।'

'আমাদের দেবেন না?' জানতে চাইল মুসা।

জবাব দিল না লেস বা কিপ। বেরিয়ে গেল। দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে গেল।

খানিক পর রান্নাঘরে ওদের প্লেট-চামচ আর জিনিসপত্র নাড়াচাড়ার খুটুর-খাটুর শোনা যেতে লাগল।

ডানে পোর্টহোলটার দিকে তাকাল মুসা। ছোট্ট গোল জানালাটা দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে শুধু। ইঞ্জিনের শব্দে বোঝা যাচ্ছে দ্রুত ছুটছে বোট। কোনদিকে যাচ্ছে তা-ও বোঝা যাচ্ছে না।

টানাটানি শুরু করল সে। দড়িটা যদি আরেকটু ঢিল করা যেত…

অতিরিক্ত চুপচাপ থাকলে লেস বা কিপ যদি সন্দেহ করে দেখতে আসে, সে-জন্যে রবিনকে কথা বলতে ইশারা করল কিশোর। মুসার কাজ মুসা করতে থাকুক।

'ডক্টর ব্রোগের বুদ্ধিটা কিন্তু মন্দ না,' রবিন বলল। 'প্রাণীকুল বড় হয়ে গেলে মানুষের মাংসের চাহিদা মিটবে। প্রোটিনের অভাবে, অনাহারে মৃত্যু বন্ধ হবে।'

টানাটানি বাড়িয়ে দিয়েছে মুসা। মনে মনে বলছে, ধুর, খোলে না কেন!

'বুদ্ধি ভালই,' রবিনের কথার জবাবে বলল কিশোর, 'কিন্তু এর খারাপ দিকও আছে। প্রাণীরা সব অস্বাভাবিক হারে বড় হয়ে যেতে থাকলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হবে, ভয়ঙ্কর অবস্থা তৈরি হবে।'

টেনেই চলেছে মুসা। এদিক ওদিক কব্জি নেড়ে দেখল। সামান্য ঢিল কি হলো?

'যেমন?' রবিনের প্রশ্ন।

'অনেক সমস্যা। বড় হয়ে যাওয়া প্রাণীগুলো তখন খাবে কি? বড় মাছগুলো এখনকার মতই ছোটগুলোকে ধরে ধরে খাবে। সাইজে যেহেতু বড় হয়ে যাবে, শক্তি হয়ে যাবে দানবীয়, মানুষ খেতেও দ্বিধা থাকবে না আর কারোরই। এই যেমন জেলিফিশে খেয়ে ফেলতে চেয়েছিল তোমাদের। সাধারণ জেলিফিশ কি মানুষ খেতে পারে?'

ঢিল হয়ে গেছে দড়ি। একটা হাত বের করে আনার চেষ্টা করল মুসা।

এখনও রান্নাঘরে রয়েছে লেস আর কিপ। কথা শোনা যাচ্ছে। সরে যেতে লাগল কথা। খাবার নিয়ে-ডেক-এ চলে যাচ্ছে বোধহয়।

ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। থেমে গেল বোট। গন্তব্যে পৌঁছে গেল নাকি?

হ্যাঁচকা টান মারল মুসা। মড়মড় করে উঠল চেয়ারের হাতল। তবে ভাঙল না।

হাত মোচড়ানো শুরু করে দিল মুসা। মুচড়ে মুচড়ে বের করে আনার চেষ্টা করছে। ঘষা লেগে জ্বলে যাচ্ছে চামড়া।

অবশেষে বের করে নিয়ে এল একটা হাত।

'কিশোর!' ফিসফিস করে জানাল সে। 'হয়ে গেছে!'

'গুড!'

অন্য হাতটাও ছাড়িয়ে নিল মুসা। উঠে এল কিশোরের বাঁধন খোলার জন্যে।

'কি করব?' কিশোরের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল রবিন। 'সাঁতরে পালাব?'

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। ডক্টর ব্রোগ। ঘরের দৃশ্য এক নজর দেখেই

পেছনে দাঁড়ানো দুই সহকারীকে বললেন, 'কি, বলেছিলাম না, এত শান্ত থাকার বান্দা ওরা নয়?'

গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠলেন, 'পালাতে চাও, না? ঠিক আছে, সেই ব্যবস্থাই করছি। কিপ, লেস, ডেক-এ নিয়ে যাও ওদের।'

কিশোর আর রবিনের বাঁধন খুলে দেয়া হলো। পিস্তলের ভয় দেখিয়ে প্রায় টেনে-হিঁচড়ে ওদের নিয়ে আসা হলো ওপরের ডেক-এ। একটা টেবিলে রাখা আধখাওয়া খাবার। স্যান্ডউইচ, স্যালাড। ডক্টর ব্রোগের লাঞ্চ। সন্দেহ জাগায় খাওয়া ফেলেই উঠে গেছেন।

বোটের কিনারে নিয়ে আসা হলো তিন গোয়েন্দাকে। নিচে তাকাল মুসা।

আকাশের অবস্থা ভাল মনে হলো না। সাগর যেন টগবগ করে ফুটছে। আর কোন বোটই চোখে পড়ল না। ডাঙার তো প্রশ্নই ওঠে না।

কিছু নেই। কেউ নেই ওদের বাঁচানোর।

চতুর্দিকে পানি। সীমাহীন, গভীর মহাসমুদ্র।

নিচে ডক্টর ব্রোগের সৃষ্ট দৈত্যাকার প্রাণীরা নিশ্চয় ক্ষুধায় অস্থির। কে কাকে খাবে সেই প্রতিযোগিতায় মেতেছে হয়তো। মানুষ পেলে গপগপ করে গিলবে কোন সন্দেহ নেই তাতে।

'নাও, পালাও,' ডক্টর ব্রোগ বললেন। 'কে আগে ঝাঁপ দেবে? নাকি একসঙ্গে সবাই যেতে চাও?'

ফেনায়িত ঢেউয়ের দিকে তাকাল মুসা। লম্বা দম নিল। ওই পানিতে ঝাঁপ দেয়ার মানে নিশ্চিত মৃত্যু, বুঝতে অসুবিধে হলো না।

তেরো

উত্তাল ঢেউ আছড়ে পড়ছে বোটের গায়ে। এত জোরে লাফাচ্ছে মুসার হৃৎপিণ্ডটা, রীতিমত ব্যথা পাচ্ছে সে।

লম্বা দম টানল আবার। এটাই আমার শেষ শ্বাস টানা, ভাবল সে।

'দেখুন, আমাদের ছেড়ে দিন,' অনুরোধ করল কিশোর। 'আমরা সত্যি কোন ক্ষতি করব না আপনার।'

'টিকটিকিগিরি করার আগে সেটা ভাবা উচিত ছিল,' জবাব দিলেন ডক্টর ব্রোগ।

'আমরা টিকটিকি নই,' রেগে উঠল মুসা। 'গবেষক।'

'হ্যাঁ, ঠিক,' সুর মেলাল রবিন। 'যা দেখেছি, সেটা দুর্ঘটনাক্রমে। তদন্ত করতে গিয়ে দেখিনি।'

'ওসব বলে কোন লাভ নেই আর এখন,' ডক্টর ব্রোগ বললেন। 'এতদূর এগোনোর পর আমার গবেষণার ওপর কোন ঝুঁকি নিতে আর রাজি নই আমি।'

মুসার দিকে তাকালেন তিনি। 'হাঁ করে রয়েছ কেন? লাফ দাও।'

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। নড়ল না।

'দেখুন,' কিশোর বলল, 'এতভাবে বলছি আমরা কাউকে বলব না। বিশ্বাস যখন করছেনই না, কোন দ্বীপে নামিয়ে দিন আমাদের।'

'তাতে লাভটা কি? ফিরে গিয়ে ঠিকই জানিয়ে দিতে পারবে।'

হাল ছেড়ে দিল কিশোর। পাগলটাকে বোঝানো যাবে না।

গভীর ভাবনা চলেছে তার মাথায়। কি করে বাঁচা যায়? মগজের বেয়ারিংগুলো বনবন ঘুরছে উপায়ের আশায়। কিছুই বের করতে পারল না।

চারপাশে তাকাতে লাগল সে। ভেসে থাকার অবলম্বন খুঁজছে। লাইফজ্যাকেট। নিশ্চয় আছে বোটে। কিংবা ফ্লোটিং রিঙ।

ধরে ভেসে থাকার উপযোগী কিছু পেলেও চলত। বাঁচার চেষ্টা করতে পারত।

কিন্তু সামনের ডেক-এ কিছুই দেখতে পেল না।

ঘাড় ঘুরিয়ে বোটের পেছন দিকে তাকাতেই স্থির হয়ে গেল চোখ।

দ্রুততর হলো হৃৎপিণ্ডের গতি। একটা রবারের ডিঙি!

'কি দেখছ, খোকা?' কুটিল হয়ে উঠল লেসের দৃষ্টি। 'কোস্ট গার্ডের খোঁজ করছ? নেই নেই, কিছু নেই। তীর থেকে বহুদূরে রয়েছি আমরা। কোস্ট গার্ডকার্ড কেউ আসে না এদিকে।'

'আমি কিছুই খুঁজছি না,' গম্ভীর স্বরে জবাব দিল কিশোর।

'কথা অনেক হলো,' ডক্টর ব্রোগ বললেন। 'অকারণে আমার সময় নষ্ট করছ তোমরা। কথা বলে কয়েক মিনিট বেশি বেঁচে থেকে আর কি হবে। মরতেই যখন হবে, তাড়াতাড়ি সেরে ফেলো। অবশ্য বলা যায় না, সাঁতার কাটার সুযোগ যখন পাচ্ছ, বেঁচেও যেতে পারো।'

তারপরেও যখন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল তিন গোয়েন্দা, লাফ দিতে এগোল না, দুই সহকারীর দিকে ফিরলেন ডক্টর ব্রোগ, 'নিজের ইচ্ছেয় যাবে না। ধরে ফেলে দাও।'

মুসাকে চেপে ধরল লেস। ধস্তাধস্তি শুরু করল মুসা।

রবিনকে ধরল কিপ। চিৎকার করে উঠল রবিন। চোখ বুজে ফেলল। ধাক্কা খাওয়ার অপেক্ষায় আছে।

কিন্তু এল না ধাক্কাটা।

কানে এল তীক্ষ্ণ, কর্কশ একটা অপার্থিব চিৎকার।

প্রচণ্ড কৌতূহল আপনাআপনি চোখের পাতা খুলে দিল তার।

মাথার ওপরে কালো ছায়া।

বার কয়েক চোখ মিটমিট করল সে। সত্যি ছায়া? নাকি অন্য কিছু?

আবার শোনা গেল চিৎকার। ডানা ঝাপটানোর মত শব্দ।

লক্ষ করল, সবার চোখ আকাশের দিকে।

হেলিকপ্টার? কেউ আসছে ওদের উদ্ধার করতে? হিরুচাচা খবর পেয়ে গেছেন? উঁহু! কি ভাবে পাবেন?

না। ডানা ঝাপটানোর শব্দটা হেলিকপ্টারের রোটরের মত নয়। পাখির ডানার মত। তবে অনেক অনেক বেশি জোরাল।

আরও একটা ছায়া পড়ল বোটের ওপর।

কুৎসিত, তীক্ষ্ণ চিৎকার চিরে দিল আবার বাতাস।

'সর্বনাশ!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'কাছে চলে এসেছে!'

ধস্তাধস্তি থামিয়ে কপালে হাত রেখে আকাশের দিকে তাকাল মুসা। সে-ও দেখতে পেল।

অনেক নিচু দিয়ে উড়ছে বিশাল দুটো পাখি।

খাইছে! আরব্য রজনীর রুক পাখি নাকি? দ্বীপ থেকে ওদের ডিম তুলে এনেছেন ডক্টর ব্রোগ?

না, রুক নয়। চিনতে পারল সে। সীগাল। বিশাল। আরব্য রজনীর রুকের চেয়ে কম বড় নয়।

কাঁক! কাঁক! তীক্ষ্ণ চিৎকারে কান ঝালাপালা করতে লাগল পাখি দুটো।

'ওই যে আসছে আপনার আরও দুটো দানব, ডক্টর ব্রোগ,' পাখিগুলোর ডানা ঝাপটানোর শব্দকে ছাপিয়ে চিৎকার করে বলল কিশোর। 'আপনার মারাত্মক গবেষণার কুফল।'

'হুঁ!' খুশি খুশি ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন ডক্টর ব্রোগ। 'নিশ্চয় ওরা প্ল্যাঙ্কটন খেয়েছে। মাছ খাওয়ার সময় পেটে চলে গিয়েছিল।'

বোটের ওপর চক্কর দিতে লাগল পাখি দুটো। মস্ত ছায়া ফেলছে ডেক-এ। পালের মত বড় ডানার ছায়া।

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে মুসা।

চক্কর বন্ধ করল পাখি দুটো।

পা নামিয়ে নখর ছড়িয়ে দিল।

খাবার খুঁজছে? রোদে চকচক করতে থাকা ভয়ঙ্কর নখগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে গরমের মধ্যেও গায়ে কাঁটা দিল তার।

ওদেরকে কি খাবার মনে করছে পাখি দুটো?

ডাইভ দিয়ে নেমে এল ওগুলো।

নখর বাড়ানো। শিকার ধরতে প্রস্তুত।

চিৎকার করছে একটানা।

চোদ্দ

আতঙ্কে জমে গেল মুসা। কানের পর্দায় আঘাত হানছে কর্কশ চিৎকার। মনে হবে মাথাটা বিস্ফোরিত হয়ে যাবে তার।

বাড়িয়ে দেয়া নখরগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে সে।

পাখির ছায়া পড়ল গায়ে। এগিয়ে আসছে ছোঁ মারার জন্যে।

শেষ মুহূর্তে ধাক্কা মারল তাকে কিশোর। চেপে ধরে ডেক-এ শুইয়ে দিল।

ফিরে তাকিয়ে মুসা দেখল, আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর।

বিমূঢ় হয়ে থাকা রবিনকেও ধাক্কা মারল সে। শুইয়ে দিয়ে নিজেও উপুড় হয়ে

পড়ল ডেক-এ।

মুখ নিচু হয়ে থাকায় পাখি দুটোকে দেখতে পাচ্ছে না মুসা। তবে ধুপ করে ডেক-এ নামার শব্দ কানে এল।

হট্টগোল করছে ডক্টর ব্রোগ আর তাঁর দুই সহচর। হই-চই, পাখির চিৎকার।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল মুসা। দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু আবার চেপে তার মাথাটা নামিয়ে দিল কিশোর।

পেছনে ধস্তাধস্তির মত শব্দ। আরও চিৎকার। হই-হট্টগোল।

ডানা ঝাপটানোর ভারী শব্দ।

একটা টেবিল উল্টে পড়ল। ঝনঝন করে প্লেট ভাঙল।

আর্তনাদ শোনা গেল।

'জলদি,' দুই সহকারীর উদ্দেশে বলল কিশোর, 'এটাই আমাদের সুযোগ।'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। দেখাদেখি রবিন আর মুসা। ওদের সঙ্গে আসতে ইশারা করে বোটের পেছন দিকে ছুটল কিশোর।

'মুসা,' নৌকাটা দেখিয়ে বলল, 'ওদিকের দড়ি খুলে ফেলো। আমি এদিকটা খুলছি।...মাথা তুলো না রবিন, নামাও, নামাও!'

ডেক-এ বেঁধে রাখা ডিঙিটার গিট খুলতে শুরু করল তিনজনে।

'জলদি!' তাগাদা দিল কিশোর। 'ওরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই সেরে ফেলতে হবে।'

কাঁক! কাঁক!

ডাক শুনে চকিতের জন্যে ফিরে তাকাল কিশোর। দেখল ধারাল নখর দিয়ে কিপকে চেপে ধরেছে একটা পাখি। ঠোকর মারছে। নিচ থেকে টেনে সরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন ডক্টর ব্রোগ আর লেস।

'আমারটা খুলে গেছে,' জানাল রবিন। আরেকটা গিট খোলায় মুসাকে সাহায্য করতে গেল।

মুসার আঙুল আড়ষ্ট হয়ে গেছে। মগজ ভোঁতা। কোনমতেই সুবিধে করতে পারছে না গিটগুলোর সঙ্গে। মন থেকে কেবল একটা তাগাদাই আসছে–জলদি! জলদি করো! বাধা পাওয়ার আগেই!

অবশেষে শেষ গিটটাও খুলে ফেলল ওরা। টেনে নামিয়ে আনল ডিঙিটা। দড়ির মাথা ধরে রেখে পানিতে ছুঁড়ে দিল।

'জলদি উঠে পড়ো নৌকায়,' কিশোর বলল। 'লাফ দাও। লাফ দাও।'

লাফ দিতে গেল মুসা।

'আই! আই!' কানে এল চিৎকার, ওর পেছন থেকে। ফিরে তাকিয়ে দেখে লেস চেয়ে আছে। হাতে স্পীয়ারগান। 'বস্, ওরা পালাচ্ছে!'

হাত নেড়ে মুসাকে থামতে ইঙ্গিত করল লেস। 'থামো! থামো বলছি!' স্পীয়ারগান তুলে ধরল ওদের দিকে। 'খবরদার, নড়বে না!'

রোদে চকচক করা তীক্ষ্ণধার বর্শার ফলাটার দিকে তাকিয়ে দ্বিধা করতে লাগল মুসা।

সত্যি মারবে?

'হাঁ করে দেখছ কি?' তার একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'নামো না!'

ট্রিগার টিপে দিল লেস।

পনেরো

বর্শাটা দেখতে পেল না মুসা। এত দ্রুত ছুটে গেল ওটা, কেবল বাতাস কাটার শব্দ শুনতে পেল।

আতঙ্কিত হয়ে দেখল, ডেক-এ পড়ে যাচ্ছে কিশোর।

'আপনি...আপনি ওকে মেরে ফেলেছেন!' চিৎকার করে উঠল মুসা।

'কিশোর! কিশোর!' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে গেল রবিন।

উঠে বসল কিশোর।

'লাগেনি! অল্পের জন্যে বেঁচেছি!' কম্পিত কণ্ঠে বলল সে। নিশানা করতে দেখেই ঝাঁপ দিয়েছিল। 'যাও যাও, বোটে নামো!'

ডাক ছাড়ল একটা পাখি। কিপের আর্তনাদ শোনা গেল আবার। স্পীয়ারগান হাতে সেদিকে ঘুরে গেল লেস।

আর দ্বিধা করল না মুসা। বোটের কিনার লক্ষ্য করে দৌড় মারল। কিনারে পৌঁছে থামল না। শূন্যে ঝাঁপ দিল। পড়তে শুরু করল নিচের দিকে। তার মনে হলো অনন্তকাল ধরে শূন্যে ঝুলে থাকার পর দুপ করে পড়ল বোটে।

তার পর পরই নামল রবিন।

সবশেষে কিশোর।

'থামো! নইলে দিলাম মেরে!' ওপর থেকে হুমকি দিলেন ডক্টর ব্রোগ। তাঁর হাতেও স্পীয়ারগান।

এবার বাঁচিয়ে দিল একটা পাখি। ডানার ঝাপটা লেগে ডক্টর ব্রোগের গানটা পানিতে পড়ে গেল।

দাঁড় তুলে নিল মুসা। নৌকার গতি বাড়াতে হাতকেই বৈঠা বানিয়ে পানি খামচাতে শুরু করল কিশোর আর রবিন। বোটের কাছ থেকে যত দ্রুত সম্ভব সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল ডিঙিটাকে।

'পালাতে পারবে না!' মুঠো তুলে নাচাতে লাগলেন ডক্টর ব্রোগ। 'যাবে কোথায়? আমি তোমাদের ধরবই!'

ছপাৎ ছপাৎ দাঁড় ফেলছে মুসা।

আরও উত্তাল হয়ে উঠেছে সাগর। ফেনায় ফেনায় সাদা। প্রচণ্ড ঝাপটা মারল এসে ঝোড়ো হাওয়া। বড় বড় ঢেউ ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে নিয়ে যেতে লাগল ওদের।

দূরে অস্পষ্ট হয়ে আসছে ডক্টর ব্রোগের বোট।

'পালাতে তাহলে পারলাম,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ল রবিন। 'কিন্তু কোথায় যাচ্ছি?'

চারপাশের দিগন্ত সাগরের পানি ছুঁয়ে আছে। ডাঙা তো দূরের কথা আর কোন বোট বা জাহাজের চিহ্নও চোখে পড়ল না। পানি ছাড়া কিছু নেই। ঘূর্ণায়মান পানি। ঢেউ আর ঢেউ।

ঢেউয়ের দেয়ালে বাড়ি খাচ্ছে ছোট্ট রবারের ডিঙিটা। মুসার কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেল কিশোরের। 'সাবধান!' চিৎকার করে উঠল সে। 'আসছে একটা পাহাড়!'

এসে পড়ল ঢেউটা। ঝাঁকি দিয়ে চূড়ায় তুলে ফেলল ওদের। নিচ থেকে সরে যাওয়ার সময় ছুঁড়ে দিয়ে গেল শূন্যে। নৌকার কিনার আঁকড়ে ধরে রইল ওরা।

ঝপাৎ করে দুটো ঢেউয়ের মাঝের উপত্যকায় পড়ল নৌকা। ঢেউয়ের মাথা ভেঙে পড়ল ওদের ওপর।

চুপচুপে হয়ে ভিজে গেল সবাই। গায়ে কাঁটা দিল রবিনের।

পেছন থেকে এসে ধাক্কা মারল আরেকটা ঢেউয়ের পাহাড়। আরোহী সহ নৌকাটাকে আবার ছুঁড়ে দিল শূন্যে। প্রাণপণে কিনার আঁকড়ে ধরে রেখেছে ওরা।

হঠাৎ পিছলে গেল রবিনের আঙুল। ছুটে গেল কিনার থেকে। শূন্যে লাফিয়ে উঠল তার দেহটা। উড়ে গিয়ে পড়ল ফেনায়িত পানিতে।

'রবিন পড়ে গেছে!' চিৎকার করে উঠল মুসা।

ভেসে উঠল রবিনের মাথা। হাবুডুবু খাওয়ার মাঝে কোনমতে মুখ উঁচু করে ফুচুত্ করে পানি ছেড়ে চিৎকার করে উঠল, 'বাঁচাও...' কথা শেষ হবার আগেই ডুবে গেল আবার। হাত দুটো শূন্যে তোলা। বাতাসে খামচি মারছে ভেসে ওঠার চেষ্টায়।

আবার মাথা তোলার অপেক্ষা করতে লাগল মুসা।

অপেক্ষা।

অপেক্ষা।

খোদা! জলদি তোলো!

তার প্রার্থনায় কাজ হলো।

আবার ভেসে উঠল রবিন। নৌকার কাছেই। পাশে ঝুঁকে হাত বাড়াল মুসা। আরও ঝুঁকল। হাত লম্বা করল। আরও ঝুঁকল। আরও। আরও।

কব্জিটা ধরে ফেলল রবিনের।

টেনে তুলে আনল নৌকায়।

'ঠিক আছ?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

কেশে উঠল রবিন। কাশির চোটে পানি গড়ানো শুরু হলো চোখ থেকে। কোনমতে কাশি থামানোর পর বলল, 'আছি।'

ঠিক এই সময় নৌকার ওপর এসে ভেঙে পড়ল আরেকটা বিশাল ঢেউ।

নৌকায় জবুথবু হয়ে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে রইল ওরা। একেবারে ভেজা কাক। কাঁপছে। পেটে খিদে। ক্লান্ত। নৌকার তলায় পানি জমছে। পানির মধ্যেই বসে থাকতে হচ্ছে।

অন্ধকার হয়ে আসছে আকাশ। রাত নামতে দেরি নেই।

এই খোলা সাগরে রাত কাটানোর কথা ভাবতেই হাত-পা হিম হয়ে এল ওদের।

বিশ্রাম নেয়ারও উপায় নেই। সাগর ভয়ানক উত্তাল। এক সেকেন্ডের জন্যে নৌকার কিনার থেকে হাত সরালেও পানিতে ছিটকে পড়তে হবে।

খাবার নেই। খাওয়ার পানি নেই। কিছু নেই।

'এরচেয়ে খারাপ অবস্থা আর হতে পারে না,' মুসা বলল।

হাঁচি দিতে লাগল রবিন।

কিশোর চুপ।

তারমানে এরচেয়ে খারাপ অবস্থা সত্যি হয় না! নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিল মুসা।

এবং তারপরেই ঘটল ঘটনাটা। অবস্থা যে আরও কত খারাপ হতে পারে যেন সেটা বোঝানোর জন্যে।

কয়লার মত কালো আকাশ। বিদ্যুৎ চমকাল। চিরে দিল আকাশটাকে।

কড়াৎ! গ্রুমমম!

বাজ পড়ল ভয়ানক শব্দে। কাঁপিয়ে দিল খুদে ডিঙিটাকে।

মুষলধারে নামল বৃষ্টি। পানির ঘন ঠাণ্ডা চাদরের মত গ্রাস করল যেন ওদের।

'আর কত বিপদ!' ককিয়ে উঠল রবিন। কপালের ওপর থেকে সরিয়ে দিল ভেজা চুল।

জবাব দিল না কেউ।

চুপচাপ ডিঙিতে বসে রইল ওরা। আশঙ্কায় দুরুদুরু বুক। ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে। ভেজা গায়ে ঝাপটা মারছে বাতাস। মাথায় ভাঙছে বৃষ্টির ফোঁটা। পাথরের কণার মত অনবরত আঘাত।

ঘন ঘন বিদ্যুতের চমক। সাপের লেজের মত ক্রমাগত আছড়ে চলেছে আকাশ জুড়ে।

মেঘে ঢাকা ভারী আকাশের দিকে মুখ তুলে বলল কিশোর, 'সহজে থামবে বলে তো মনে হচ্ছে না।'

দারুণ সংবাদ! মুখ বিকৃত করে ফেলল মুসা।

ইতিমধ্যেই পানিতে বোঝাই হয়ে গেছে নৌকাটা। রবারের না হলে অনেক আগেই ডুবে যেত।

খালি হাতেই পানি সেচা শুরু করল কিশোর। বলল, 'হাত লাগাও। ডুবে মরতে না চাইলে।'

দেখা গেল, কারোরই ডুবে মরার ইচ্ছে নেই। হাত দিয়ে সেচে আর কতটা এগোনো যায়। একদিক দিয়ে ফেলে, আরেক দিক দিয়ে ভরে। কি করবে দিশেহারা হয়ে পড়ল ওরা।

পা থেকে জুতো খুলে নিয়ে ওটা দিয়ে সেচতে আরম্ভ করল মুসা। হাতের চেয়ে কিছুটা ভাল। দেখাদেখি কিশোর আর রবিনও একই কাজ করল।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে। বৃষ্টির বিরাম নেই।

'আমি আর পারছি না,' ঘোষণা করে দিল রবিন। 'হাত অবশ হয়ে গেছে।' জুতোটা ছুঁড়ে ফেলে দিল নৌকার তলায়। পানিতে ভাসতে লাগল ওটা। 'আর পারব না। যা হয় হোকগে!'

'এত সহজে হাল ছাড়ছ কেন?' ঝাঁজিয়ে উঠল কিশোর। 'পারতেই হবে আমাদের। আমরা মরব না।' কিশোরের নিজের কানেই কথাটা বড় ফাঁকা শোনাল।

বিকট শব্দে বাজ পড়ল।

শিউরে উঠল মুসা। ডুবে মরার হাত থেকে উদ্ধারের কোন উপায়ই দেখতে পাচ্ছে না।

ষোলো

বৃষ্টি অবশেষে থামল। রাত অনেক। ঘুটঘুটে অন্ধকার। চাঁদ নেই। তারা নেই। ভারী কালো মেঘের চাদর ঢেকে রেখেছে আকাশটাকে।

'সাংঘাতিক শীত,' কেঁপে উঠল রবিন।

'আমার খিদে পেয়েছে,' অনুযোগ করল মুসা।

'আমার দুর্বল লাগছে,' কিশোর বলল।

'আমার আরও বহু কিছু লাগছে,' মুসা বলল। 'শীত, দুর্বল, ক্লান্তি, অবশ। সেই সঙ্গে খিদে, ঘুম, পিপাসা। কোক পেলে ভাল হত।'

এত দুঃখের মধ্যেও হেসে ফেলল সবাই।

পরিস্থিতি যখন এতটা খারাপ হয়ে আসে, সব কিছুই কেমন উদ্ভট লাগতে থাকে।

উত্তাপের জন্যে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে রইল ওরা। মুসার পেট গুড়গুড় করছে খিদেয়।

সেই সঙ্গে ক্লান্তি। ভীষণ ক্লান্তি। চোখ মেলে রাখতে পারল না। ঘুমিয়ে পড়ল।

কতটা সময় কাটল জানে না।

ধাক্কার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল তার। কিসে যেন ঠেকেছে নৌকা।

চোখ মেলল সে। ফ্যাকাসে রূপালী আলো চতুর্দিকে।

স্বপ্ন দেখছে। মনে হলো তার। আবার চোখ বুজল।

ভেজা কাপড় অস্বস্তি জাগাচ্ছে চামড়ায়।

না, ঘুম নয়। জেগে আছে।

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল আবার চোখের পাতা। সোজা হয়ে বসেছে কিশোর আর রবিন। হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙছে। হাই তুলছে।

'কি ব্যাপার?' বিড়বিড় করল রবিন।

'নৌকাটা নড়ছে না,' মুসা বলল। 'থেমে গেছে, দেখো।'

হাত বাড়াল ঢেউ বোঝার জন্যে। হাতে ঠেকল ভেজা বালি।

ডাঙা!

'আই, দেখো দেখো!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'ডাঙা। কোথাও এসে ঠেকেছে নৌকা।'

আরেকটু পরিষ্কার হলো আকাশ। খানিক পর সূর্য দেখা দিল দিগন্তে। কোথায় রয়েছে দেখতে সুবিধে হলো ওদের।

লাফ দিয়ে বোট থেকে নেমে পড়ল রবিন। 'ডাঙা! বিশ্বাস হচ্ছে না আমার।'

উঠে দাঁড়াল কিশোর। মাথার ওপরে হাত দুটো তুলে টানটান করল, ঝাঁকি দিয়ে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করে নিল। 'ভালই লাগছে। তাই না?'

উজ্জ্বল হচ্ছে রোদ। বালিতে আছড়ে পড়ল মুসা। জোরে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'রোদ মিয়া, আমাকে কাবাব বানিয়ে দাও। ঠাণ্ডা আর সহ্য হচ্ছে না।'

চারপাশে চোখ বোলাতে বোলাতে মৃদু কণ্ঠে বলল কিশোর, 'কোথায় এলাম?'

'যেখানেই আসি না কেন, পানি দরকার আমার,' রবিন বলল।

'সেই সঙ্গে খাবার,' যোগ করল মুসা।

ঢেউয়ের ধাক্কায় বালির সৈকতে এসে উঠেছে ওদের ডিঙি। ঢালের ওপরে পাম গাছের জটলা চোখে পড়ল। এ ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। বাড়ি নেই, ঘর নেই, জেটি নেই, নৌকা নেই।

'কোন মানুষও নেই,' কিশোর বলল। 'দেখি। ঘুরে দেখে আসি।'

'চলো, আমিও যাচ্ছি।' উঠে দাঁড়াল মুসা।

কিশোরকে অনুসরণ করল মুসা আর রবিন। পানিকে একপাশে রেখে এগিয়ে চলল ওরা।

'আরে, দেখো! একটা নারকেল গাছ!' হাত তুলে দেখাল রবিন। গাছটা অনেক লম্বা। নিচের বালিতে পড়ে আছে কয়েকটা নারকেল।

দৌড় মারল মুসা। প্রায় ছোঁ মেরে তুলে নিল একটা নারকেল। বাড়ি মারল পাথরে।

নারকেলের ছোবড়া সরিয়ে ফাটিয়ে ফেলল মালা। ফাঁক করে হাঁ করে ধরল মুখের ওপর। মিষ্টি পানি। কয়েক চুমুক খেয়ে তুলে দিল রবিনের হাতে। রবিন খেয়ে বাকিটা দিল কিশোরকে। মালা ভেঙে নারকেল চিবাতে শুরু করল।

'কেমন লাগছে খেতে?' মুসার দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল কিশোর।

'এত ভাল খাবার জীবনে খাইনি,' নারকেলে কামড় বসাল আবার মুসা।

তাড়াহুড়োর কারণে ঠোঁটের কোণ বেয়ে রস গড়িয়ে পড়ছে। মুছে নিয়ে বলল, 'তবে একটা বার্গার পেলে এখন আর কিছুই চাইতাম না। না না, একটা না দুটো বার্গার। এক গামলা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই আর টনখানেক কেচাপ।'

'কিংবা একটা পিৎসা,' রবিন বলল।

'ওসব তো পাবে না,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর, 'তবে মাছ পাওয়া যেতে পারে। আগুন জ্বালানো গেলেই মাছের কাবাব।'

হাঁটতে লাগল আবার ওরা।

'একটা রেস্টুরেন্ট পাওয়া গেলে কি সাংঘাতিক ব্যাপার হত এখন, তাই না?' মুসা বলল।

মিনিট দশেক পর হতাশায় গুঙিয়ে উঠল কিশোর, 'দূর!'

কি হলো!

কি হলো!

একসঙ্গে প্রশ্ন করল মুসা আর রবিন।

হাত তুলে কয়েক গজ দূরের সৈকত দেখাল কিশোর।

ডিঙিটা দেখা যাচ্ছে। যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিল ওরা, সেখানে ফিরে এসেছে আবার।

'মানেটা বুঝলে তো?' দুই সহকারীর দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর, 'দশ মিনিটেই পুরো দ্বীপ দেখা শেষ।'

'একেবারেই ছোট,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রবিন। 'লিলিপুট।'

'আমার খিদে একবিন্দুও কমেনি,' জানিয়ে দিল মুসা। 'নারকেল খেতেও ইচ্ছে করছে না আর।'

'একটা মরুদ্বীপে উঠেছি আমরা,' কিশোর বলল। 'তবে চিন্তা কোরো না। খাবারের কোন না কোন ব্যবস্থা করেই ফেলব।'

হাত দিয়ে গাল ঘষল মুসা। গরম হয়ে গেছে। প্রথম দিকে আরাম লাগলেও চড়া রোদ ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছে।

আরেকটা প্রশ্ন খচখচ করছে ওর মনে। কিন্তু খাবারের ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়ে প্রশ্নটা দূর করে দিল মন থেকে।

'মুসা,' কিশোর বলল, 'পাম গাছগুলোর কাছে গিয়ে দেখো তো আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করা যায় কিনা?'

গাছের জটলার মধ্যে এসে ঢুকল মুসা। জ্বালানোর মত কিছু আছে কিনা দেখতে লাগল। লতার মধ্যে পড়ে থাকা পামের কিছু শুকনো ডালপাতা ছাড়া তেমন কিছু নেই।

প্রশ্নটা আবার বিরক্ত করতে লাগল তাকে। বেরোবে কি করে এ দ্বীপ থেকে?

মহাসাগরের মাঝখানে একেবারেই খুদে একটা দ্বীপে আটকা পড়েছে ওরা। সঙ্গে একটা রবারের ছোট ডিঙি ছাড়া কিছু নেই। এটায় করে লোকালয়ে পৌঁছানো সম্ভব?

না, বাইরের সাহায্য না পেলে সম্ভব না। নিজের মনকে প্রশ্নের জবাবটা দিয়ে দিল সে।

সতেরো

শুকনো কিছু পামের ডালপাতা কুড়িয়ে নিয়ে ফিরে এল মুসা। আগুন জ্বালানোর জন্যে গর্ত খুঁড়ছে কিশোর।

'এনেছ,' ডালগুলো দেখে খুশি হলো কিশোর। 'ভাল। আপাতত চলবে।' নিয়ে নিল মুসার হাত থেকে।

সৈকতে পানির কাছে কি যেন দেখছে রবিন। মাছ খুঁজছে বোধহয়।

কিশোরের পাশে বালিতে বসে পড়ল মুসা। 'কিশোর, কি করব আমরা, বলো তো? আমাদের বোট থেকে কতদূরে আছি, বলতে পারো?'

জোরে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। 'কি করে বলব? কোথায় রয়েছি কিছুই তো জানি না।'

'তাহলে? কি হবে? এই দ্বীপে থেকেই কি শুকিয়ে মরব আমরা? শুধু কয়েকটা নারকেলের পানি দিয়ে কতক্ষণ চলবে? পানির অভাবেই মরে যাব।'

দুটো শুকনো ডালের টুকরো ভেঙে নিয়ে ঘষতে শুরু করল কিশোর। আগুন জ্বালানোর আদিমতম উপায়। 'আমাদের আগুন কারও চোখে পড়তে পারে। প্লেন গেলে, কিংবা কাছাকাছি জাহাজ-টাহাজ থাকলে দেখতে পাবে। হিরুচাচা ফিরে এসে জলপরীকে নির্জন ভাসতে দেখলে নিশ্চয় আমাদের খোঁজে বেরোবে।'

শূন্য আকাশের দিকে তাকাল মুসা। একটা পাখি পর্যন্ত চোখে পড়ে না। তীর থেকে বহুদূরে বলেই। 'প্লেন! জাহাজ!' আনমনেই বিড়বিড় করতে লাগল সে। 'হুহ্! জনম জনম লেগে যাবে সেই অপেক্ষায় থাকলে। আমরা কি ভাবে নিখোঁজ হয়েছি, সেটাই জানতে পারবেন না হিরুচাচা।'

চিৎকার শুনে ফিরে তাকাল দুজনে। দৌড়ে আসছে রবিন। জোরে জোরে হাত নাড়ছে।

কাছে এসে বলল, 'দেখো, একটা মাছ ধরেছি। খালি হাতেই ধরে ফেললাম।' ওর হাতে ছোট একটা রূপালী রঙের মাছ ছটফট করছে।

'এই পুঁটি মাছের ছাও দিয়ে কি হবে,' শুকনো গলায় বলল মুসা।

মাছটা নিয়ে বালিতে রাখল কিশোর। 'একেবারে কিছু না পাওয়ার চেয়ে তো ভাল।'

'চলো, দেখি বড় কিছু ধরা যায় কিনা,' উঠে দাঁড়াল মুসা।

সৈকত ধরে দৌড়ে চলল সে আর রবিন। কোমর পানিতে নামল। পরিষ্কার পানিতে নিচের বালি দেখা যায়। ছোট ছোট মাছ ঘোরাঘুরি করতে লাগল ওদের ঘিরে।

'দূর, এগুলো একেবারেই ছোট,' মুসা বলল। 'ডক্টর ব্রোগের প্ল্যাঙ্কটন খায়নি মনে হচ্ছে। খাওয়ানো গেলে কাজ হত।'

'কাজ আর কি, দানব হয়ে যেত। আমি ওই মাছ ছুঁয়েও দেখব না,' মুখ বিকৃত করে জবাব দিল রবিন। 'ভাবতেই ঘেন্না লাগে।'

'আরেকটু গভীর পানিতে নামা যাক। বড় মাছ পাওয়া যেতে পারে।'

আরেকটু নামল ওরা। কালো ডোরাকাটা একটা রূপালী মাছ সাঁতরে চলে গেল পাশ দিয়ে।

খাবলা মারল মুসা। ধরতে পারল না। আফসোস করে বলল, 'এইটা মোটামুটি বড়ই ছিল।'

আরেকটা মাছ এল। এটাকেও ধরার চেষ্টা করে পারল না মুসা। তাড়া করল মাছটাকে।

কতটা গভীরে চলে এসেছে খেয়াল রইল না। হঠাৎ পায়ের বুড়ো আঙুলে তীব্র ব্যথা লাগল।

মুহূর্তে সমস্ত পায়ে ছড়িয়ে পড়ল ব্যথাটা।

নিচের দিকে তাকিয়ে ভয়ঙ্কর এক চিৎকার দিয়ে উঠল।

আঠারো

পানির নিচের জীবটার দিকে চেয়ে রয়েছে সে।

কালো রোমশ পিঠ। বাদামী খোলা। ইয়া বড় বড় দাঁড়া।

কিসে ধরেছে বুঝতে পারল মুসা। দানব-কাঁকড়া।

টেবিলের মত বড়। আর যে দাঁড়াটা দিয়ে ধরেছে, সেটা কয়েক ফুট লম্বা রেঞ্চের সমান।

'বাঁচাও!' চিৎকার করে উঠল সে। 'ওহ্! মেরে ফেলল!'

ভাল করে ধরার জন্যে দাঁড়ার মাথার সাঁড়াশি ঢিল করল কাঁকড়াটা। একটানে পা'টা সরিয়ে নিয়ে এল মুসা।

কি ভাবে পানি থেকে সৈকতে এসে উঠল, বলতে পারবে না।

হোঁচট খেয়ে, আছাড় খেয়ে পড়তে পড়তে ছুটল।

'দানব-কাঁকড়া! দানব-কাঁকড়া!' চেঁচাতে লাগল গলা ফাটিয়ে। 'তেড়ে আসছে আমাদের ধরতে!'

খানিক দূর থেকে দেখতে পাচ্ছে রবিন। মুসার পেছন পেছন পানি থেকে উঠতে দেখল কাঁকড়াটাকে। রোমশ পা নেড়ে অবিশ্বাস্য গতিতে ছুটছে।

হাঁ করে তাকিয়ে আছে কিশোর। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে তারও। কাঁকড়া মানুষকে ভয় পায় না, এমন দৃশ্য দেখতে পাবে কোনদিন কল্পনাও করেনি।

দাঁড়া খট-খট করতে করতে ছুটে আসছে কাঁকড়াটা।

'জলদি গাছে উঠে পড়ো!' চিৎকার করে বলল কিশোর।

ছুটে গিয়ে পামের জটলার মধ্যে ঢুকল তিনজনে। বানরের মত গাছ বেয়ে উপরে উঠে গেল মুসা। কাঁকড়ার নাগালের বাইরে। রবিন উঠল তার পেছনে। লাফ দিয়ে আরেকটা গাছের ডাল ধরে ঝুলে পড়ল কিশোর। উঠে গেল ওপরে।

নিচে থেকে তাকিয়ে রইল কাঁকড়াটা। রোমশ দাঁড়া দুটো ওদের দিকে তুলে খট-খট করতে থাকল।

'ধরে যদি রান্না করতে পারতাম!' মুসা বলল। 'পুরো এক হপ্তা খাওয়া যেত।'

'শিওর ওটা ডক্টর ব্রোগের প্ল্যাঙ্কটন খেয়েছে,' রবিন বলল। 'যত বড় তত ক্ষুধা। মানুষকে তাড়া করতেও দ্বিধা করেনি।'

'যত বড় তত শক্তিশালীও বটে। ভয় পাবে কেন?'

দাঁড়া তুলে শব্দ করেই চলেছে কাঁকড়াটা। ওদের ধরার চেষ্টা করতে লাগল। হাস্যকর ভঙ্গিতে পায়ের ওপর একবার উঁচু করছে দেহটা, আবার নিচু করছে; উঁচু করছে, নিচু করছে। কিন্তু যেহেতু ওরা শিকার, ভঙ্গি দেখে হাসি আসছে না কারোরই।

কিছুতেই যাচ্ছে না ওটা। যেন প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছে শিকার না নিয়ে যাবে না।

মুসার মনে হলো কয়েক যুগ পার হয়ে গেছে। বলল, 'আর কতক্ষণ এ ভাবে বসে থাকতে হবে?'

অন্য গাছ থেকে তিক্তকণ্ঠে জবাব দিল কিশোর, 'কাঁকড়াটাকে জিজ্ঞেস করো।'

মটমট করে শব্দ হলো।

প্রথমে কাঁকড়ার দাঁড়ার শব্দই মনে করল মুসা।

আবার মটমট। খুব কাছে।

ওর আর রবিনের ঠিক নিচ থেকে আসছে।

গাছের ডাল!

আতঙ্কিত হয়ে পড়ল দুজনে। বুঝতে পারল, দুজনের ভার সইতে পারছে না ডালটা। ভেঙে যাচ্ছে।

সোজা গিয়ে পড়বে ওরা কাঁকড়াটার অপেক্ষমাণ দাঁড়ার মধ্যে।

চিৎকার করে উঠল মুসা। দুই হাত বাড়িয়ে দিল ওপরের আরেকটা ডাল ধরার জন্যে।

ছুঁয়ে ফেলেছে, সরে গেল আঙুল। হাত আরেকটু লম্বা করে আবার ছুঁলো। আবার সরে গেল।

'পড়ে যাচ্ছি! পড়ে যাচ্ছি!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

মড়াৎ করে পুরোপুরি ভেঙে গেল ডালটা। পড়তে শুরু করল দুজনে।

গরম বালিতে পড়ল মুসা।

লাফ দিয়ে উঠে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। দৌড় দিতে প্রস্তুত।

রবিনকে দেখা গেল কাঁকড়ার পিঠে। মাটিতে গড়িয়ে পড়ার আগেই ওটার একটা দাঁড়া ধরে ফেলল রবিন। সাঁড়াশির নিচের বাঁকা বাহুটা।

ছুটতে শুরু করল কাঁকড়াটা। পানির দিকে।

'ছেড়ে দাও, রবিন, ছেড়ে দাও!' চিৎকার করতে লাগল কিশোর।

কাঁকড়াটা ভয় পেয়ে পালাচ্ছে বুঝে গেছে রবিন। গাছের ডাল সহ অত ভারী একটা দেহ এ ভাবে পিঠের ওপর পড়ায় ভড়কে গেছে, ভেবেছে তাকেই বুঝি আক্রমণ করেছে ডাঙার হতচ্ছাড়া প্রাণীগুলো। পড়িমরি করে পানির দিকে ছুটেছে তাই।

সুযোগ বুঝে লাফ দিয়ে ওটার পিঠ থেকে নেমে পড়ল রবিন। উল্টো দিকে দৌড় মারল।

গাছ থেকে নেমে পড়েছে কিশোর।

রবিনের দিকে তাকিয়ে হাসছে মুসা। 'কাঁকড়াদৌড়টা কেমন লাগল?'

'খারাপ বলা যাবে না,' রবিন বলল। 'একটা বিরাট অভিজ্ঞতা। এ ধরনের দৌড়বিদ আমিই প্রথম, এবং সম্ভবত আমিই শেষ।'

ঝপাং করে গিয়ে পানিতে পড়ল কাঁকড়াটা।

'শেষ কিনা বোঝা যাচ্ছে না,' মুসা বলল। 'প্ল্যাঙ্কটন খেয়ে নিশ্চয় আরও অনেক দানব-কাঁকড়া জন্ম নিয়েছে।'

'তা হয়তো হয়েছে। কিন্তু এ ভাবে দ্বীপে আটকা পড়তেও তো আসবে না কোন মানুষ। যতই কাঁকড়ার পিঠে চড়ার লোভ দেখানো হোক।'

'আমি আর বাপু ওই পানির ধারেকাছে যাচ্ছি না,' হাত নেড়ে জানিয়ে দিল মুসা। 'কে জানে, আরও কত রকমের দানব ঘাপটি মেরে রয়েছে পানির নিচে!' পরক্ষণে ককিয়ে উঠল, 'কিন্তু পানিতে না নামলে মাছ ধরা হবে কি করে? খাব কি? আই, কিশোর?'

কিন্তু কিশোরের নজর অন্য দিকে। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'সর্বনাশ! জোয়ার আসছে! আমাদের ডিঙিটা!'

যেখানে রয়েছে সেখান থেকে চোখে পড়ছে না ওটা। দৌড় দিল সরিয়ে আনার জন্যে।

কিন্তু জায়গামত পাওয়া গেল না ডিঙিটা। দূরে একটা হলুদ বিন্দুর মত চোখে পড়ল ওটা।

জোয়ারের পানিতে ভেসে চলে গেছে।

'যা-ও তিল পরিমাণ ভরসা ছিল, সেটাও শেষ। কোনদিন আর এ দ্বীপ ছেড়ে যেতে পারব না আমরা,' হাঁটু দুটো আপনাআপনি ভাঁজ হয়ে গেল মুসার। ধপ করে বসে পড়ল বালিতে। 'জীবনেও না!'

জবাব দিল না কিশোর। তার মুখের উদ্বিগ্ন ভঙ্গিই বুঝিয়ে দিল যা বোঝানোর।

উনিশ

বাকি দিনটা পামের ছায়ায় বসে কাটিয়ে দিল তিনজনে। খিদে পেলে নারকেল চিবোয়।

'জীবনে আর কোনদিন যদি নারকেল খেয়েছি আমি,' গুঙিয়ে উঠল রবিন। 'যে সব ক্যান্ডিতে নারকেল থাকে, সেগুলোও বাদ।'

কেউ কিছু বলল না। বলার কি আছে?

'এ ভাবে চুপ করে থেকো না, কিশোর,' নীরবতা সহ্য করতে পারছে না রবিন। 'কিছু বলো!'

তার দিকে মুখ ফেরাল কিশোর। 'কি বলব?'

'এখান থেকে বেরোনো কি সম্ভব?'

'বুঝতে পারছ না সেটা? কিসে করে বেরোব? এমন কোন গাছ নেই যে ভেলা বানাব। আর গাছ থাকলেই বা কি হত? কাটতাম কি দিয়ে? সাথে তো একটা পেন্সিল কাটার ছুরিও নেই।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ থাকার পর বলল কিশোর, 'কাঁকড়াটা দেখার পর থেকে একটা কথা ভাবছি।'

'কী!' সাগ্রহে জানতে চাইল মুসা আর রবিন।

'প্রবাল-প্রাচীরটার খুব কাছেই রয়েছি আমরা,' কিশোর বলল। 'ষেটার কাছে নোঙর করা আছে হিরুচাচার বোট।'

'কি করে বুঝলে?' ভুরু নাচিয়ে প্রশ্ন করল রবিন।

'বললাম না, কাঁকড়া। প্ল্যাঙ্কটন খেয়ে ওটা বড় হয়েছে। ডক্টর ব্রোগ নিশ্চয় সমস্ত মহাসাগর জুড়ে ওষুধ ছড়াননি। অল্প কিছু জায়গায় ছড়িয়েছেন। বড়জোর প্রবাল-প্রাচীরকে ঘিরে কয়েক মাইল জায়গার মধ্যে। সেটাই স্বাভাবিক। জায়গা বেশি বড় হলে নজর রাখার অসুবিধে। তাই না?'

'তারমানে ডিঙিটা থাকলে আমাদের বাঁচার একটা উপায় ছিল?' মুসার প্রশ্ন।

'হ্যাঁ। কিন্তু এখন আর কোন উপায় নেই। তা ছাড়া বোটটাকে যদি চোখের সামনেও দেখি, কয়েকশো গজ দূরে, সাঁতরে যাওয়ার সাহস করতে পারব না। পানিতে গিজগিজ করছে ডক্টর ব্রোগের নানা রকম দানব।'

ধীরে ধীরে রাত নামল। চোখের সামনে আকাশটাকে নীল থেকে বেগুনী, বেগুনী থেকে কালো হতে দেখল ওরা।

হঠাৎ ঝটকা দিয়ে সোজা হয়ে বসল মুসা। 'শুনতে পাচ্ছ?'

পিঠ সোজা করল কিশোর। কান পাতল।

'কি শুনব?' জানতে চাইল রবিন।

'সৈকতের বাঁ দিকটা থেকে আসছে, শুনছ না?' মুসা বলল। আতঙ্ক ফুটল তার কণ্ঠে। 'নিশ্চয় কাঁকড়া! দুপুরে ওটা গিয়ে খবর দিয়েছিল আত্মীয়-স্বজনদের, ঝাঁক বেঁধে এখন মানুষ খেতে আসছে।'

কাঁকড়া হলে গাছে উঠে পড়া দরকার। কিন্তু দাঁড়ার খট্-খট্ শব্দ কানে এল না। তার জায়গায় অন্য রকম একটা শব্দ। দুটো বড় প্রাণী পানির কাছে দাপাদাপি করছে।

'তিমি?' রবিনের প্রশ্ন।

'উঁহু!' মাথা নাড়ল কিশোর। 'তীরের এত কাছে এত অল্প পানিতে তিমি আসতে পারবে না। তবে ডলফিন হতে পারে। চলো, দেখে আসি।'

'যদি কাঁকড়ার মত কোন দানব হয়?' ভয় পাচ্ছে মুসা।

'এমনিতেও মরব, ওমনিতেও। দেখেই মরি।' উঠে দাঁড়াল কিশোর।

দেখার মত আলো আছে এখনও। কিছুদূর এগোতেই অস্পষ্ট আলোয় সাদা বালির পটভূমিতে যে জিনিসটা চোখে পড়ল ওদের, দেখে বিশ্বাস করতে পারল না।

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। 'আমাদের ডিঙিটা না? খেলছে মনে হয় ওটা নিয়ে...'

'তাই তো মনে হচ্ছে!' রবিন বলল। 'ডলফিনরা খেলতে খেলতে ঠেলে নিয়ে এসেছে।'

কিন্তু 'ডলফিনদের' ওপর নজর পড়তেই থমকে গেল কিশোর। বড় বড় হয়ে গেল চোখ। ঠেলে বেরিয়ে আসবে যেন।

দুটো প্রাণী। আকারে ডলফিনের সমানই হবে। কিন্তু এ রকম জীব চোখে দেখা তো দূরের কথা, কল্পনাও করেনি কোনদিন। মানুষ আর মাছের মিশ্রণ। গায়ে বড় বড় আঁশ। ডিঙির কাছ থেকে কয়েক গজ দূরে বসে আছে।

ওদের দেখে উঠে দাঁড়াল একটা জীব। এগিয়ে আসতে লাগল।

'ব্বাবাগো! ভূত!' বলে দৌড় মারতে গেল মুসা।

তার হাত চেপে ধরল কিশোর। 'চুপ!'

বেশ কিছুটা দূরে থাকতেই ওদের উদ্দেশে কথা বলে উঠল জীবটা, 'যাও,

নৌকায় উঠে বসো।' মানুষের স্বরেই বলেছে, তবে বিকৃত।

'তো-তো-তো-তোমরা কারা!' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'অত কথার দরকার নেই,' ধমকে উঠল জীবটা। 'যা বলছি করো।'

আদেশ পালন করা ছাড়া গতি নেই। ধীর পায়ে গিয়ে ডিঙিতে উঠে বসল তিনজনে।

এগিয়ে এল অন্য জীবটা। নৌকার দুটো দড়ির মাথা তুলে নিল দুজনে। তারপর নৌকাটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে পানিতে নেমে সাঁতরাতে শুরু করল।

'ঘোড়ার গাড়ির কথা জানি,' ফিসফিস করে বলল মুসা। 'কিন্তু ভূতের ডিঙি এই প্রথম দেখলাম। জলভূত!'

তার কথার জবাব দিল না কেউ।

কিশোর তাকিয়ে রয়েছে দ্বীপটার দিকে। অস্পষ্ট কালো একটা ছায়ার মত লাগছে। ছোট হতে হতে মিলিয়ে গেল ছায়াটা।

শান্ত সাগর।

সময়ের হিসেব রাখল না ওরা। কতক্ষণ ধরে ডিঙিটাকে টেনে নিয়ে চলল জীব দুটো, বলতে পারবে না।

আগের রাতে ছিল ঝড়। আজ পড়েছে কুয়াশা। চাঁদ থাকলেও কয়েক হাত দূরের জিনিস চোখে পড়ত কিনা সন্দেহ।

হঠাৎ কুয়াশার মধ্যে সাদাটে বড় একটা কি যেন চোখে পড়ল বলে মনে হলো। আরও কাছে আসতে বোঝা গেল জিনিসটা কি।

একটা বোট।

জলপরী!

বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না কিশোরের। মনে হলো স্বপ্ন দেখছে। পুরোটাই স্বপ্ন। আসলে এখন দ্বীপেই রয়েছে সে। দ্বীপে পামের গায়ে হেলান দিয়ে বসে ঘুমাচ্ছে। ঘুমের মধ্যেই এ সব দেখতে পাচ্ছে।

চোখ মিটমিট করে আবার তাকাল। না, আছে বোটটা।

স্বপ্ন নয়।

আজব প্রাণী দুটো বোটের কাছে পৌঁছে দিয়েছে ওদের। কারা ওরা? সাগরের মানুষ? মৎস্য-কন্যার মত?

সে-সব পরে ভাবা যাবে। বোটটা যখন পাওয়া গেছে, উঠে পড়া দরকার।

জীব দুটোকে ধন্যবাদ দেয়ার জন্যে ফিরে তাকাল সে।

নেই ওগুলো। ডিঙিটাকে বোটের কাছে পৌঁছে দিয়ে উধাও হয়ে গেছে।

বিশ

ডেক-এ উঠে রীতিমত নাচতে শুরু করে দিল মুসা।

কিন্তু রবিন এখনও ভয় পাচ্ছে। কিশোরের মত তারও মনে হচ্ছে স্বপ্ন। জেগে

উঠলেই ভেঙে যাবে এই সুখস্বপ্নটা।

'আমি আর দাঁড়াতে পারছি না,' মুসা বলল। 'রান্নাঘরে যাচ্ছি। কয়েক হাজার প্যানকেক লাগবে আমার পেট ভরাতে।'

'দুঃখিত,' বলে উঠল একটা গমগমে ভারী কণ্ঠ, 'প্যানকেক খাওয়ার আশাটা ছাড়তে হবে।'

বরফের মত জমে গেল তিন গোয়েন্দা। পরিচিত কণ্ঠস্বর।

পটাপট জ্বলে উঠল কেবিনের চারপাশের আলোগুলো। কেবিন থেকে আলোকিত ডেক-এ বেরিয়ে এলেন ডক্টর ব্রোগ।

'খাওয়া লাগবে না, তার কারণ,' বললেন তিনি, 'বেশিক্ষণ আর ক্ষুধার্ত থাকছ না তোমরা।'

'আপনি!' প্রায় ফিসফিস করে বলল রবিন।

'হ্যাঁ, আমি,' সন্তুষ্টির হাসি হাসলেন ডক্টর ব্রোগ। 'তোমরা কি ভেবেছিলে? পার পেয়ে যাবে? আমার হাত থেকে পালিয়ে বাঁচবে?'

ডক্টর ব্রোগের বোটটা দেখতে পেল জলপরীর সঙ্গে বাঁধা। লেস আর কিপকে কোথাও দেখা গেল না। কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'আপনার সহকারীরা কোথায়?'

'আশেপাশেই আছে,' ডক্টর ব্রোগ বললেন। 'আমি ডাকলেই চলে আসবে। যদি ভেবে থাকো, ওরা না থাকলে তোমাদের সুবিধে হবে, আমাকে কাবু করে আবার পালাবে, ভুল করবে।'

চুপ করে রইল তিন গোয়েন্দা।

'যাও, নিচে যাও,' আদেশ দিলেন ডক্টর ব্রোগ।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল তিন গোয়েন্দা।

'যাবে? না অন্য ব্যবস্থা করব?' ধমকে উঠলেন ডক্টর ব্রোগ।

'কি চান আসলে আপনি, ডক্টর ব্রোগ?' ক্লান্ত শোনাল কিশোরের কণ্ঠ। 'এখানে এসে বসে ছিলেন কেন?'

ভ্রূকুটি করলেন ডক্টর ব্রোগ। 'সহজ কথাটা বুঝতে পারছ না? ডিঙি নিয়ে পালানোর পর ধরেই নিয়েছিলাম, এখানে আসবে তোমরা। তাই এসেছিলাম। যখন দেখলাম নেই, তখন ভাবলাম, হয় ডুবে মরেছ, নয়তো আশেপাশের কোন দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছ। ডুবে মরেছ, এটা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, যা বেপরোয়া তোমরা। তখন লোক পাঠালাম দ্বীপগুলোতে খুঁজে দেখতে। দেখা যাচ্ছে, আমার অনুমানই ঠিক।' এক মুহূর্ত থেমে আবার বললেন ডক্টর ব্রোগ, 'আমার গোপন কথা জেনে ফেলেছ তোমরা। কোনমতেই আর ছাড়তে পারি না আমি তোমাদের।'

'কিন্তু আমরা আপনাকে কথা দিচ্ছি, ডক্টর,' রবিন বলল, 'এ কথা কোনদিন কারও কাছে ফাঁস করব না আমরা।'

হেসে উঠলেন ডক্টর ব্রোগ। 'এ কথা তো বহুবারই বলেছ। কিন্তু আমার কথা শোনো। কারও দেয়া কথা বিশ্বাস করে ভোগার চেয়ে শিওর হয়ে যাওয়াটাই কি উচিত নয়?'

'তারমানে আপনি আমাদের খুনই করবেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। বরফের মত শীতল তার কণ্ঠ।

'না। এখন আমি মত বদল করেছি। দল বড় করতে চাই।' রহস্যময় কণ্ঠে জবাব দিলেন ডক্টর ব্রোগ। 'যাও। নিচে নামো।'

ল্যাবরেটরিতে নেমে এল তিন গোয়েন্দা। পেছন পেছন এলেন ডক্টর ব্রোগ।

একটা কেবিনেটের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। যেটাতে রয়েছে প্ল্যাঙ্কটনের বোতলগুলো।

'এই স্যাম্পলগুলো প্রবাল-প্রাচীরের কাছ থেকে জোগাড় করেছ তোমরা,' বোতলগুলো দেখালেন ডক্টর ব্রোগ, 'তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'হিরুচাচা করেছেন। আমরাও করেছি কিছু কিছু।'

'গুড। আমার কাজ সহজ করে দিয়েছ তোমরা। বোঝা যাচ্ছে আমার ইনজেক্ট করা প্ল্যাঙ্কটনের বেডের প্রতি তোমাদেরও আগ্রহ প্রচুর।'

'তা তো হবেই,' জবাব দিল কিশোর। 'বলেছিই তো গবেষণা করতে এসেছি আমরা। সাগরের প্রাণী আর উদ্ভিদ ছাড়া কি দিয়ে গবেষণা করব? কোনটা আপনার প্ল্যাঙ্কটন, আর কোনটা স্বাভাবিক, বোঝার কোন উপায় আছে?'

'না, তা নেই,' মাথা নাড়ালেন ডক্টর ব্রোগ। 'ইতিমধ্যে অনেক কিছু জেনে ফেলেছ তোমরা।'

আবার মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'চমৎকার। মানুষের ওপর ওই প্ল্যাঙ্কটন প্রয়োগের বিরূপ প্রতিক্রিয়া কি হয় জানতে চেয়েছিলে না? সেটাই জানতে পারবে এখন। তোমাদেরকে জানানোর সময় হয়েছে।' কেবিনেটটা দেখালেন ডক্টর ব্রোগ। 'এই প্ল্যাঙ্কটন তোমাদের খেতে হবে।'

'মাথা খারাপ!' আঁতকে উঠল মুসা।

'তা হবে কেন? তবে দেহটা বিকৃত হয়ে যাবে তোমাদের। তখন তোমাদের ওপর গবেষণা চালাব আমি। কি করে স্বাভাবিক মানব দেহে আবার রূপান্তরিত করা যায়, দেহটাকে ইচ্ছেমত ছোট করা যায় বড় করা যায়—সাংঘাতিক এক গবেষণার পথিকৃত হবে তোমরা। ভবিষ্যৎ পৃথিবী মাথা নোয়াবে তোমাদের নামে। তোমাদের স্ট্যাচু বানিয়ে মিউজিয়ামে রেখে দেবে।'

'আমাদেরকে আপনার গিনিপিগ বানাতে চান!' শঙ্কিত কণ্ঠে বলল কিশোর। 'কাজটা মোটেও ঠিক করবেন না আপনি। আমাদের ওপর এ রকম একটা মারাত্মক গবেষণা চালানোর কোন অধিকার আপনার নেই।'

'আছে, আছে,' হাসিটা কমল না ডক্টর ব্রোগের। 'গবেষণার ব্যাপারে তোমার কেন, দুনিয়ার কোন মানুষকেই কোন ছাড় দিতে রাজি না আমি। প্রয়োজন হলে নিজের ওপরও চালিয়ে দেখতে পিছপা হব না।'

'তাহলে সেটাই করছেন না কেন?' রাগ করে বলল মুসা। 'আমাদের নিয়ে টানাহেঁচড়া কেন?'

'করছি না কেন? পুরোপুরি সফল হতে পারিনি, বললামই তো। আমার কিছু হয়ে গেলে গবেষণাটা এগিয়ে নিয়ে যাবে কে? গতকাল লেস আর কিপের ওপর পরীক্ষাটা করে দেখেছি।'

'রেজাল্ট কি?' জানতে চাইল মুসা।

রেজাল্ট কি এতক্ষণে বুঝে ফেলেছে কিশোর। 'তারমানে…তারমানে যে অদ্ভুত জীব দুটো আমাদের ডিঙিটা টেনে নিয়ে এসেছে…'

মুচকি হেসে মাথা ঝাঁকালেন ডক্টর ব্রোগ, 'হ্যাঁ, লেস আর কিপ।'

হাঁ হয়ে গেল মুসা আর রবিন।

'একটা সত্যি কথা বলব, ডক্টর ব্রোগ?' নরম কণ্ঠে কিশোর বলল।

অবাক হলেন ডক্টর ব্রোগ। 'বলো?'

'আপনি পাগল হয়ে গেছেন। বদ্ধ উন্মাদ। বুঝতে পারছেন না সেটা। এক কাজ করুন, কেবিনে গিয়ে চুপ করে শুয়ে পড়ুন। যা করার আমরা করছি। তীরে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে পৌঁছে দেব,' আন্তরিক কণ্ঠে কথাগুলো বলল কিশোর।

'কে উন্মাদ, টের পাবে এখনই,' রেগে উঠলেন ডক্টর ব্রোগ।

মুসা রয়েছে তাঁর সবচেয়ে কাছে। তার ঘাড় চেপে ধরলেন তিনি।

'আরে, করছেন কি! ছাড়ুন! ছাড়ুন!' চিৎকার করে উঠল মুসা।

জবাব দিলেন না ডক্টর ব্রোগ। মুসাকে ঠেলে নিয়ে গেলেন কাঁচের কেবিনেটটার কাছে। গায়ে তাঁর অসুরের শক্তি। মুসার মুখটা ঠেলে দিলেন সারি সারি বোতলের দিকে।

'নাও, একটা বোতল তুলে নাও,' বললেন তিনি। 'যেটা খুশি।'

মুসা তুলছে না দেখে ঘাড়ে ধাক্কা মারলেন। একটা বোতলের মুখের ঠোকা লাগল কপালে।

'তোলো!' ধমকে উঠলেন ডক্টর ব্রোগ। 'ওই প্ল্যাঙ্কটন খেতেই হবে তোমাকে।'

একুশ

বোতলগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে মুসা।

'নাও!' ডক্টর ব্রোগ বললেন। 'নিচ্ছ না কেন? জোর করে গলায় ঢালব কিন্তু বলে দিলাম।'

আর কোন উপায় দেখল না মুসা।

মাঝের তাকের বাঁ দিকের শেষ বোতলটা তুলে নিল সে।

তাকিয়ে রইল ওটার দিকে। জঘন্য ঘোলাটে তরলটার দিকে।

কি খেতে চেয়েছিল আর কি পেল! প্যানকেক। হাহ্!

'নাও, গিলে ফেলো এবার,' আদেশ দিলেন ডক্টর ব্রোগ। 'রূপান্তর ঘটতে দু'তিন মিনিটের বেশি লাগবে না। যন্ত্রণা বা কোন কিছু টের পাবে না। কিপ আর লেস আমাকে বলেছে। বরং সাংঘাতিক এক ক্ষমতা পেয়ে গিয়ে ওরা মহাখুশি। ডাঙায় আর পানিতে সমান ভাবে চলার ক্ষমতা, সেই সঙ্গে মানুষের ব্রেন। আনন্দে ওরা আমার পায়ে চুমু খেতে বাকি রেখেছে কেবল। তোমরাও খাবে…'

'আমরা ওদের মত পাগল নই,' কিশোর বলল। 'ওরাও পাগল। আপনার

মতই।'

রাগে জ্বলে উঠল ডক্টর ব্রোগের চোখ। 'তা-ই যদি ভাবো, তাহলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তোমরাও হবে!'

বোতলের ছিপি খুলল মুসা।

'আরে কি করছ?' চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'পাগল হয়ে গেলে নাকি তুমিও? বলল খেতে আর অমনি খেয়ে ফেলছ। না খেলে কি করবে ও?'

কিন্তু কিশোরের কথা শুনল না মুসা। ঠোঁটে লাগাতে গেল বোতলের খোলা মুখটা।

'থামো, মুসা!' মুসার কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গেছে কিশোর। প্ল্যাঙ্কটনের গন্ধেই পাগল হয়ে গেল নাকি! মুসা যাতে খেতে না পারে, সে-জন্যে বোতলটা চেপে ধরে রেখে ডক্টর ব্রোগের দিকে তাকাল, 'ডক্টর ব্রোগ, দয়া করে এ সব পাগলামি থামান। আমাদের যেতে দিন।'

'না, সেটা আর হয় না,' ডক্টর ব্রোগ বললেন। 'কেন হয় না, বহুবার বলেছি।'

'আপনার নিজের সাহায্য দরকার, ডক্টর ব্রোগ। মগজ ঠিকমত কাজ করছে না। আপনি একজন ব্রিলিয়ান্ট মানুষ। মস্তবড় বিজ্ঞানী হতে পারবেন।'

'মস্তবড় বিজ্ঞানী আমি হয়েই গেছি,' জবাব দিলেন ডক্টর ব্রোগ। 'সেটাই তো প্রমাণ করতে চাইছি তোমাদের কাছে। নাও, মুসা, গিলে ফেলো।'

'যতবড় ব্রেনই হোক আপনার, মানুষের ক্ষতি করলে কেউ আপনাকে বড় বিজ্ঞানী বলবে না,' হাল ছাড়ল না কিশোর। 'আমাদের যেতে দিন। কথা দিচ্ছি, আপনার গোপন এই আবিষ্কারের খবর কোনদিন কাউকে জানাব না আমরা। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। সুস্থ হওয়ার পর সত্যি সত্যি পৃথিবীর অনেক উপকার করতে পারবেন আপনি।'

'তুমি একটা গাধা, কিশোর পাশা,' দাঁত খিঁচালেন ডক্টর ব্রোগ। 'মুসার পর তোমাকে বানানো হবে মৎস্য-মানব।'

থাবা মেরে কিশোরের হাতটা বোতল থেকে সরিয়ে দিলেন ডক্টর ব্রোগ। মুসাকে বললেন, 'দেরি করছ কেন? গিলে ফেলো। নইলে কি করব জানো? বাঁচতে আমি দেব না তোমাদের। সাগরে ছুঁড়ে ফেলব। দানবের খাবার হবে শেষে। তারচেয়ে বেঁচে থাকাই কি ভাল না? যে কোন রূপেই হোক?'

চুমুক দিয়ে মুখ ভর্তি করল মুসা।

গিলে ফেলল।

জঘন্য স্বাদ।

কিন্তু কি করবে?

না খেলে…

বাইশ

মুখ বিকৃত করে ফেলল মুসা।

জোর করে যেন শান্ত করল নিজেকে। দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। অপেক্ষা করছে। প্রতিটি পেশী টানটান।

সবাই তাকিয়ে আছে তার দিকে। ওরাও কেউ নড়ছে না।

চোয়াল কাঁপতে শুরু করেছে রবিনের। আচমকা ককিয়ে উঠল, 'এ কি করলে, মুসা? কেন খেলে? কেন আছাড় মেরে ভেঙে ফেললে না?'

'লাভটা কি হত?' খসখসে কণ্ঠে জবাব দিল মুসা। 'আরেকটা বোতল নিতে আমাকে বাধা করত।'

এক মিনিট গেল। দুই। তিন।

ডক্টর ব্রোগ বললেন, 'এবার শুরু হবে রূপান্তর।'

কিন্তু দাঁড়িয়েই আছে মুসা। মৎস্য-মানবে পরিণত হচ্ছে না।

'কই,' অবশেষে বলল কিশোর, 'পরিবর্তন তো দেখতে পাচ্ছি না।'

'যাক না আরও দু'এক মিনিট সময়,' ডক্টর ব্রোগ বললেন। 'বিচ্ছু ছেলে তো। মনের জোরে হরমোনের ক্রিয়াকেও ঠেকিয়ে দিয়েছে হয়তো। কিপের বেলায় মাত্র দুই মিনিট লেগেছিল।'

নীরব হয়ে গেল আবার ঘরটা। মুসার মৎস্য-মানব হওয়ার অপেক্ষা করছে সবাই।

পেটের মধ্যে অস্বস্তিকর অনুভূতি বাদে আর কিছু টের পাচ্ছে না মুসা।

জোরে নিঃশ্বাস ফেলল সে। পায়ের ওপর ভর বদল করল।

'কই, পাঁচ মিনিট তো শেষ,' কিশোর বলল। 'ডক্টর ব্রোগ, মনে হয় আপনার প্ল্যাঙ্কটনের ক্ষমতা ফুরিয়ে গেছে।'

ভ্রূকুটি করলেন ডক্টর ব্রোগ। ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল চেহারা। 'অসম্ভব! কাজ হতেই হবে। না হয়ে যায় না।'

মুসার দুই কাঁধ চেপে ধরে ঝাঁকাতে শুরু করলেন তিনি। 'হও! জলদি! মৎস্য-মানব হয়ে যাও!'

প্রচণ্ড এক ঠেলা মেরে সরিয়ে দিল তাঁকে মুসা। পড়ে যেতে যেতে বাঁচলেন কোনমতে।

ঝাপটে ধরল তাঁকে কিশোর। ধাক্কা দিয়ে সরাতে না পেরে প্ল্যাঙ্কটনের আরেকটা বোতল তুলে নিলেন।

তুলে ধরলেন কিশোরের মাথায় বাড়ি মারার জন্যে।

'সাবধান, কিশোর!' চিৎকার করে উঠল রবিন।

বাড়ি মারলেন ডক্টর ব্রোগ।

ঝট করে মাথা সরিয়ে ফেলল কিশোর। বসে পড়ল।

লাগাতে না পেরে ভারসাম্য হারালেন ডক্টর ব্রোগ। এই সুযোগে বোতলটা কেড়ে নিল মুসা।

আবার তাকে ঝাপটে ধরতে গেল কিশোর। তাকে পাশ কাটিয়ে সিঁড়ির দিকে দৌড় দিলেন ডক্টর ব্রোগ। নিশ্চয় লেস আর কিপকে ডাকতে।

'ডেক-এ চলে যাচ্ছে!' চিৎকার দিয়ে উঠল রবিন।

তাড়া করল তিনজনে। ডেক-এ উঠে এল ডক্টর ব্রোগের পিছু পিছু। ভোর হয়ে আসছে তখন।

ডক্টর ব্রোগের পা সই করে ঝাঁপ দিল কিশোর। তাঁকে নিয়ে পড়ল ডেক-এর ওপর। গড়াগড়ি খেতে শুরু করল।

হাতের বোতলটা নামিয়ে রাখল মুসা।

'নামুন! নামুন ওর ওপর থেকে!' কিশোরের ওপর থেকে ডক্টর ব্রোগকে টেনে নামানোর চেষ্টা করতে লাগল সে।

কনুইয়ের ধাক্কায় তাকে সরিয়ে দিলেন ডক্টর ব্রোগ। তাঁর দুই বাহু চেপে ধরল কিশোর। আবার ডেকময় গড়াগড়ি খেতে শুরু করল দুজনে।

'কিশোর, বেশি কিনারে চলে যাচ্ছ কিন্তু!' চেঁচিয়ে সাবধান করল মুসা।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। ডক্টর ব্রোগও উঠতে যাচ্ছিলেন, তার পেট সই করে ডাইভ দিল সে। তাঁকে নিয়ে আবার পড়ল ডেক-এ। কিনার থেকে দূরে।

'রবিন! জলদি! দড়ি নিয়ে এসো!' কিশোর বলল।

ডেক-এ দড়ির অভাব নেই। হাতের কাছে যেটা পেল সেটা নিয়েই ছুটে এল রবিন।

'বেঁধে ফেলো। বেঁধে ফেলো।' বলল কিশোর। 'মুসা, চেপে ধরো। সাহায্য করো আমাকে।'

ছুটে আসতে গিয়ে হোঁচট খেল মুসা। হাঁটু মুড়ে পড়ল ডক্টর ব্রোগের পেটের ওপর।

ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠলেন ডক্টর ব্রোগ, 'মেরে ফেলেছেরে! আমার পেট!'

ছাড়ল না মুসা। ডক্টর ব্রোগের বুকে চেপে বসে দুই হাত চেপে ধরল ডেক-এর সঙ্গে। মুহূর্ত দেরি না করে তাঁর এক কব্জিতে দড়ি পেঁচানো শুরু করে দিল রবিন। নাবিকরা যে ভাবে পালের দড়িতে গিট দেয়, সে-ভাবে দেয়ার চেষ্টা করল। পারল না। ভুলে গেছে।

মুসার নিচ থেকে সরে যাওয়ার জন্যে ছটফট করছেন ডক্টর ব্রোগ।

'আরে জলদি করো না!' মুসা বলল। 'সরে যাচ্ছে তো!'

রবিনকে সাহায্য করতে এল কিশোর। 'ডক্টর ব্রোগ, এবার হার স্বীকার করুন। আমরা আপনাকে কিছু করব না, ইনটারন্যাশনাল সী লাইফ পেট্রলের হাতে তুলে দেব।'

'জিন্দেগীতেও না!' সাংঘাতিক এক ঝাঁকুনি দিয়ে মুসাকে ওপর থেকে ফেলে দিলেন ডক্টর ব্রোগ।

ডেক-এর ওপর উল্টে পড়ল মুসা।

হ্যাঁচকা টানে রবিনের হাত থেকে দড়িটা ছুটিয়ে নিলেন ডক্টর ব্রোগ।

পিট যেটা দিয়েছে সে, শক্ত হয়নি।

আবার তাঁকে ধরতে গেল কিশোর। পারল না। গড়িয়ে সরে গেলেন ডক্টর ব্রোগ। ছোঁ দিয়ে তুলে নিলেন ডেক-এ রাখা প্ল্যাঙ্কটনের বোতল।

উঠে দাঁড়ালেন। বোতলটা ওদের দিকে নেড়ে বললেন, 'কারও হাতেই তুলে দিতে পারবে না আমাকে।'

এক টানে বোতলের ছিপি খুলে ফেলে কাত করে ধরলেন হাঁ করা মুখে। চকচক করে গিলতে শুরু করলেন প্ল্যাঙ্কটনের গাদ।

তেইশ

'কাজ করবেই!' জেদ চেপে গেছে যেন ডক্টর ব্রোগের। 'এ জিনিস কাজ করতে বাধ্য। আমি তোমাদের কাছে প্রমাণ করে ছেড়ে দেব।'

খালি বোতলটা ছুঁড়ে ফেললেন তিনি। বোতল ভেঙে কাঁচ ছড়িয়ে পড়ল ডেকময়।

'আপনি আমাদের বোকা বানাতে পারবেন না,' রবিন বলল। 'নিজের চোখেই তো দেখলাম, মুসা ওই জিনিস খেয়েছে। কিছুই হয়নি ওর।'

কিন্তু কাঁপতে শুরু করেছে ডক্টর ব্রোগের দেহ। দ্রুত পরিবর্তন আসতে শুরু করল চামড়ায়। নীলচে-রূপালী হয়ে যাচ্ছে রঙ।

'সত্যিই কিছু একটা ঘটছে!' কিশোর বলল।

আরও নানা রকম পরিবর্তন ঘটতে থাকল ডক্টর ব্রোগের দেহে। আঁশ গজানো শুরু হলো। এত দ্রুত যে কোন একটা দেহে এত পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

'তাই তো!' মুসা বলল। 'কাজ তো সত্যিই করছে!'

'অবিশ্বাস্য!' হাঁ করে তাকিয়ে আছে রবিন।

'দেখলে তো?' বিকৃত হয়ে গেছে ডক্টর ব্রোগের কণ্ঠস্বর। 'প্রমাণ করে দিলাম।'

অদ্ভুত ভঙ্গিতে ডেক-এর ওপর দিয়ে থপ্ থপ্ করে হেঁটে ডেক-এর কিনারে এগিয়ে গেলেন তিনি। পায়ের পাতায়ও পরিবর্তন আসছে। সাঁতার কাটার সুবিধের জন্যে।

কেউ বাধা দেয়ার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন পানিতে।

ডেক-এর কিনারে দৌড়ে এল তিন গোয়েন্দা। ভুরভুরি তুলে পানিতে ডুবে যেতে দেখল ডক্টর ব্রোগকে।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে পিছিয়ে এল রবিন। বসে পড়ল ডেক-এর ওপর।

'মনে হচ্ছে এবারকার মত বেঁচে গেলাম,' কিশোর বলল।

'বেশিক্ষণ বাঁচব না,' মনে করিয়ে দিল মুসা, 'যদি এখনও পেটকে কিছু না সরবরাহ করা যায়।'

নিচে নামল ওরা। ল্যাবরেটরিতে ঢুকে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। 'কি অবস্থা হয়ে আছে ঘরটার। হিরুচাচা এসে দেখলে...সাফ করে ফেলা দরকার।'

কেবিনেটের কাছে চলে গেল রবিন। মুসার দিকে তাকিয়ে চোখের পাতা সরু করে বলল, 'মুসা, সত্যি তুমি প্ল্যাঙ্কটন খেয়েছিলে?'

ভুরু নাচাল মুসা, 'খেয়েছি তো। নিজের চোখেই তো দেখলে।'

'তাহলে ডক্টর ব্রোগের মত মৎস্য-মানব হয়ে গেলে না কেন?'

'কারণ, আমি সাধারণ মানুষ নই। সুপারম্যান।'

'সুপারম্যান না কচু,' মুখ ঝামটা দিল রবিন। 'ফালতু কথা বলে আমাকে বোকা বানাতে পারবে না। আসল কথাটা বলে ফেলো।'

দুই হাত বুকের ওপর আড়াআড়ি রেখে দাঁড়াল কিশোর। 'হ্যাঁ, মুসা, বলে ফেলো না। আমারও খুব কৌতূহল হচ্ছে।'

হাসল মুসা। 'এখনও যে মানুষ রয়েছি, সেটা রবিনের কল্যাণে। তার একটা ধন্যবাদ পাওয়া উচিত।'

'আমি?' রবিন অবাক। 'কই, আমি আবার কি করলাম?'

'পরস্পরকে বোকা বানানোর খেলা খেলছিলাম আমরা, ভুলে গেছ? তুমি অক্টোপাস হলে, আমি হাঙর হয়ে ভয় দেখাতে যাচ্ছিলাম, আসল হাঙরটার জ্বালায় পারলাম না। তখন আরেকটা বুদ্ধি করলাম।' হাসল মুসা। 'কেবিনেট থেকে একটা বোতল রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে সব প্ল্যাঙ্কটন ফেলে দিলাম।'

'তারপর?' ভুরু নাচাল রবিন।

'বোতলটা ভাল করে ধুয়ে নিলাম,' মুসা বলল। 'তার মধ্যে ভরে রাখলাম চা পাতা গোলানো পানি। গোলানোর পর পাতাগুলো ছেঁকে ফেলে দিয়ে সামান্য মাখন মিশিয়ে নিতেই কেমন ঘোলাটে হয়ে গিয়েছিল পানিটা, একেবারে সাগর থেকে পানি সহ তুলে আনা প্ল্যাঙ্কটনের রঙ। উদ্দেশ্যটা ছিল, তোমাকে এখানে নিয়ে এসে ওই জিনিস খেয়ে বাহাদুরি দেখানো। এ রকম ভয়ঙ্কর প্ল্যাঙ্কটন খেয়েও হজম করে ফেলেছি দেখলে চোখ কপালে উঠত তোমার।'

মুচকি হাসল কিশোর। 'তাই তো বলি, বলার সঙ্গে সঙ্গে বোতল তুলে নেয়া...আমি তো ভাবছিলাম পাগল হয়ে গেছ।'

হাসতে শুরু করল রবিন।

হাসি আর থামে না।

'মজার ব্যাপার, সন্দেহ নেই,' রবিনের দিকে তাকিয়ে রইল মুসা, 'কিন্তু তুমি যে ভাবে হাসছ, এত হাসির তো কিছু দেখছি না!'

'এ কোন বাহাদুরি হলো?' হাসতে হাসতে বলল রবিন। 'আমি দেখো, আসল প্ল্যাঙ্কটন খেয়েই হজম করে ফেলছি। কিছু হবে না আমার।'

'অত সহজ না!' জোরে জোরে মাথা নাড়ল মুসা। 'ডক্টর ব্রোগই বাঁচতে পারলেন না...'

'দেখতে চাও?' চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল রবিন।

'দেখাও!' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল মুসা।

জেদ চেপে গেল যেন রবিনের। ধাঁ করে কেবিনেট থেকে একটা বোতল তুলে

নিয়ে ছিপি খুলে কেউ বাধা দেয়ার আগেই ঢকঢক করে গলায় ঢেলে দিল ঘোলাটে তরল।

চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে মুসা। কিশোর নির্বিকার।

মিনিট দুই পর আচমকা পেট চেপে ধরল রবিন। অদ্ভুত গোঙানি বেরিয়ে এল গলা থেকে। বিকৃত হয়ে গেছে মুখ।

সর্বনাশ! এ কি করেছে রবিন!

লাফ দিয়ে এগিয়ে এল কিশোর। চেপে ধরল রবিনকে। 'কি হলো, রবিন? খুব কষ্ট হচ্ছে?' নির্বিকার ভাবটা চলে গেছে তার।

সোজা হয়ে দাঁড়াল রবিন। আবার হাসতে শুরু করল। মুসার দিকে তাকাল, 'কি বুঝলে? কিশোর পাশাকে পর্যন্ত একচোট নিয়ে নিলাম।'

রবিনকে ছেড়ে দিল কিশোর। বোকা হয়ে তাকিয়ে থেকে বলল, 'তুমিও কিছু করে রেখেছিলে!'

'হ্যাঁ,' হেসে মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'কাকতালীয়ই বলতে পারো। আমিও একই কাণ্ড করেছি। মুসাকে বোকা বানানোর জন্যে চা পাতা গোলানো পানি ভরে রেখেছিলাম বোতলে। ডক্টর ব্রোগ আমাকে প্ল্যাঙ্কটন খেতে বললে দিব্যি বোতল তুলে মুসার মতই খেয়ে ফেলতাম। কিন্তু বিপদটা হত তোমাকে যদি আগে খেতে বলত।'

'ভাগ্যিস বলেনি!' মৎস্য-মানবের চেহারা কল্পনা করে শিউরে উঠল কিশোর।

-: শেষ :-

সীমান্তে সংঘাত

প্রথম প্রকাশ: ২০০১

'অ্যাই, সাগর দেখতে পাচ্ছি!' চিৎকার করে জানাল রবিন।

অনেক উঁচু একটা পাইন গাছের সবচেয়ে নিচু ডালটায় উঠে বসেছে সে। আর গাছটা রয়েছে অ্যাপাল্যাশিয়ান পর্বতমালার একটা আকাশ ছোঁয়া শৃঙ্গের ওপর। মাথার ওপরে গ্রীষ্মের দারুণ সুন্দর আকাশ। দিগন্তরেখা ছেড়ে এসেছে সূর্য।

'অসম্ভব!' বিশ ফুট নিচ থেকে চিৎকার করে বলল তাকে রিচি। 'সাগর এখান থেকে অন্তত একশো মাইল দূরে। লেক-টেক দেখেছ বোধহয়।'

'পড়লে তো ঘাড় ভাঙবে!' সাবধান করল কিশোর। 'জলদি নেমে এসো!'

মুখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে আছে রিচি, কিশোর, মুসা আর টম।

'না, পড়ব না,' ডাল দোলাতে দোলাতে বলল রবিন। 'দারুণ মজা লাগছে কিন্তু!'

'পড়লে মজা বুঝবে!' কিশোর বলল আবার। 'নামো, নামো। তোমার জন্যে নাস্তা করতে বসতে পারছি না আমরা।'

'আহ্, জ্বালালে!' মুখ বাঁকাল রবিন। 'এত সুন্দর দৃশ্যটা দেখতে পারলাম না তোমাদের জন্যে!' অনিচ্ছা সত্ত্বেও নেমে আসতে শুরু করল সে।

'খাইছে! আমাকে বাদ দিয়ে আবার সেরে ফেলো না,' সাবধান করল মুসা। তার হাতে একটা খুদে গেম-মেশিন। তাতে 'বীয়ার হান্টার' নামে একটা গেম খেলে যাচ্ছে সে। 'আমি তো আরও ভাবছিলাম, আজ বুঝি নাস্তাটাই হবে না।'

'বনের মধ্যে এই বেকুবের খেলাটা কেন খেলছ, বলো তো?' টম বলল। 'আসল বনে ঢুকেছি আমরা। পথে জ্যান্ত ভালুকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলেও অবাক হব না। তখন ইচ্ছে করলে ওগুলোর সঙ্গে খেলে নিও।'

'মজাটাই তো বুঝলে না তুমি,' মুসা বলল। 'ওগুলো আর এটা কি এক হলো? এগুলোর সঙ্গে হারলে বোতাম টিপে দিয়ে আবার প্রথম থেকে শুরু করা যাবে। আর ওগুলোর সঙ্গে হারলে...'

'কোন একটা ভাগ্যবান ভালুকের আর কয়েক বেলার খাবার চিন্তা থাকবে না,' মুসার বিরাট দেহটাকে ইঙ্গিত করে খোঁচা মারল রিচি বুমার।

ওয়েইট লিফটারের মত দেহ টমের। পঁচাত্তর পাউন্ড ওজনের মালপত্র নিয়ে পাহাড়ী পথে চলতেও বিন্দুমাত্র টলে না। ওর স্লীপিং ব্যাগের পাশে ফেলে রাখা ব্যাকপ্যাক বোঝাই খাবারগুলো টেনে নিয়ে বলল, 'এসো তো কেউ, ভাগ করে

দিতে সাহায্য করো আমাকে।'

'আমি আসছি,' মুসা বলল।

'তোমার দরকার নেই,' প্রায় লাফ দিয়ে এসে পড়ল কিশোর। 'ভাগটা আমিই করছি। আগেরবার তোমাকে দেয়া হয়েছিল, মনে আছে, গরুর গোশ্তগুলো সব ভাগ করতে করতেই সাফ করে ফেলেছিলে?'

'ওটা একটা দুর্ঘটনা,' প্রতিবাদ জানাল মুসা।

গাছ থেকে নেমে দৌড়ে এল রবিন। গায়ের টি শার্ট আর পরনের নীল জিনসে ময়লা লেগে আছে গাছ বেয়ে নামাতে। 'এই যে, আমি এসে গেছি। বনের মধ্যে রাত কাটিয়ে সকাল বেলা গাছ বাওয়ার মত দারুণ ব্যায়াম আর নেই। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। আমার জন্যে রেখেছ কিছু?'

'বসে পড়ো,' সরে জায়গা করে দিল কিশোর।

নাক-মুখ বিকৃত করে খাবারগুলোর দিকে তাকাল রবিন। পছন্দ হয়নি। দুই টিন সার্ডিন, পাঁচটা হোল গ্রেইন ক্র্যাকারস, আর পাঁচ ক্যান্টিন পানি।

'আবার সার্ডিন!' গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'সাত দিন আগে বেরোনোর পর থেকে নতুন কিছু আর চোখে দেখলাম না। কিন্তু এত সামান্যতে কি পেট ভরে? কমসে কম আরও এক টিন সার্ডিন খুললে তো পারো।'

'রওনা দেয়ার সময় আলোচনা করে ঠিক করে নিয়েছিলাম আমরা,' কিশোর বলল, 'নাস্তাটা সার্ডিন দিয়েই চালাব।'

'জঘন্য!' টম বলল।

'আরেক কাজ করা যায় তাহলে,' বলল কিশোর, 'সামনে যেখানেই দোকান পাওয়া যাবে, দুই সপ্তাহের জন্যে দামী দামী খাবার কিনে নিতে পারি আমরা। কিন্তু বোঝাটা বইবে কে? তুমি?'

'না না, ধন্যবাদ,' দুই হাত নাড়তে লাগল টম। 'সার্ডিনের বোঝা বইতেই বারোটা বেজে যাচ্ছে।'

বসে পড়ে নিজের ব্যাকপ্যাক থেকে ছোট একটা টিনের প্লেট বের করল রবিন। তিন টুকরো সার্ডিন তাতে তুলে নিয়ে খাওয়া শুরু করল।

'হ্যাঁ, বলো দেখি আবার,' নিষ্প্রাণ স্বরে বলল মুসা, 'কেন আমরা ক্রমাগত সার্ডিন খেয়ে মরতে এলাম এখানে? আমি খালি ভুলে যাই।'

চামচ দিয়ে কেটে এক টুকরো সার্ডিন মুখে ফেলল রিচি। উদাস ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল বাতাসে নড়তে থাকা গাছগুলোর দিকে। মুসার রসিকতাটা বুঝল না। জবাব দিল, 'এসেছি অ্যাপাল্যাশিয়ান ট্রেইলে পদব্রজে বেড়িয়ে যেতে। আমেরিকার পূর্ব উপকূলের জরিপ করা বনভূমিতে সর্ববৃহৎ ট্রেইল এটা। এতই বড়, উনিশশো একুশ সালে জরিপ শুরু হয়ে শেষ হয় উনিশশো সাঁইত্রিশ সালে।'

'ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে,' কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন হলো না মুসার, 'কুবুদ্ধিটা তোমারই ছিল। আজ রাতে মনে থাকলেই হয়, সত্যি সত্যি তোমার স্লীপিং ব্যাগে র‍্যাট্‌ল্‌ স্নেক রেখে দেব। ইস্‌, খালি খালি এসে খাওয়ার কষ্ট!'

সেটা পুষিয়ে নেয়ার জন্যেই যেন একসঙ্গে তিন টুকরো মাছ মুখে পুরে দিল

সে। 'ভাবছি, সাপের টেস্ট কি রকম হবে?' শূন্য প্লেটটার দিকে তাকিয়ে রইল এমন ভঙ্গিতে, যেন র‍্যাট্‌লের মাংসের কবাব হলেও এখন গোগ্রাসে গিলত।

'মুরগীর মাংসের মত,' হেসে জানাল কিশোর।

'মুরগী! আছে আমাদের?' তাড়াতাড়ি চিবিয়ে মুখের খাবারটুকু গিলে ফেলল মুসা। 'দেবে একটু?'

মুচকি হাসল কিশোর। 'আছে। তবে বনে। ধরে নিতে হবে তোমাকে। ধরতে পারলে র‍্যাট্‌ল্‌ স্নেকও খেতে পারো তুমি। বনের মধ্যে ঘোরাফেরা করলেই পেয়ে যাবে।'

দমে গেল মুসা। 'যা জায়গার জায়গা! সাপ ধরতে গিয়ে কামড় খেলে বেঁচে আর বাড়ি ফিরতে হবে না।'

মাছের শেষ টুকরোটা মুখে পুরে কনুইয়ে ভর দিয়ে কাত হলো রবিন। মুসার দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচিয়ে হেসে বলল, 'সার্ডিন খেয়ে কেন মরতে এলাম, শুধু এ-ই? আর কিছু জিজ্ঞেস করলে না?'

ভুরু কুঁচকাল মুসা। 'আর কি করব?'

'রিচিকে জিজ্ঞেস করো, অ্যাপাল্যাশিয়ান ট্রেইল ভ্রমণের এত আগ্রহ হয়েছিল কেন ওর।'

ট্রেইল নিয়ে আলোচনা করতে কোন রকম বিরক্তি নেই রিচির। এক প্রশ্ন একশোবার করলেও জবাব দিতে প্রস্তুত। উত্তেজিত স্বরে বলল, 'হাজারটা কারণ আছে!'

'সেই কারণটা অন্তত দু'শো বার জানিয়েছ আমাদের,' নিরস স্বরে বলল মুসা।

কানেই তুলল না রিচি। বলল, 'অ্যাপাল্যাশিয়ান ট্রেইল ছড়িয়ে আছে জর্জিয়া থেকে মেইনি পর্যন্ত।'

'তাতে কি?' ভুরু নাচাল রবিন। 'রুট নাইনটি ফাইভ রাস্তাটা তো আরও লম্বা। ফ্লোরিডা থেকে শুরু হয়েছে।'

'কিন্তু অ্যাপাল্যাশিয়ান ট্রেইল চলে গেছে পর্বতের কোল ঘেঁষে,' যুক্তি দেখাল রিচি।

'এ কারণেই পায়ে ফোস্কা পড়ে মরছি আমরা,' জবাব দিল কিশোর।

'এ ট্রেইলে চল্লিশ হাজারের বেশি প্রজাতির পোকা-মাকড়ের আস্তানা,' আরও জোরাল যুক্তি দেখিয়ে ওপরে থাকার চেষ্টা করল রিচি।

এক টুকরো সার্ডিন তুলে নিল টম। তাতে কালো বিন্দুর মত সচল জিনিস দেখিয়ে বলল, 'নিশ্চয় তোমার চল্লিশ হাজার প্রজাতির একটা?'

'খাইছে!' আঁতকে উঠল মুসা। 'তারমানে বলতে চাইছ আমাদের খাবার পোকামাকড়ে ভর্তি!'

'হলেই বা কি?' হাসল কিশোর। 'পোকামাকড় মানেই প্রচুর প্রোটিন, হট ডগের মত।'

'তাই নাকি?' আগ্রহী মনে হলো মুসাকে।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল কিশোর। 'বাড়ি গিয়ে এবার চাচীকে বলব তেলাপোকার ক্যাসেরোল বানিয়ে দিতে।'

মেরিচাচীর ভুরু কুঁচকানো চেহারাটা মনে করেই দমে গেল মুসা। প্রোটিনের আশা ত্যাগ করল মনে হলো।

আগের প্রসঙ্গে ফিরে আসার সুযোগটা কাজে লাগাল রিচি। বলল, 'অ্যাপাল্যাশিয়ান ট্রেইলের অভিজ্ঞতাটা সবারই থাকা উচিত, নইলে মিস করা হবে। দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে আমেরিকার বনভূমি। এখনও যে এর মধ্যে ঘোরার সুযোগ পাচ্ছি, নিজেদেরকে ভাগ্যবান মনে করা উচিত আমাদের।'

'নাহ, তোমার লেকচার সহ্য করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে আমার জন্যে,' উঠে দাঁড়াল টম। গাছের ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ছে আরেক সারি পর্বতমালা, সকালের রোদে লাগছে নীলচে ধূসর। 'আমিও গাছে চড়ে দেখতে যাচ্ছি, রবিনের মত।'

'দেরি করা যাবে না...' বলতে গেল কিশোর, কিন্তু থেমে গেল। রবিন যে গাছটায় চড়েছিল সেটার দিকে রওনা হয়ে গেছে ততক্ষণে টম।

একটা ক্র্যাকার থেকে পোকা ঝেড়ে ফেলে পানি দিয়ে ভিজিয়ে গিলে নিল কিশোর। 'এখুনি রওনা হওয়া উচিত ছিল আমাদের।'

'এত তাড়াহুড়া কি?' মুসা বলল। 'আচ্ছা, আরেক দফা সার্ডিনই খেয়ে নিলে হয় না?'

'হয়,' জবাবটা দিল রবিন। 'তাতে খাবারে টান পড়ে যাবে আমাদের। ট্রেইলের শেষ মাথায় আর পৌছতে পারব না।'

'আই দেখো, দেখো!' গাছের ওপর থেকে চিৎকার করে উঠল টম। 'পানির মত সত্যিই কি যেন দেখা যাচ্ছে।'

সবগুলো চোখ উঠে গেল তার দিকে। রবিন যে ডালটায় বসেছিল, সেটাতেই বসেছে টম।

'নেমে এসো,' ডাকল কিশোর। 'রওনা হই।'

'এক মিনিট,' জবাব দিল টম। 'এত সুন্দর দৃশ্য, নামতে ইচ্ছে করছে না। আরেকটু ওঠা গেলে মনে হচ্ছে রকি বীচই চোখে পড়বে।'

'ওসব অবাস্তব কথা বলে লাভ নেই,' রিচি বলল। 'কোথায় রকি বীচ, আর কোথায় এখন আমরা। নেমে এসো, নেমে এসো...'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই মড়মড় করে উঠল গাছের ডাল। বোকার মত ডালটার মাথার দিকে সরে গেছে টম। হাত-পা দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে। কিন্তু লাভ কি তাতে?

অঘটন যা ঘটার ঘটে গেছে। ভেঙে গেছে ডালটা। স্তব্ধ হয়ে যাওয়া চার জোড়া চোখের সামনে ডিগবাজি খেয়ে বিশ ফুট নিচের মাটিতে পড়তে লাগল টম।

দুই

'টম!' চিৎকার দিয়ে দৌড়ে গেল মুসা। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। কোন সাহায্য করতে পারল না। টমের হাঁটু লাগল প্রথমে মাটিতে। দলা-মোচড়া হয়ে গেল শরীরটা।

দৌড়ে গেল কিশোর, রবিন আর রিচি।

টম নড়ছে না। অজ্ঞান হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।

'দেখি, ধরো তো! চিৎ করে শোওয়াও!' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে কিশোর বলল। 'হাড়গোড় ভাঙল নাকি দেখি!'

টমের পাশে বসে পড়ে তার হাত তুলে নাড়ি দেখতে লাগল রবিন।

গুঙিয়ে উঠল টম। 'অ্যাই, কি করছ? আমার হাত ছাড়ো!'

'যাক, বেঁচেই আছ,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর।

'হ্যাঁ, আছি,' জবাব দিল টম। 'না থাকার কোন কারণ আছে? শেষ কথাটা যা মনে পড়ে...দারুণ একটা দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। তারপর...কি হয়েছে?'

'গাছ থেকে পড়ে গেছ,' মুসা জানাল।

'ও, এ জন্যেই এত খারাপ লাগছে,' মাথা টিপে ধরল টম। 'মাথা ধরল কি করে?'

'ঝাঁকি লেগেছে হয়তো মগজে,' জবাব দিল কিশোর। 'হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে তোমাকে।'

ঝুঁকে বসে টমের চোখের মণির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রবিন।

'কি করছ?' টম বলল। 'ওভাবে তাকাচ্ছ কেন আমার দিকে?'

'চোখ দেখে বোঝার চেষ্টা করছি মগজের ক্ষতি হলো কিনা,' রবিন বলল। 'তোমার চোখের মণি স্বাভাবিকই আছে। টলটলে হয়ে যায়নি। আমার ধারণা, বেঁচে গেলে এ যাত্রা।'

'বেঁচে গেলাম মানে? বেঁচেই তো আছি!' টম বলল। 'গায়ে শক্তিসামর্থ্য না থাকলে কি আর পর্বতে ঘুরতে বেরোনো যায়? গাছ থেকে সামান্য পড়ে গিয়ে আমার কিছু হবে না।'

'ওটাকে সামান্য পড়া বলে না,' রিচি বলল। 'বিশ ফুট ওপর থেকে পড়েছ। মারা যেতে পারতে।'

'আমার শরীর লোহা দিয়ে তৈরি,' টম বলল। 'দেখি, আমার হাতটা ধরে টান দাও তো। একবার উঠে দাঁড়াতে পারলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

হাত বাড়িয়ে দিল মুসা। ধরে উঠতে গিয়ে বিকট এক চিৎকার দিয়ে পড়ে গেল আবার টম।

'উফ!' গুঙিয়ে উঠল সে। 'পা'টা বোধহয় গেছে!'

'বহু, চমৎকার!' মুসা বলল। 'তোমার পা গেছে। আর আমরা এখানে বসে আছি লোকালয় থেকে বহু বহু দূরে।'

পরিস্থিতিটা তরল করার জন্যে হেসে বলল রবিন, 'তাহলে আর কি, রোগী মানুষের স্যান্ডউইচ খেয়ে কাজ নেই। ওর ভাগটা তুমিই এখন পেয়ে যাবে।'

'উঁহু,' মাথা নাড়ল কিশোর, 'ভুল বললে। তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠার জন্যে রোগী মানুষের বরং তরল খাওয়া দরকার। মুসার ভাগটাও এখন টম পাবে। আর যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ওকে এখন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে।'

'ডাক্তার?' ভাবল কি যেন রবিন, 'তারমানে ওকে কোন শহরে নিয়ে যাওয়া দরকার।'

তাড়াতাড়ি ব্যাকপ্যাক থেকে একটা ম্যাপ টেনে বের করল রিচি। 'ঠিকানা-ঠুকানা সব কিছু আছে এর মধ্যে। ওকে বয়ে নিয়ে যাব আমরা।'

'বয়ে? ওকে?' রসিকতার ঢঙে বলল মুসা। 'তোমার ওজন কত, টম?'

'নিতে যখন হবেই, ওসব জিজ্ঞেস করে লাভ নেই,' রবিন বলল। 'ওজন শুনলে আরও ঘাবড়ে যাব। ডালপালা কেটে দড়ি দিয়ে বেঁধে একটা ট্র্যাভয় তৈরি করে নিতে পারি আমরা।'

'ট্র্যাভয়?' বুঝতে পারল না মুসা।

'এক ধরনের স্ট্রেচার,' বুঝিয়ে দিল কিশোর। 'ইনডিয়ানরা খাবার বহন করার জন্যে ব্যবহার করে।'

'এই যে,' ম্যাপে আঙুলের খোঁচা মারল রিচি। 'মরগান'স কোঅরি নামে একটা শহর আছে, এখান থেকে বেশি দূরে নয়। বড়জোর মাইল দশেক।'

'দশ মাইল?' হিসেব কষে ফেলল কিশোর, 'বিকেলের আগে ওখানে পৌছতে পারব না আমরা।'

'বেশ,' রিচি বলল, 'তাহলে দ্বিতীয় শহরটার কথা বিবেচনা করা যাক। ব্রাইটন। পঁচাত্তর মাইল দূরে।'

'তাহলে আর কি করা!' নিচের ঠোঁট কামড়ে চিন্তা করল কিশোর। 'হয়তো যতটা ভয় পাচ্ছি, ততটা দূরে হবে না মরগান'স কোঅরি। যাব কি ভাবে?'

'অবশ্যই হেঁটে,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল রিচি।

'না, তা বলছি না,' কিশোর বলল। 'রাস্তাটা কোনদিকে?'

'এখান থেকে দু'তিন মাইল দূরে আরেকটা রাস্তা আছে। ওটা ধরে পুবে হাঁটতে থাকলে শেষ মাথায় পেয়ে যাব মরগান'স কোঅরি।'

'গুড,' কিশোর বলল। 'ট্র্যাভয়টা তৈরি করে রওনা হয়ে যাওয়া উচিত আমাদের।'

মুখটাকে এমন করে বাঁকিয়ে ফেলল টম, যেন নিমের তেতো গিলেছে। হাঁটতে পারবে না বুঝে নিজের ওপরই আক্রোশ। মুসা আর রবিন গেল ডাল কাটতে। কিশোর আর রিচি ব্যাকপ্যাক থেকে দড়ি বের করায় মন দিল।

কয়েকটা ডাল লম্বালম্বি রেখে প্রতিটির ফাঁকে দড়ির বুনট দিয়ে বাঁধল ওরা। দুই পাশের ডাল দুটো রাখল বাকিগুলোর চেয়ে সামান্য লম্বা। বেরিয়ে থাকা

মাথাগুলো হাতলের মত ব্যবহার করা যাবে। পুরো জিনিসটা অনেকটা মাদুরের মত। দু'জন লোক দু'দিক থেকে হাতলগুলো কাঁধে তুলে বহন করতে পারে।

টমকে তুলে তখন চিৎ করে শুইয়ে দেয়া হলো ঘাসের ওপর।

'আরে বাবা আস্তে নাড়াচাড়া করো না!' চিৎকার করে উঠল টম। 'জ্যান্ত মানুষকে নাড়াচ্ছ তোমরা, খাবারের পোঁটলা নয়।'

ওর কথা কানেও তুলল না কিশোর। বলল, 'পা'টা বেঁধে দিতে হবে ওর। চেঁচিয়ে আকাশ ফাটাবে ও, জানি। কিন্তু ফিরেও তাকাবে না কেউ। মুসা, জোরে চেপে ধরে রাখবে।'

'আরেকটা কাজ করলেই পারি,' হালকা স্বরে বলল মুসা। 'এই সুযোগে ওর আরও কয়েকটা হাড় ভেঙে দিতে পারি আমরা। বলব গাছ থেকে পড়েই ভেঙেছে। কে আর দেখতে যাচ্ছে।'

'বাহ, এই না হলে বন্ধু!' তিক্তস্বরে জবাব দিল টম।

কিন্তু ওর পা বেঁধে দেয়ার সময় নিথর হয়ে পড়ে থাকল সে। টুঁ শব্দ করল না। ছটফট করে ওদের কাজে বাধার সৃষ্টি করল না।

'হয়ে গেছে,' শেষ গিঁটটা দেয়ার পর বলল কিশোর। 'তোলা যাক এখন...'

'মরগান'স কোঅরিতেই তো যাব?' জিজ্ঞেস করল রিচি।

'হ্যাঁ।'

যতটা সম্ভব আস্তে করে তুলে ট্র্যাভয়ে শুইয়ে দেয়া হলো টমকে। সামনের দিকের হাতল দুটো চেপে ধরল কিশোর। পেছনের দিকেরগুলো মুসা। দু'জনে একসঙ্গে তুলে নিল টমকে। হাতল রাখল কাঁধে। ঝুলন্ত অবস্থায় ট্র্যাভয়টাকে মনে হলো পেটফোলা একটা মরা জানোয়ারের মত।

টমকে বয়ে নিয়ে রওনা হলো কিশোর আর মুসা। পাশে পাশে হেঁটে চলল রবিন আর রিচি। ওদের কাজ ডালপালা কিংবা পাথরে বাড়ি লাগা থেকে টমের বাহনটাকে রক্ষা করা। কিশোররা ক্লান্ত হয়ে গেলে তখন ওরা কাঁধে নেবে। পালা করে করে বহন করবে।

ট্রেইল ধরে চলেছে ওরা। পিঠে বাঁধা যার যার ব্যাকপ্যাক। টমেরটা বাঁধা হয়েছে ট্র্যাভয়ের সঙ্গে। গতকালও যে ভাবে ইচ্ছে হেঁটেছে। কিন্তু আজকে পা ফেলতে হচ্ছে অতি সাবধানে, দেখে শুনে বিচার-বিবেচনা করে। জোরে ঝাঁকি লাগলেও ব্যথা পায় টম। ঢাল বেয়ে নামছে ওরা। হাজার হাজার ভ্রমণকারীর পায়ের ঘষায় পরিষ্কার হয়ে আছে রাস্তা। কিন্তু মোড় নিতেই এবড়ো-খেবড়ো হয়ে গেল।

দুটো গাছের মাঝখান দিয়ে দেখিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল রিচি, 'ওই যে, মরগান'স কোঅরিতে যাবার পথ!'

'রাস্তা কোথায় দেখলে তুমি?' রবিনের প্রশ্ন। 'আমার কাছে তো ঝোপ ছাড়া অন্য কিছু মনে হচ্ছে না।'

'গাছের গায়ে ওই নীল ছোপটা দেখতে পাচ্ছ?' রিচি বলল। 'ভাল করে দেখো।'

দৃষ্টি তীক্ষ্ন করে তাকাল রবিন। একটা গাছের গায়ে নীল রঙের দাগ দেখতে পেল।

'ও, তাই তো,' মাথা দোলাল রবিন।

গাছটার কাছে চলে এল ওরা। সরু একটা পথ এঁকেবেঁকে চলে গেছে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে।

'এই তাহলে মরগান'স কোআরিতে যাবার রাস্তা!' বিড়বিড় করল কিশোর।

রাস্তা ধরে গাছপালার ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল ওরা। এর মধ্যে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এমন ভাবে অন্ধকার হয়ে গেল, মনে হলো সূর্য অস্ত যেতে বসেছে। মাথার ওপরের ঘন ডালপালার ফোকর দিয়ে কোনমতে চুইয়ে ঢুকতে পারছে সামান্য আলো।

'রাস্তার বাতি রাখলে এখানে ভাল করত,' মুসা বলল।

'তোমার কথা শুনলে না···' চটেই উঠল রিচি। 'এ রকম বুনো জায়গায় স্ট্রীট লাইট দেয় কি করে? কিংবা ফাস্ট ফুডের দোকান? কিংবা গ্যাস স্টেশন? দেয়া কি সম্ভব?'

'ইসসি, কেন যে মনে করিয়ে দিলে!' রিচির রাগের ধার দিয়েও গেল না মুসা। 'সত্যি যদি একটা ফাস্ট-ফুডের দোকান থাকত! পেঁয়াজ আর স্পেশাল সস দেয়া তিনটে চীজবার্গার আমি একাই সাবাড় করে দিতে পারতাম।'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই। দোকান তো দেবেই,' ধরল এবার রবিন। 'কাস্টোমারের ছড়াছড়ি। ভালুকরাই হবে প্রধান গ্রাহক। এখন কেউ এসে যদি তোমার একার জন্যে দিয়ে বসে থাকত, তাহলে পারত আরকি।'

'এত ভালুক ভালুক করছ। একটা ভালুককেও তো দেখলাম না এতক্ষণে।'

'ভিডিও গেম নিয়ে ব্যস্ত থাকলে দেখবে কোত্থেকে?'

নামতে হচ্ছে ঢাল বেয়ে। খাড়াই বাড়ছে। নিচের উপত্যকায় নেমে গেছে পথ। পাখির কলরবে মুখরিত। ডালে ডালে নেচে বেড়াচ্ছে পাখি।

'গাড়িতে হলে দশটা মাইল কি, অ্যাঁ!' মুসা বলল। 'কিন্তু এ রকম একটা জায়গা, তার ওপর যদি থাকে টমের মত বোঝা, হেঁটে যেতে গেলে মনে হতে থাকবে ঝাড়া একশো মাইল।···আই, টম, একটু হাঁটার চেষ্টা করে দেখো না বাবা! ভাল পা'টা দিয়ে তো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে পারো। তাতে একটু বাঁচতাম।'

'হাঁটার তো খুবই শখ হচ্ছে আমার,' জবাব দিল টম। 'কিন্তু পরের ঘাড়ে চেপে যাওয়ার আরাম ছেড়ে কে যায় হাঁটার কষ্ট করতে, বলো?'

'পরের ঘাড়ে চাপাটাই লজ্জাজনক,' কিশোর বলল। 'এ বোধটা যার না থাকে সেই বেহায়া মানুষের সঙ্গে আর কি কথা বলে।'

'কথা বলে কেন খামোকা শক্তি খরচ করছ,' টম বলল। 'রেস্টও তো নিতে পারবে না আমার মত।'

কয়েক ঘন্টা পর চওড়া হয়ে এল রাস্তাটা। ততক্ষণে উপত্যকায় নেমে এসেছে ওরা। ওপরে থাকতে মাঝে মাঝেই গাছপালা আর ঝোপ ঘুরে এগোতে হচ্ছিল। এখন আর তা করতে হচ্ছে না। সোজাসুজি এগোতে পারছে।

'শহরের কাছাকাছি চলে এসেছি নিশ্চয়,' আশা করল কিশোর।

'এখনও যদি শহরের কাছে না এসে থাকি,' মুসা বলল, 'টমকে ফেলে রেখে চলে যাব আমরা। অন্য কেউ রাস্তায় দেখতে পেয়ে পৌছে দেবে হাসপাতালে।'

'হ্যাঁ, তোমাদের চেয়ে ভাল কেউ,' টম বলল। 'কথায় কথায় খোঁটা দেবে না তো।'

'আরি!' চিৎকার করে উঠল রবিন। 'সভ্যতা চোখে পড়ছে মনে হয়!'

গাছের ফাঁক দিয়ে অস্পষ্ট ভাবে চোখে পড়ছে একটা কাঠের বাড়ি। যতই এগোতে থাকল ওরা, আরও বাড়িঘর চোখে পড়তে লাগল।

'মরগান'স কোআরি,' বলল কিশোর। 'অবশেষে!'

গুঙিয়ে উঠল রবিন। তার আর রিচির পালা চলছে এখন। 'কিন্তু এখনও তো শহরে ঢুকতে অনেক দেরি। একটা সেকেন্ড আর দেরি সহ্য হচ্ছে না আমার। প্রতি মুহূর্তে টমের ওজন একশো পাউন্ড করে বেড়ে যাচ্ছে।'

'ভাগ্যকে ধন্যবাদ দাও,' টম বলল, 'আমাকে নিয়ে পার পাচ্ছ। মুসাকে যদি বয়ে নিতে হত, তাহলে কি অবস্থাটা হত?'

'তার মানে?' মুসা বলল, 'আমার ওজন তোমার চেয়ে বেশি?'

'জলহস্তীও লজ্জা পাবে তোমার সঙ্গে পাশাপাশি পাল্লায় উঠলে,' নির্বিকার ভঙ্গিতে জবাব দিল টম।

হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেল পথ। সামনে একটা ঘাসে ঢাকা জমি। চারপাশে বাড়িঘর। খানিক আগে গাছের ফাঁক দিয়ে ওগুলোই চোখে পড়েছিল। কাঠের একটা সাইন বোর্ডে লেখা রয়েছে: মরগান'স কোআরিতে স্বাগতম।

'মনে হচ্ছে পৌছেই গেলাম,' কিশোর বলল।

'হাসপাতাল আছে কিনা কে জানে!' চিন্তিত ভঙ্গিতে রবিন বলল। 'শহরটা তো একেবারেই ছোট। অতিরিক্ত পুরানো।'

'দেখা যাক কাউকে জিগেস-টিগেস করে। হাসপাতাল না থাকুক, ডাক্তার তো অন্তত একজন থাকবে।'

তবে কাউকে পাওয়াটাও সহজ হলো না। কাঠের তৈরি বাড়িগুলো সব পুরানো। বেশির ভাগই নির্জন। দেয়ালের রঙ খসে গেছে। জানালাগুলো ভাঙা।

'এ তো ভুতুড়ে শহর,' কিশোর বলল। 'বহু বছর আগেই নিশ্চয় সবাই চলে গেছে।'

'আমি হলেও থাকতাম না,' মুসা বলল। 'একটা মুদী দোকান আছে বলেও তো মনে হয় না।'

'দাঁড়াও দাঁড়াও,' হাত তুলল কিশোর, 'এত তাড়াতাড়ি মন্তব্য করে ফেলাটা ঠিক হচ্ছে না। নাহ্, অত নির্জন নয় জায়গাটা।'

শ'খানেক গজ দূরে একটা কাপড়ের ব্যাগ বয়ে আনছে দু'জন লোক। বয়েস বিশের কোঠায়। হালকা-পাতলা, ছিপছিপে। লম্বা লম্বা চুল। শেভ করেনি। বন থেকে সদ্য বেরিয়ে আসা পাঁচ অভিযাত্রীকে চোখে পড়েনি এখনও।

'এই যে, শুনছেন?' ডাক দিল রবিন। 'একটা সাহায্য করতে পারেন

আমাদের?'.

ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল একজন। ভীষণ চমকে গেছে। হাতের ব্যাগটা ছুটে গেল। মাটিতে পড়ে বাড়ি খেয়ে ওই পাশটা ছিঁড়ে গেল। ভেতরের জিনিস ছড়িয়ে গেল মাটিতে।

'সরি,' বলতে বলতে এগিয়ে গেল কিশোর। 'আপনাদেরকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম।'

জবাব দিল না লোকটা। রাগত চোখে তাকিয়ে রইল গোয়েন্দাদের দিকে। তারপর তাকাল মাটিতে ছড়ানো জিনিসগুলোর দিকে।

কিশোর, রবিন, মুসা আর রিচিও তাকিয়ে আছে মাটির দিকে। ছড়ানো জিনিসগুলো হলো রাশি রাশি নোটের তাড়া।

তিন

হাঁ হয়ে গেছে ওরা। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে লোক দুটো। বিকৃত মুখভঙ্গি। অস্বস্তিকর নীরবতা ঝুলে রইল যেন দুটো দলকে ঘিরে।

'ইয়ে, সাহায্য লাগবে আপনাদের?' এ ছাড়া আর কি বলবে বুঝতে পারল না কিশোর।

'সরে থাকো,' গর্জে উঠল সেই লোকটা, হাত থেকে বস্তা ছেড়ে দিয়েছে যে। 'এখানে কি তোমাদের?'

'ভ্রমণে বেরিয়েছি আমরা,' জবাব দিল কিশোর। 'অ্যাপাল্যাশিয়ান ট্রেইল ধরে আসছিলাম।'

'তাহলে ওখানেই ফিরে যাও,' লোকটা বলল।

'যেতে পারছি না। বড় অসুবিধেয় পড়ে গেছি। আমাদের বন্ধুর পা ভেঙে গেছে।'

'তাহলে গিয়ে ডক মনটানার সঙ্গে দেখা করোগে,' হাত নেড়ে কাঠের বাড়িটা দেখিয়ে দিল লোকটা। 'খবরদার! আমাদের পেছনে আসবে না।'

'ডক' মানে ডাক্তারের সংক্ষেপ। লোকটাকে ধন্যবাদ দিয়ে বন্ধুদের দিকে ফিরে তাকাল কিশোর। অদ্ভুত দৃষ্টি তার চোখে। 'মনে হচ্ছে ডাক্তার একজন আছেন এখানে।'

টমের ট্র্যাভয়টা আবার কাঁধে তুলে নিয়ে দুটো কাঠের বিল্ডিঙের মাঝখান দিয়ে এগোল ওরা। অন্য পাশে একটা রাস্তা দেখা গেল। এক সময় ভালই ছিল। এখন ইট বেরিয়ে পড়েছে। সাইনবোর্ড দেখে বোঝা গেল, মেইন স্ট্রীট। রাস্তার পাশের বাড়িঘর দেখে বোঝা গেল এটাই আসল শহর। বহুকাল আগের কোন জমজমাট শহরের অবশিষ্ট। একটা জেনারেল স্টোর দেখা গেল। নাম বোমিনা'স

শ্যাক। এক প্রান্ত থেকে দুই ভাগ হয়ে দু'দিকে চলে গেছে রাস্তাটা। একটা গেছে পাহাড়ের দিকে। পাহাড়ের চূড়ায় একটা দুর্গের মত বিশাল প্রাসাদ। আরেকটা ভাগ গিয়ে ঢুকেছে দূরের জঙ্গলে। মেইন রোডের অন্য মাথা কিছুদূর এগিয়ে বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে একটা পুরানো বাড়ির সামনের সাইনবোর্ড দেখে থমকে দাঁড়াল মুসা।

'দেখো দেখো!' চিৎকার করে উঠল সে। 'সাইনবোর্ডে লেখা: রোজালিন মনটানা, আর. এন.। মানে কি এর?'

'রেজিস্টার্ড নার্স,' চিন্তিত ভঙ্গিতে জবাব দিল কিশোর।

'নার্স তো আর ডাক্তার না,' টম বলল গলা চড়িয়ে।

'ভিক্ষুকের আবার পছন্দ অপছন্দ,' মুসা বলল।

'সামান্য পা ভেঙেছে তো,' কিশোর বলল। 'হয়তো একজন নার্সই সেটা ঠিক করে দিতে পারবে। চলো, রোজালিন মনটানার সঙ্গে যোগাযোগ করে দেখা যাক।'

দরজার ঘণ্টা বাজাল রবিন। পুরানো ধাঁচের ঘণ্টার শব্দ শোনা গেল ভেতর থেকে।

'যাই হোক, ঘণ্টাটা অন্তত বাজল,' রবিন বলল। 'শহরটা তারমানে পুরোপুরি পরিত্যক্ত হয়ে যায়নি এখনও।'

ঘরের ভেতরে এক মুহূর্তের নীরবতার পর পায়ের শব্দ শোনা গেল। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা।

উঁকি দিলেন একজন মাঝবয়েসী মহিলা। লম্বা বাদামী চুলে ধূসর ছোঁয়া লেগেছে। আঁচড়াননি। পরনে এক্সারসাইজ সুট। কপালে ঘাম। মনে হচ্ছে পরিশ্রমের কাজ করে এসেছেন। চোখে সন্দেহ। তবে আন্তরিকতার অভাব নেই।

'কি সাহায্য করতে পারি তোমাদের?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'আমাদের এই বন্ধুটির পা ভেঙে গেছে,' টমকে দেখাল রবিন।

টমের দিকে তাকালেন নার্স। আবার ফিরলেন রবিনদের দিকে। 'আনো। ভেতরে নিয়ে এসো।' দরজাটা পুরো খুলে দিলেন তিনি।

'থ্যাংকস,' কিশোর বলল।

টমকে বয়ে নিয়ে আসা হলো মস্ত একটা লিভিং রুমে। পুরানো আসবাবপত্র। পুরু করে গদি লাগানো। যত্ন করা হয় বোঝা যায়। ছত্রাকের ভারী গন্ধটাকে পুরোপুরি দূর করতে পারেনি পাইনের সুবাসওয়ালা এয়ার ফ্রেশনার।

'আমার নাম রোজালিন,' জানালেন তিনি। 'রোজালিন মনটানা। আমি একজন নার্স।'

'টমকে কোথায় রাখব?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ওই সোফাটায়,' আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন রোজালিন। 'আগে ওকে পরীক্ষা করব আমি।'

রবিন আর রিচি সরে জায়গা করে দিল। আস্তে করে টমকে সোফায় রাখল কিশোর আর মুসা।

'আউক!' করে চিৎকার দিয়ে বলল টম, 'মায়াদয়াও কি নেই একটু? পা ভাঙা

মানুষটাকে এ রকম আছাড় দিয়ে রাখতে হয়!'

'মোটেও আছাড় দিয়ে রাখিনি আমরা,' প্রতিবাদ জানাল মুসা। 'তুমি বললেই হলো নাকি! চায়ের কাপের মত আস্তে করে রেখেছি।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তা তো বটেই,' গুঙিয়ে উঠল টম। 'এতই আস্তে, হাজারটা টুকরো হয়ে যেত চায়ের কাপটা।'

'ওদের মাপ করে দাও, টম,' হেসে বললেন রোজালিন। 'এখন থেকে তোমার সব দায়িত্ব আমার। ওরা আর নাক গলাতে পারবে না।'

'ভালই হয়, বাঁচি তাহলে,' টম বলল।

সোফার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন রোজালিন। কিশোরের সহায়তায় টমের পা থেকে হাইকিং বুট আর মোজা খুলে নিলেন। যেহেতু শর্টস পরা আছে, প্যান্ট খোলার আর প্রয়োজন পড়ল না।

'দেখো তো কিছু টের পাও নাকি?' বলে টমের বুড়ো আঙুলে টিপ মারলেন তিনি।

গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল টম। 'টের তো পেলাম পায়ে পেরেক ঠুকছেন!'

'গুড,' রোজালিন বললেন। 'তারমানে নার্ভ ড্যামেজ হয়নি। কি হয়েছিল তোমার?'

'গাছ থেকে পড়ে গেছে,' টমের জবাবটা দিয়ে দিল মুসা।

'বিশ ফুট ওপর থেকে,' বলল রবিন।

খানিকটা বিস্মিত ভঙ্গিতেই টমের দিকে তাকালেন রোজালিন। 'কপাল ভাল তোমার, বেঁচে গেছ।'

'বেঁচে থাকায় তো ব্যথা পাচ্ছি,' টম বলল।

'বেঁচে থাকলে ব্যথা পাবেই,' রোজালিন বললেন। 'ভেবো না। সব ঠিক করে দেব।'

'হয়েছে কি ওর?' জানতে চাইল রিচি।

টমের পায়ে আলতো করে টিপে টিপে দেখতে লাগলেন রোজালিন। 'উঁহু, জটিল কোন জখম আছে বলে মনে হচ্ছে না। অবাকই লাগছে আমার!'

'তারমানে আবার বেরিয়ে পড়তে পারব আমরা?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'এত তাড়াতাড়ি না,' রোজালিন বল্লেন। 'অন্য ধরনের জখমের কথা বলছি আমি। হাড় ভাঙেনি এ কথা বলিনি। হাঁটুর কাছটায় ভেঙেছে। পেশীও ক্ষত হয়েছে। হাঁটুর চারপাশে ফুলেছে। হাড়টা সেট করে পায়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিতে হবে যাতে নাড়াচাড়া না করতে পারে। হাসপাতালে যাওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। ওখানে গেলে অবশ্য এক্স-রে করে দেখেটেখে শিওর হতে পারবে পা'টা ভাঙল কিনা। তবে না দেখেও আমি বলে দিতে পারি, ভেঙেছে। এখন নাড়াচাড়া করার চেয়ে বরং এখানে থেকে বিশ্রাম নেয়া উচিত ওর।'

'তারমানে এখানে আটকে থাকতে হচ্ছে আমাদের?' মুসার প্রশ্ন।

'অন্তত দিন দুই তো থাকতেই হবে। তারপর হয়তো নড়ানোটা নিরাপদ হলেও হতে পারে।'

'এখন নড়ানোটা কোন ভাবেই সম্ভব না, এই তো বলতে চাইছেন?' রবিন বলল। 'ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলে তো বড় কোন শহরে নিয়ে যাওয়া যায়।' এক ভুরু উঁচু করে কিশোরের দিকে তাকাল সে। রোজালিনের বক্তব্যের ব্যাপারে তার মত জানার জন্যে।

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল কেবল কিশোর।

'যত কথাই বলো না কেন,' দৃঢ়কণ্ঠে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলেন রোজালিন, 'ওকে এখন এখান থেকে নিয়ে যাওয়া চলবে না।'

'কাছাকাছি কোন ভাল রেস্টুরেন্ট আছে?' অকারণ তর্কাতর্কির মধ্যে না গিয়ে আসল কথায় চলে এল মুসা।

'এবং স্লীপিং ব্যাগে ঢুকে রাত কাটানোর জায়গা?' মুসার সঙ্গে সুর মেলাল কিশোর।

'বাইরে রাত কাটানোর প্রয়োজন হবে না তোমাদের,' রোজালিন বললেন। 'পাশের বাড়ির মিসেস হ্যারিয়েটের একটা বোর্ডিং হাউস আছে। আমি শিওর, থাকার জায়গার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের খাওয়ার ব্যবস্থাও খুশি হয়েই করবে সে।' মুসার দিকে তাকালেন তিনি। যেন তার ক্ষুধাটাকে আরও উস্কে দেয়ার জন্যেই বললেন, 'এক রাতের জন্যে মাত্র দশ ডলার।'

'ভাগ্যিস সঙ্গে করে নগদ টাকা এনেছিলাম,' রবিন বলল। 'কল্পনাই করিনি, এই জঙ্গলের মধ্যে টাকার দরকার হয়ে যাবে।'

'আমি কোথায় রাত কাটাব?' জানতে চাইল টম।

'আমার একটা গেস্ট রুম আছে,' রোজালিন বললেন। 'রোগীর জন্যেই রেখেছি। স্টোর রুম হিসেবে ব্যবহার করি ওটা। বিশ্বাস করো আর না-ই করো, এ রকম একটা শহরেও লোকে অসুস্থ হয়ে থাকতে আসে আমার কাছে।'

'ওকে কি ওখানে রেখে দিয়ে আসব?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'খুব ভাল হয় তাহলে,' পেছন দিকের একটা ঘর দেখালেন রোজালিন।

টমকে তুলে নিল কিশোর আর মুসা।

'উফ্, আবার পড়লাম এদের খপ্পরে!' চিৎকার করে উঠল টম। 'এবার যদি ব্যথা দাও, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি!'

ওকে বয়ে নিয়ে এসে দরজা দিয়ে পেছনের ঘরটায় ঢুকল কিশোর আর মুসা। সঙ্গে এল রবিন আর রিচি। টমকে বয়ে আনতে সাহায্য করল।

ঘরের বেশির ভাগ জুড়ে রয়েছে বড় একটা বিছানা। পুরু গদির ওপর টমকে শুইয়ে দেয়া হলো।

'দারুণ জায়গা তো,' মুসা বলল। 'এখানে রাত কাটাতে পারলে ভাগ্যবান মনে করতাম নিজেকে।'

'পা'টা ভেঙে নিয়ে এসোগে,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন রোজালিন, 'জায়গা হয়ে যাবে তোমারও।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।' জোরে জোরে হাত নেড়ে বলল মুসা। 'আমার খাটে ঘুমানোর দরকার নেই।'

'এবার আসল কাজটা সেরে ফেলা যাক,' টমকে বললেন রোজালিন।

ভয় দেখা দিল টমের চেহারায়।

'অত ভয় পাচ্ছ কেন?' রোজালিন বললেন। 'আমি তো আর অপারেশন করতে যাচ্ছি না। তোমার পা'টাকে অচল করে দেব শুধু।'

'ঠিক আছে,' অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হলো টম। 'ছুরিটুরি যদি না আনেন আমার কাছে, চিৎকার করব না।'

ধারাল একটা বাঁকা ছুরি তুলে নাচালেন রোজালিন, চোখে দুষ্টুমির হাসি। ভঙ্গিটা এমন, যেন ওটা দিয়ে কেটে ফালাফালা করবেন। ছুরি রেখে পা'টা ভাল করে পরীক্ষা করলেন আরেকবার। হাঁটুটা অনেক ফুলেছে। কালচে লাল হয়ে গেছে জায়গাটা। হাঁটুর নিচে পেছন দিকে মাংস ছিঁড়ে যাওয়ার লাল লাল দাগ। জীবাণু সংক্রমণ শুরু হয়ে গেছে কয়েকটাতে।

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল টম। 'ওখানকার মাংস ফুঁড়ে আবার ভিনগ্রহের কোন জীবটীব বেরিয়ে আসবে না তো? দেখে তো ওরকমই লাগছে।'

'আসতেও পারে,' রবিন বলল। 'সবুজ রঙের থকথকে কিছু। রাক্ষসের খিদে নিয়ে। মুসার মত।'

টেরা চোখে রবিনের দিকে তাকাল মুসা, 'আমি কি সবুজ রঙের...'

'হয়েছে হয়েছে! থামো!' হাত তুললেন রোজালিন। ওদের কাণ্ড দেখে না হেসে পারছেন না। টমকে দেখিয়ে বললেন, 'ওকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও।'

'বলুক না যত পারে,' দমল না টম। 'আমি কি জবাব দিতে পারব না মনে করেছেন?'

'নাও, শুয়ে পড়ো লম্বা হয়ে,' রোজালিন বললেন। 'তোমার ক্ষতগুলো আগে সাফ করব। তারপর প্লাস্টার রেডি করব। আধঘন্টা লেগে যাবে। সে-সময়টা চুপ করে শুয়ে থাকবে তুমি। একটুও নড়াচড়া করতে পারবে না।'

'ভেলকো স্প্রিন্টস ব্যবহার করলেই পারেন,' কিশোর বলল। 'অত ঝামেলা করার দরকারটা কি?'

'শেষ হয়ে গেছে,' রোজালিন জানালেন। 'কোন জিনিস শেষ হয়ে গেলে অপেক্ষা করতে হয় আমাদের। এই বনের মধ্যে জিনিসপত্র নিয়ে আসা খুব কঠিন।'

'বাহ্, চমৎকার!' তিক্তকণ্ঠে বলল মুসা। 'শুধু টমের জন্যে এই হতচ্ছাড়া জায়গায় পড়ে পড়ে পচতে হবে এখন আমাদের।'

'আমার কারণে এ রকম একটা জায়গা দেখার সৌভাগ্য হয়েছে, তার জন্যে কৃতজ্ঞ হও বরং,' সঙ্গে সঙ্গে ফোড়ন কাটল টম।

'বেশি দিন থাকা লাগবে না,' অভয় দিলেন রোজালিন। 'যত তাড়াতাড়ি পারি ওকে নড়ানোর জন্যে তৈরি করে দেব।'

'সে যা-ই হোক,' কিশোর বলল, 'ট্রেইল ধরে আরও একশো মাইল আমাদের হেঁটে যাওয়ার ব্যাপারটা মাঠে মারা গেল আরকি।'

'তা গেল,' একমত হলেন রোজালিন। 'হয় তোমাদের বন্ধুকে ফেলে রেখে যেতে হবে, নয়তো আরেকবার আসতে হবে হাঁটার জন্যে।'

'হুঁ,' জোরে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। 'বরং শহরটা ঘুরে দেখেই সময়টা কাটানোর চেষ্টা করিগে।'

'হ্যাঁ, সেটাই ভাল হবে।'

বিছানার পাশে রাখা একটা কেবিনেট খুলে কয়েক রোল সার্জিক্যাল টেপ বের করলেন রোজালিন। টমের পায়ে পেঁচানো শুরু করলেন। ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেল টমের মুখ। কিন্তু একটা শব্দও করল না।

মুসা জিজ্ঞেস করল, 'নার্স হলেন কি করে আপনি, বলবেন?'

টমের পায়ে আরেক পরত টেপ পেঁচাতে পেঁচাতে জবাব দিলেন রোজালিন, 'ভিয়েতনামে গিয়ে।'

দুই বার ঝাঁকি দিয়ে খুলে গেল টমের চোখের পাতা। তীব্র ব্যথাও কৌতূহল দমন করাতে পারল না। 'ভিয়েতনাম! ভিয়েতনামে গিয়েছিলেন আপনি?'

'গিয়েছিলাম,' মাথা ঝাঁকালেন রোজালিন। 'ছিলাম সাতষট্টি থেকে উনসত্তর সাল পর্যন্ত। ডা ন্যাঙ-এর কাছে মোবাইল সার্জিক্যাল ইউনিটে কাজ করেছি।'

'খাইছে!' মুসা বলল, 'ম্যাশ ইউনিট! পুরানো ওই টিভি শো'টার মত?'

'টিভির মত মজার না,' রোজালিন বললেন। 'বরং বেশির ভাগ সময়ই একঘেয়ে লাগত। গুলিতে আহত কিংবা বোমায় হাত-পা উড়ে যাওয়া জখমী লোকগুলোকে যখন হেলিকপ্টার বোঝাই করে নিয়ে আসা হত, তখনকার কথা আলাদা। বেশির ভাগ বাঁচত না, বাড়ি ফিরে যেতে পারেনি আর কোনদিন। ওদের বাঁচানোর সাধ্যমত চেষ্টা করেছি আমরা।'

'সে তো বুঝতেই পারছি,' আর কোন কথা খুঁজে পেল না রবিন।

'ভিয়েতনামের যুদ্ধটা জঙ্গলেই হয়েছে বেশি,' রোজালিন বললেন। 'ঘাপটি মেরে বসে থাকত স্নাইপাররা। কখন যে কার বুকে গুলি এসে লাগবে কেউ জানত না। ভয়ে চোখ বন্ধ করতে পারত না সৈন্যরা। তাদের ভয় ছিল যে কোন সময় এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে শত্রুসেনা। সব সময় রাইফেল নিয়ে তৈরি থাকতে থাকতে স্নায়ুর রোগ হয়ে গেছিল ওদের। অহরহ চোখের সামনে প্রিয় বন্ধু কিংবা সহকর্মীকে মারা যেতে দেখেছে।'

'তারমানে ভয়ঙ্কর ব্যাপার!' রবিন বলল। 'কেন যে যুদ্ধে যায় মানুষ!'

ব্যান্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে ফিরে তাকালেন রোজালিন। 'ভাগ্যকে ধন্যবাদ দাও তোমাদেরকে এমন পরিস্থিতিতে পড়তে হচ্ছে না। আমিও যে কত বন্ধুকে হারিয়েছি। একজন তো অতি ঘনিষ্ঠ ছিল।'

'বয়ফ্রেন্ড?' জিজ্ঞেস করল রিচি।

'আমার স্বামী,' গম্ভীর হয়ে গেলেন রোজালিন। 'তার কথা আলোচনা করতে চাই না আমি।'

অস্বস্তিকর নীরবতা চেপে এল ঘরের মধ্যে। অবশেষে পরিবেশটাকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করল আবার টম, 'আশা করি ভিয়েতনামের গল্প শোনাবেন আমাকে এ ক'দিন।'

'শোনাব।' উঠে আবার কেবিনেটের কাছে চলে গেলেন রোজালিন। প্লাস্টার কিট বের করলেন, ব্যান্ডেজের ওপর প্রলেপ দেয়ার জন্যে।

হাসি ফুটল আবার তাঁর মুখে। 'বহুকাল এ সব গল্প কাউকে বলার সুযোগ পাইনি। বলতে পারলে আমার মনটাও হালকা হবে হয়তো।'

'মাঝে মাঝে স্মৃতিচারণ খুব বেদনাদায়ক হয়ে যায়,' সহানুভূতি দেখিয়ে বলল কিশোর।

'কল্পনাই করতে পারবে না কতটা বেদনাদায়ক,' রোজালিন বললেন। 'কেউ পারবে না।'

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল কিশোর। বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'উনি কাজ করতে থাকুন। চলো, আমরা শহরটা ঘুরে দেখে আসি।'

'শহর আর কই?' ভুরু নাচাল মুসা। 'বাইরে কয়েকটা পুরানো বাড়ি ছাড়া আর তো কিছুই চোখে পড়ছে না।'

'আছে,' রবিন বলল। 'আসার সময় জেনারেল স্টোরটা দেখে এলাম না। নামটা কি যেন? বোমিনা'স শ্যাক।'

'মিসেস হ্যারিয়েটের সঙ্গে দেখা করে ঘরের ব্যবস্থাও করা দরকার,' রিচি বলল। 'রাত কাটানো লাগবে না?'

'তাহলে চলো।' টমের দিকে ঘুরল কিশোর। 'টম, তোমার কোন অসুবিধে হচ্ছে?'

ছপাৎ করে ব্যান্ডেজের ওপর প্লাস্টার ফেললেন রোজালিন। সেদিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল টম, 'না, কোন অসুবিধে নেই।'

'চলো সবাই,' ডাকল কিশোর। 'এসো।'

রবিন, মুসা আর রিচিকে নিয়ে গেস্টরুম থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। লিভিং রুমের ভেতর দিয়ে এগোল সামনের দরজার দিকে।

বাইরে এখনও দিনের আলো রয়েছে। কিন্তু রাস্তাটা জনশূন্য।

বোমিনা'স শ্যাকটা রাস্তার ঠিক উল্টো দিকে। বহুকাল দেয়ালে রঙ পড়েনি। হাসিখুশি একজন মহিলার ছবি আঁকা রয়েছে সামনের সাইনবোর্ডে। দক্ষ আর্টিস্টের আঁকা। জীর্ণ, মলিন কাঠের বাড়ির সামনের ছবিটাকে এখন বেমানান লাগছে।

'আগে ওখানে একটা ঢুঁ মেরে আসি,' কিশোর বলল। 'তারপর ঘরের খোঁজে যাব।'

বোমিনা'স শ্যাকের দরজাটা ঠেলা দিয়ে খুলল সে। ভেতরে পুরানো ধাঁচের একটা জেনারেল স্টোর। কাঠের রঙহীন তাক। পেছনে মস্ত একটা কাউন্টার। তাকগুলোতে জিনিসপত্র তেমন নেই। তবে কিছু খাবার আর প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি রাখা আছে। কাউন্টারের ওপাশে বসে আছে ওদেরই বয়েসী এক কিশোরী। সোনালী চুল কাঁধ ঢেকেছে। চোখের তারা উজ্জ্বল। কিশোরের দিকেই তার আগ্রহটা বেশি দেখা গেল।

'কি সাহায্য করতে পারি?' জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

'শহরে নতুন এসেছি আমরা,' কিশোর বলল।

'সে তো বুঝতেই পারছি,' জবাব দিল মেয়েটা। 'নতুন মুখ এখানে কমই দেখা যায়।'

'শহরে লোকও বোধহয় খুব কম?' জানতে চাইল রবিন।

'এক সময় অনেক বড় ছিল শহরটা,' মেয়েটা জানাল। 'আমার নাম রেড ব্রিক। লাল ইঁট। বিচিত্র লাগছে না নামটা? কিন্তু বাবার খুব পছন্দ। বাবার নাম ব্রিক। প্রথম নামটা বাবাই জুড়ে দিয়েছে।'

'আসলেই এটা তোমার ভাল নাম?' বিশ্বাস হলো না কিশোরের।

'না। ঠিকই অনুমান করেছ তুমি। ভাল নাম রেডিনা ব্রিক। ডাক নাম রেড। তা তোমাদেরও তো নামটাম নিশ্চয় আছে? ডাকনাম হোক বা আসল?'

'আমি কিশোর পাশা।' রবিনকে দেখাল সে, 'ও রবিন মিলফোর্ড, আমার বন্ধু। বাকি দু'জনও বন্ধু—মুসা আমান আর রিচি বুমার।'

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' রিচি বলল।

'তোমার তাকে ওগুলো কি?' হাত তুলে দেখাল মুসা। 'বীফ জার্কি নাকি?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রেড। 'ওই একটা খাবারই পাবে এখানে প্রচুর। টেকে বেশি। নষ্ট হয় না।'

'সে-জন্যেই আমরাও সাথে করে নিয়ে এসেছি,' রবিন বলল। 'রাতের খাবার মানেই বীফ জার্কি।'

মুখে ছায়া নামল হঠাৎ রেডের। 'তোমাদের কথা শুনেছি আমি।'

'মানে?' ওদের গোয়েন্দাগিরির খবর এই দুর্গম শহরেও এসে পৌঁছেছে নাকি? বিশ্বাস করতে পারল না রবিন। 'সবে তো এলাম আমরা।'

'কি শুনেছ?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'সে-কথা আমি তোমাদের বলতে পারব না,' রেড বলল। 'তোমরা সেটা পছন্দও করবে না।'

'করব,' রবিন বলল। 'বলো।'

'বেশ,' রবিনের চোখে দৃষ্টি স্থির করল রেড। 'আমি শুনলাম, বিপদের খাঁড়া ঝুলছে তোমাদের মাথায়।'

'বিপদ?' বুঝতে পারল না কিশোর।

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল রেড। 'এখুনি যদি এ শহর থেকে বেরিয়ে না যাও, সাংঘাতিক বেকায়দায় পড়ে যাবে।'

চার

অবাক হয়ে রেডের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। 'বিপদ? কেন?'

'হ্যাঁ, কেন?' কিশোরের সঙ্গে সুর মেলাল মুসা। 'কারও পাকা ধানে মই দিইনি আমরা এখনও। কারও কোন ব্যাপারে নাক গলাইনি।'

'খুলে বলবে?' অনুরোধ করল কিশোর।

কাঁধ ঝাঁকাল রেড। 'যা বলেছি এর বেশি বলা ঠিক হবে না।'

'এটা কিন্তু অন্যায়,' অভিযোগের সুরে বলল মুসা। 'খানিকটা বলবে, বাকিটা ঝুলিয়ে রেখে দেবে–তাহলে ওটুকুই বা বলতে গেলে কেন?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে যাবার জন্যেই যেন উঠে গিয়ে কাউন্টারের পেছনের একটা তাক থেকে মলাটের একটা বাক্স বের করে আনল রেড।

'মিন্ট চকলেট। খাবে?' গোয়েন্দাদের দিকে বাক্সটা বাড়িয়ে দিল সে। 'চকলেটও এখানে বেশি ব্র্যান্ডের পাবে না।'

'দাও!' হাসিতে ঝলমল করে উঠল মুসার চেহারা। 'মিন্ট আমার খুবই পছন্দ। পুরো বাক্সটাই খেয়ে ফেলতে পারি আমি।'

'দারুণ,' রবিন বলল। 'চকলেট দেখিয়েই জনাব মুসা আমানকে কি সুন্দর আসল কথা থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল।'

কাউন্টারে ঝুঁকে দাঁড়াল কিশোর। 'কেন আমরা বিপদের মধ্যে রয়েছি, বলতে চাও না, ভাল কথা। কিন্তু তোমার এই দোকান, তোমাদের এই শহরের কথা বলতে তো আপত্তি নেই?'

'না, তা নেই। কি জানতে চাও?'

'প্রথমেই জানতে চাই,' বলে উঠল রিচি, 'শহরটার নাম মরগান'স কোঅরি হলো কেন?'

'কারণ এখান থেকে মাইল দুয়েক দূরে গ্র্যানিটের খনি আছে প্রচুর,' রেড জানাল। 'ওই খনিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে শহরটা। পুরো ওরিগো করপোরেশনটা তৈরি হয়েছে ওই খনিকে ঘিরে। বহু বছর ধরে খনির ব্যবসা করছে ওরা। উনিশশো সালে হামফ্রে মরগান নামে এক লোকের কাছ থেকে কিনে নিয়েছিল। মরগানরাই প্রথম খনির ব্যবসাটা শুরু করে এখানে।'

'ওরিগো করপোরেশনের মালিক কে?' জানতে চাইল রবিন।

'ওরিগো পরিবার,' জানাল রেড। 'ওরিগোদের শেষ বংশধর এখন বাস করে পাহাড়ের ওপরের প্রাসাদে।'

'শহরে ঢোকার সময় দুর্গের মত একটা বাড়ি দেখেছি,' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ, ওটাই। ওরিগো ম্যানশন। ওই লোকই এখন খনিগুলোর মালিক।'

'তারমানে মস্ত ধনী,' মুসা বলল।

'আগের মত আর নেই,' রেড বলল। 'উনিশশো বিশ সালের মধ্যেই খনির সমস্ত গ্র্যানিট খুঁড়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।'

'আর খনিই ছিল এ শহরের মূল আয়ের উৎস?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হ্যাঁ।'

'তাহলে ওই খনি ছাড়া এতদিন টিকল কি করে শহরটা?'

'এই কোনমত, ধুঁকে ধুঁকে। চালিয়ে নিচ্ছি আরকি আমরা।'

'টিকছে বলে তো মনে হচ্ছে না আমার,' রিচি বলল। 'লোকজন খুব সামান্য, বাড়িগুলোর প্রতি সীমাহীন অযত্ন, তোমার দোকানে মালপত্র নেই। তারমানে খনিও গেছে, শহরও মরার পথে।'

'ওই যে বললাম,' দুই ভুরুর মাঝখানে কপালে গভীর ভাঁজ পড়ল রেডের,

'চালিয়ে নিচ্ছি আমরা।'

'আমার আরেকটা প্রশ্ন আছে,' কিশোর বলল। 'এ দোকানটার নাম বোমিনা'স শ্যাক কেন?'

উজ্জ্বল হলো রেডের মুখ। 'বোমিনা ছিল আমার দাদীর মায়ের-মায়ের-মা। দক্ষিণ দেশের লোক। সিভিল ওঅরের পর উত্তরে এসেছিল ভাগ্যের অন্বেষণে। বয়েসে ছিল তরুণী। এই দোকান দিয়েছিল খনি-শ্রমিকদের কাছে মুদী আর যন্ত্রপাতি বিক্রির জন্যে।'

ধুলো পড়া তাকগুলোর দিকে তাকাল রবিন। 'এখন তো দেখে মনে হচ্ছে এখানেই সিভিল ওঅর হয়ে গিয়েছিল।'

'তা হয়নি,' বলল রেড। 'তবে রূপান্তর ঘটানো হয়েছে। উনিশশো বিশের পরে নতুন করে সংস্কার করা হয়েছিল এ দোকানটার।'

'উনিশশো বিশের পরে আর কিছু তৈরি হয়েছিল এ শহরের?' জানতে চাইল কিশোর।

'উঁহু, তেমন কিছু না। খনির গ্র্যানিট সব শেষ। তারপর থেকে শহরে টাকা আর আসেই না।'

পকেট চাপড়াল মুসা। 'তারমানে আমি এখন এ শহরের বড় ধনী। সবচেয়ে দামী খাবারগুলো বিক্রি করতে রাজি আছ আমার কাছে?'

'শহরের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি ডজ ওরিগো,' রেড বলল। 'যদিও টাকা তেমন নেই এখন ওর। পাহাড়ের ওপরের ওই প্রাসাদটাতে বাস করে।'

'উনিশশো বিশের পর থেকে যদি গ্র্যানিট কোঅরি থেকে টাকা না-ই আসে,' রবিনের প্রশ্ন, 'তাহলে ওরিগো পরিবারের আয়ের উৎস কি?'

'অন্য ব্যবসায় টাকা খাটিয়েছে।··· তো, কিছু বিক্রি করতে পারব তোমাদের কাছে?'

'এই কম্পাসটা কিনব আমি,' রিচি বলল। 'সঙ্গে করে যেটা নিয়ে এসেছি, তার চেয়ে এটা অনেক ভাল।'

দুটো বাক্স নামিয়ে নিয়ে এল মুসা। 'আমি কিনব এই বীফ জার্কিগুলো।'

'শুধু এ-ই?' মুচকি হাসল রবিন। 'এতেই হয়ে যাবে তোমার?'

'কি জানি!' কান চুলকাল মুসা, রবিনের খোঁচাটা বুঝতে পারল না বোধহয়। 'তাহলে আরও কয়েক বাক্স কিনি।'

কাউন্টারের একধারে রাখা কাগজের স্তূপ থেকে একটা কাগজ টেনে নিয়ে কিশোর বলল, 'আমি এই ম্যাপটা কিনব। শহরের ম্যাপ, তাই না?'

'হ্যাঁ,' রেড বলল। 'উনিশশো চব্বিশ সালের আঁকা।'

'তাতে কোন অসুবিধে নেই,' কিশোর বলল। 'এত বছরেও তেমন কোন পরিবর্তন হয়েছে বলে তো মনে হয় না।'

'আমি তার অনেক পরে জন্মেছি,' কিশোরের চোখে চোখ রেখে বলল রেড।

'তা তো বটেই,' হাসল কিশোর। 'খুব একটা দামী ব্যাপার ছিল নিশ্চয় ওই জন্মটা।'

কিশোরের রসিকতা বুঝতে পারল রেড। 'অবশ্যই দামী, আমার মা-বাবার

কাছে।'

'তোমাদের বাড়িটা কাছাকাছিই নিশ্চয়?'

'হ্যাঁ,' রেড বলল। 'এখান থেকে তিনটে দরজা পরেই, যেখান থেকে রাস্তাটা দুই ভাগ হয়ে ওরিগো ম্যানশনের দিকে চলে গেছে। আমি বাবার সঙ্গে থাকি। এ দোকানটার মালিক এখন আমার বাবা। দুই বছর আগে আমার মা মারা গেছে।'

'সরি!'

'থ্যাংকস,' রেড বলল। 'কিন্তু দুর্ঘটনা তো ঘটেই। ঘোড়ায় চড়তে ভালবাসত মা। তার প্রিয় ঘোড়াটাই তাকে পিঠ থেকে ফেলে দিয়েছে। ডক মনটানা বাঁচানোর অনেক চেষ্টা করেছে। পারেনি।'

'আমার মা-বাবাও কার অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। তোমার দুঃখটা আমি বুঝতে পারছি।'

কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল রেড। দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'তোমার দুঃখটা আমার চেয়েও বেশি।'

দুঃখ-বেদনার দিকে চলে যাচ্ছে প্রসঙ্গটা, ভাল লাগল না মুসার। বলল, 'ডক মনটানা? তার মানে রোজালিনের কথা বলছ?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রেড। 'দেখা হয়েছে নাকি?'

'হয়েছে। আমাদের বন্ধু টমের চিকিৎসা এখন তিনিই করছেন।'

'চিকিৎসার জন্যে এর চেয়ে ভাল কাউকে আর খুঁজে পাবে না এখানে,' রেড বলল। 'সেই সত্তর দশকের গোড়া থেকে এখানে লোকের চিকিৎসা করে আসছে ডক মনটানা।'

'ভিয়েতনাম থেকে ফেরার পর থেকে, তাই না?' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ। এখানেই বড় হয়েছিল রোজালিন। যখনই সুযোগ পেয়েছে, চলে এসেছে আবার। তার জন্যে গর্ব বোধ করে এখানকার লোকে। তবে রোজালিন কবে গেল, কবে এল কিছুই দেখিনি আমি। জন্মাইনি তখনও।'

সামনের দরজায় ঝনঝন শব্দ হলো। কাস্টোমার ভেবে চোখ তুলে তাকাল রেড। দরজা খুলে ঘরে ঢুকল একজন মাঝবয়েসী লোক। ঘন কালো চুল। মুখে মিষ্টি হাসি। লাল ফ্লানেলের শার্ট, জিনসের প্যান্টের কোমরে আঁটা বেল্ট–সব কিছু ঠেলে কলসের পেটের মত বেরিয়ে আছে ভুঁড়িটা।

'হাই ডজ,' আন্তরিক কণ্ঠে বলল রেড। 'কেমন আছেন?'

'ভাল,' জবাব দিল ওরিগো। জড়ানো কণ্ঠস্বর। 'কয়েক ব্যাগ সার দরকার। আছে?'

'পেছনের ঘরে। যেখানে সব সময় রাখি।'

'থ্যাংক ইউ, রেড,' হেসে বলল ওরিগো। 'তোমার বন্ধুরা কে? আগে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।'

'আমি কিশোর।'

'আমি ওর বন্ধু, রবিন।'

'আমি মুসা।'

'আমি রিচি।' হাত বাড়িয়ে দিল সে, 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি

হলাম, মিস্টার...'

'ওরিগো। ডজ ওরিগো।'

চোখ বড় বড় করে ফেলল কিশোর। 'ওরিগো? তারমানে পাহাড়ের ওপরের ওই প্রাসাদটায় আপনিই বাস করেন?'

'হ্যাঁ, তা করি। একশো বছরের বেশি হলো ওখানে বসবাস করে এসেছে আমাদের পরিবার। বিশেষ কিছু নেই আর এখন। ছোটখাট একটা ফার্ম। আর দু'জন সহকারী। ব্যস।'

'যা-ই হোক, আপনার সঙ্গে দেখা হওয়াতে ভাল লাগছে, মিস্টার ওরিগো,' রবিন বলল।

'সময় পেলে এসো একবার আমার ওখানে,' দাওয়াত দিয়ে ফেলল ওরিগো। 'অল্প বয়েসীদের দেখলে ভালই লাগে। রেড, সারগুলো?'

'আসুন।'

ওরিগোকে নিয়ে পেছনের ঘরে চলে গেল রেড। কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। 'টমকে দেখতে যাওয়া দরকার। ওর জন্যে দুশ্চিন্তা হচ্ছে।'

'হ্যাঁ,' কিশোর বলল। 'রোজালিনের কথার ওপর পুরোপুরি ভরসা করতে পারছি না আমি। ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার। হাসপাতালে। একটা এক্স-রে অন্তত করে দেখা দরকার পায়ের অবস্থাটা কি।'

'রোজালিনের ওখানে ফোন আছে নাকি?'

'ফোন তো সবার কাছেই থাকার কথা,' মুসা বলল।

'আমাদের কাছে নেই,' কিশোর বলল। সেলুলার ফোন একটা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল ওরা। হাত থেকে পাথরের ওপর পড়ে ভেঙে গেছে।

'এখানে সবার বাড়িতে ফোন আছে বলে মনে হয় না আমার,' রিচি বলল।

'বাথরুম তো আছে?' রবিনের প্রশ্ন।

'সেটা না থাকলেও অবাক হব না।'

'সব কিছুতেই অত হতাশ কোরো না তো,' কিশোর বলল। 'চলো, ডক মনটানার বাড়িতে।'

বোমিনা'স শ্যাক থেকে বেরিয়ে এল ওরা। নির্জন রাস্তা ধরে হেঁটে চলল রোজালিনের বাড়িতে। ঘরে ঢুকে দেখল গভীর আলোচনায় মগ্ন দু'জনে।

উজ্জ্বল হাসি নিয়ে বন্ধুদের দিকে তাকাল টম। ব্যথাট্যথা কিছু আছে বলে মনে হলো না ওর চেহারা দেখে। 'রোজালিন আমাকে দারুণ সব গল্প শুনিয়েছে। যদি খালি শুনতে!'

'শুনলে সত্যি খুশি হতাম,' কিশোর বলল। 'কিন্তু এখন কি আর সময় আছে? আমরা আলাপ-আলোচনা করে ঠিক করলাম তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাব। রোজালিন, আপনি কিছু মনে করলেন না তো?'

গভীর ভাঁজ পড়ল টমের দুই ভুরুর মাঝখানে। রোজালিন কিছু বলার আগেই বলে উঠল, 'কেন? রোজালিন কোন ডাক্তারের চেয়ে কম কিছু নয়।'

'কিন্তু হাসপাতালের মত যন্ত্রপাতি নেই তাঁর কাছে,' যুক্তি দেখাল কিশোর।

'ও ঠিকই বলছে, টম,' রোজালিন বললেন। 'ব্রাইটনে যেতে পারলে হাসপাতালের আধুনিক চিকিৎসা পাবে। আমার মনে হয় তোমার যাওয়াই উচিত।'

রবিনের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল কিশোর।

রোজালিনের দিকে তাকাল রবিন। 'আপনার ফোনটা ব্যবহার করতে পারি?'

'ওই যে ফোন,' হাত তুলে দেখিয়ে দিলেন রোজালিন।

বিছানার পাশের নাইটস্ট্যান্ডে রাখা একটা পুরানো আমলের ফোন। টেপার বোতামের পরিবর্তে ঘোরানোর ডায়াল।

'বহুকাল এ ধরনের জিনিস চোখে পড়ে না,' রবিন বলল। প্রথমে ০-তে ডায়াল করল সে। 'এটাই নিশ্চয় অপারেটরের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবে, তাই না?'

'তাই তো করার কথা,' রোজালিন বললেন। 'ব্রাইটনের অফিসের মাধ্যমেই লাইন যায় আমাদের।'

রিঙ হতে লাগল। জবাব দিল মহিলা কণ্ঠ। জিজ্ঞেস করল, 'কি সাহায্য করতে পারি?' পরক্ষণে ডেড হয়ে গেল লাইনটা।

'কেটে গেল,' জানাল রবিন। 'কোন গণ্ডগোল হলো না তো?'

'আজকে ঝড় হতে পারে শুনেছিলাম,' রোজালিন বললেন।

'ঝড়? কই, আসার পথে তো ঝড়ের কোন লক্ষণ দেখলাম না।'

'এদিকের ঝড়গুলোর কোন ঠিকঠিকানা নেই। যখন তখন চলে আসে। অল্প একটু জায়গার মধ্যেও হয়ে যেতে পারে। এ শহর আর ব্রাইটনের মাঝে কোথাও হয়ে গেলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।'

গুঙিয়ে উঠল রবিন।

কিশোর বলল, 'অমন করছ কেন? ফোন নষ্ট তো কি হয়েছে। কারও কাছ থেকে একটা গাড়ি ধার নিতে পারি আমরা। ভাড়া দিতেও আপত্তি নেই।' রোজালিনের দিকে তাকাল সে, 'কি বলেন?'

'আমারটা পাবে না,' জানিয়ে দিলেন তিনি। 'পার্টস নষ্ট হয়ে গেছে। কয়েক হপ্তা ধরে আসার অপেক্ষায় আছি। ডজ ওরিগোর একটা পিকআপ ট্রাক আছে। কিন্তু তোমাদের দেবে বলে মনে হয় না। আরও কয়েকজনের আছে। তারাও ভাড়া দেবে না।'

'তাহলে হেঁটে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই,' কিশোর বলল। 'অ্যাই, যার যার ব্যাকপ্যাক তুলে নাও। এখুনি ব্রাইটনে রওনা হব আমরা।'

'আমাকে ফেলে চলে যাচ্ছ নাকি তোমরা?' আঁতকে উঠল টম।

'ভয় নেই। যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসব। বলা যায় না, হাসপাতালের হেলিকপ্টারও পেয়ে যেতে পারি। তাহলে তো আর কথাই নেই।'

'অ্যামবুলেন্সও পাঠাতে পারে,' রোজালিন বললেন। 'যাও। গুড লাক।'

'কোন চিন্তা নেই, টম। ভাল জায়গাতেই আছ তুমি,' কিশোর বলল। 'অ্যাই, এসো তোমরা। এক মুহূর্ত দেরি করা যাবে না আর।'

দরজার দিকে রওনা হয়ে গেল চারজনে।

'হেলিকপ্টার আনতে পারলেই ভাল হয়,' পেছন থেকে ডেকে বলল টম।

'সাধ্যমত চেষ্টা করব আমরা,' জবাব দিল কিশোর।

টান দিয়ে দরজা খুলল সে। মুসা, রবিন আর রিচিকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল।

ব্রাইটনে যাওয়ার জন্যে সবচেয়ে সহজ আর ভাল মনে হলো অ্যাপালাশিয়ান ট্রেইলটাকে। আগে আগে হাঁটছে কিশোর। যত দ্রুত সম্ভব পৌঁছে যেতে চায় মূল ট্রেইলটাতে।

জ্যাকেট পরা লম্বা একজন লোককে দাঁড়ানো দেখা গেল রাস্তার পাশে। জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'অ্যাপালাশিয়ান ট্রেইলে,' জবাব দিল কিশোর।

'ব্রাইটনে যাব,' মুসা বলল। 'আমাদের এক বন্ধু পা ভেঙে পড়ে আছে। তার জন্যে মেডিক্যাল হেল্প দরকার।'

ভ্রূকুটি করল লোকটা। 'কিন্তু যেতে তো পারবে না। ট্রেইল বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।'

'মানে!' কিশোর বলল। 'যেতেই হবে আমাদের। খুব জরুরী!'

'বললাম তো, আমাদের বন্ধু অসুস্থ,' মুসা বলল।

'তার জন্যে খারাপই হলো আরকি,' লোকটা বলল। 'ঝড় হয়েছে। ট্রেইল বন্ধ হয়ে গেছে। ব্রাইটনে যাবার রাস্তাও বন্ধ। বন্যা হয়ে পানিতে ডুবে গেছে। রাস্তাটাস্তা ঠিক না হলে মরগান'স কোঅরি থেকে কেউ বেরোতে পারবে না আর।'

পাঁচ

'আহ্, চলো তো!' মুসা বলল। 'ঝড়টড় কিছু দেখিনি আমরা। শুনতেও পাইনি। কয়েক ঘণ্টা আগেও তো ট্রেইল ভাল দেখে এলাম।'

'ঝড় এখানে দেখার আগেই চলে আসে,' কঠিন কণ্ঠে বলল লোকটা। 'আর আমার কথার গুরুত্ব না দেয়াটা আমি পছন্দ করি না।'

'আপনি আসলে কে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

চামড়ার জ্যাকেটের পকেট থেকে আইডেনটিটি কার্ড বের করল লোকটা। 'আমি জোহানেস নউম। এই এলাকার শেরিফ।'

'তারমানে মরগান'স কোঅরির ইন-চার্জ?' রবিন বলল।

'হ্যাঁ। ঘণ্টাখানেক আগে ফোন পেলাম, শহর থেকে বেরোনোর সমস্ত রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। তোমাদেরকে এখন ট্রেইলে যেতে দিতে পারি না আমি। সাংঘাতিক বিপজ্জনক।'

কৌতূহলী চোখে শেরিফের দিকে তাকাল রিচি। 'ঝড়ের তো কোন লক্ষণই দেখছি না আমরা কোনখানে।'

'হ্যাঁ, তাই তো,' তার সঙ্গে সুর মেলাল মুসা। 'পাহাড়ের ওপর থেকেও আবহাওয়ার কোন রকম উল্টোপাল্টা চোখে পড়েনি আমাদের।'

বাঁকা চোখে মুসার দিকে তাকাল শেরিফ। 'তুমি কি আবহাওয়াবিদ নাকি?'

'না, তা নই...' আমতা আমতা করতে লাগল মুসা।

কিন্তু কিশোর দমল না। বলল, 'আমিও আবহাওয়াবিদ নই। কিন্তু তাতে কি, পুরো ব্যাপারটাই একটা ভাঁওতাবাজি মনে হচ্ছে আমার কাছে।'

কঠিন হাসি ফুটল শেরিফের ঠোঁটে। 'যত বাহাদুরিই করো না কেন, এখান থেকে বেরোতে হলে আমার ছাড়পত্র নিতেই হবে তোমাদের। বেরিয়ে দেখো খালি, ঘাড় ধরে গিয়ে নিয়ে আসবে আমার ডেপুটিরা।'

'দেখুন, শেরিফ,' নরম হয়ে চেষ্টা করে দেখল রবিন, 'আমাদের বন্ধুটির অবস্থা সত্যিই খুব খারাপ। রাস্তা এখনও ভাল থাকতে থাকতে ওকে ব্রাইটনে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা অতি জরুরী। হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে ওকে।'

'রাস্তা যখন ভাল হবে তখন দেখা যাবে। এখন ওসব কথা বাদ,' সাফ বলে দিল শেরিফ।

কিশোরের দিকে ফিরল রবিন, 'শহরে ফেরা ছাড়া গতি নেই। কি বলো? চলো, রাতটা গিয়ে এখানেই কাটিয়ে দিই, রোজালিনের কথামত।'

নিরাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল কিশোর। সবাইকে নিয়ে শহরে ফিরে চলল আবার। রোজালিনের বাড়িতে ঢুকে টমকে জানাল, ওর জন্যে সাহায্য আনতে যেতে পারেনি ওরা। কিছুই মনে করল না সে।

তারপর ওরা গেল পাশের বাড়ির মিসেস হ্যারিয়েটের বাড়িতে। জানালায় উজ্জ্বল রঙের প্রচুর ফুল সাজিয়ে রাখা হয়েছে। সামনের দরজায় গিয়ে বেল বাজাল কিশোর।

উঁকি দিলেন অনেক বয়েসী এক বৃদ্ধা। সন্দেহ ভরা দৃষ্টি, তবে অনান্তরিক নয়। 'কি চাই, ইয়াং মেন?'

'রাতের জন্যে একটা ঘর,' জবাব দিল কিশোর।

'ও, তোমরাই তাহলে সেই হাইকার-পর্বতে ঘুরতে বেরিয়েছ,' বৃদ্ধা বললেন, 'যাদের কথা শুনলাম। এসো, ভেতরে এসো। আমার নাম ক্যামেলিয়া হ্যারিয়েট।'

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। 'খবর এখানে বাতাসের আগে ছোটে।'

'চমৎকার একটা ঘর আছে আমার,' মিসেস হ্যারিয়েট জানালেন, 'চারটে বাংক সহ। নেবে ওটা?'

'যা দেবেন তাতেই খুশি,' জবাব দিল মুসা। 'পা দুটোকে এখন একটু শান্তি দেয়া দরকার।'

'আমার মতে ওটা নিলেই ভাল করবে,' মিসেস হ্যারিয়েট বললেন।

বিরাট একটা ঘরে ওদেরকে নিয়ে এলেন তিনি। বিছানাগুলো দেয়াল ঘেঁষে পাতা। দেখেই বোঝা যায় বহুকাল কেউ শোয়নি ওগুলোতে।

'খনিতে যখন কাজ ছিল,' মিসেস হ্যারিয়েট জানালেন, 'এ ঘরটা তখন খুবই জনপ্রিয় ছিল তরুণ খনি-শ্রমিকদের কাছে। অনেক অনেক বছর আগের কথা সেটা। সবে তখন জন্ম হয়েছে আমার।'

'হ্যাঁ, ঘরটা সুন্দর,' কিশোর বলল। 'ভাড়াটা কি এখনই দিয়ে দিতে হবে? না যাওয়ার সময়?'

'টাকা-পয়সা নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না এখন,' মিসেস হ্যারিয়েট বললেন। 'কাল যাওয়ার সময় দিলেই চলবে। হাত-মুখ ধুয়ে এসো। আধঘন্টার মধ্যেই খাবার রেডি হয়ে যাবে। তারপর যত খুশি ঘুম দাও।'

হেসে, দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে চলে গেলেন তিনি।

বেসিনের সামনে হাতে সাবান মাখাতে মাখাতে রবিন বলল, 'রাতের জন্যে মরগান'স কোঅরিতে আটকাই পড়লাম তাহলে।'

'বলা যায় না,' কিশোর বলল, 'আরও বেশি সময়ের জন্যেও হতে পারে। শেরিফের ভাবভঙ্গি মোটেও ভাল ঠেকেনি আমার। কোনমতেই বেরোতে দিতে রাজি নয়।'

'সত্যি ঝড়ের জন্যে হয়ে থাকলে,' রিচি বলল, 'কালকের মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে যাবার কথা।'

'হয়তো,' অনিশ্চিত শোনাল কিশোরের কণ্ঠ।

'কোন কিছু সন্দেহ জাগিয়েছে মনে হচ্ছে তোমার?' রবিনের প্রশ্ন।

'সন্দেহ কিনা বুঝতে পারছি না। তবে পুরো শহরটার পরিবেশটাই কেমন অদ্ভুত লাগছে।'

'খটকা একটা আমারও লেগেছে,' রবিন বলল। 'সেটা অতিরিক্ত খিদের জন্যেও হতে পারে। খেয়ে পেটটা ভরিয়ে ফেলি আগে। তারপর দেখা যাক কেমন লাগে।'

'ঠিক বলেছ,' তুড়ি বাজাল মুসা। 'একদম আমার মনের মত কথা।'

হাত-মুখ ধোয়ার পর আর একটা মিনিট দেরি করল না ওরা। সোজা রওনা হলো ডাইনিং রুমে। দীর্ঘ, ব্যস্ততম একটা দিন কেটেছে ওদের।

পরদিন সকালে সবার আগে ঘুম ভাঙল মুসার। প্যানকেক আর মাংস ভাজার সুগন্ধে।

'গাঁয়ের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে,' মুসা বলল। 'পুরানো আমলের গাঁয়ের সকালগুলো বোধহয় এমনি মধুরই ছিল।'

কানের ওপর বালিশ চাপা দিয়ে রেখেছে রবিন। তলা দিয়ে উঁকি দিল। 'আমার এখনও মনে হচ্ছে দেড়শো মাইল পথ দৌড়ে এসেছি।'

'তোমার একার নয়,' কিশোর বলল। 'আমাদের সবারই তাই মনে হচ্ছে।'

লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়ল মুসা। 'তোমাদের সবার কথা জানি না আমি। তবে আমার আর পেটে খাবার না দিলে চলছে না।'

হাসল রবিন। 'এমন কোন সময়ের কথা কি বলতে পারবে, যখন তোমার পেটে খাবার না দিলে চলে না?'

'শাওয়ারে গরম পানি আছে নাকি কে জানে,' কিশোর বলল। 'কাল রাতে এত ভিজা ভিজলাম, তার পরেও এখন মনে হচ্ছে সারা গায়ে মাটির আস্তর পড়ে গেছে। টমেটোর চারা লাগানো যাবে।'

'টমেটো খুব ভাল জিনিস,' মুসা বলল।

গোসল সেরে এল মুসা। নাস্তা করতে রওনা হলো। হলঘর দিয়ে এগোল ডাইনিং রুমের দিকে। নাক উঁচু করে খাবারের গন্ধ শুঁকছে। ওরা যেখানে ঘুমিয়েছে, তার এক ঘর পরেই রান্নাঘর। খাবার তৈরি করছেন মিসেস হ্যারিয়েট।

'ও, এসে গেছ,' মুসাকে ঢুকতে দেখে হেসে বললেন তিনি। 'সময় মতই এসেছ। তোমার জন্যে বিশাল একটা নাস্তার আয়োজন করেছি আমি। খিদে পেয়েছে তোমার?'

'পেয়েছে মানে?' প্রায় লাফ দিয়ে গিয়ে খাবার টেবিলে বসে পড়ল মুসা।

'মিসেস হ্যারিয়েট, মুসার ব্যাপারে সাবধান,' হাসিমুখে ঘরে ঢুকল কিশোর। 'ওকে প্রশ্রয় দিলে আপনার ঘরবাড়িসুদ্ধ খেয়ে ফেলবে।'

'তা খাক,' মিসেস হ্যারিয়েট বললেন। 'যত পারে খাক। প্রচুর খাবার আছে বাড়িতে।'

'মুসাকে আপনি চেনেন না, মিসেস হ্যারিয়েট,' রবিন বলল। রিচিও ঢুকেছে তার সঙ্গে।

নাস্তা দিতে শুরু করলেন মিসেস হ্যারিয়েট। প্লেট ভর্তি ডিম ভাজা, আলু ভাজা, মাংস ভাজা আর প্যানকেক। নিজের প্লেট ভর্তি করে খাবার নিতে লাগল মুসা।

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, ম্যা'ম,' খাওয়া শুরু করে দিল সে। 'ইচ্ছে করছে চিরকাল এখানে থেকে যাই।'

'খেতে পারাটাই তো আনন্দ,' মিসেস হ্যারিয়েট বললেন।

বাকি তিনজনও বসে গেল। খেতে খেতে প্রশংসা করল, মিসেস হ্যারিয়েটের রান্নার সত্যিই তুলনা হয় না! কিশোর বলল, তার মেরিচাচী ভাল রাঁধেন। তার চেয়ে ভাল রাঁধে চাচীর বহাল করা নতুন হাউসকীপার মিস এসমারেল্ডা কোয়াভরুপল ওরফে ইজিআন্টি। মিসেস হ্যারিয়েটের রান্না তার চেয়েও ভাল মনে হলো তার। আসল কথা, এক নাগাড়ে শুকনো গরুর মাংস খেয়ে খেয়ে যা পাবে এখন সেটাই অমৃত মনে হবে, বিশেষ করে ঘরের মধ্যে একটা অতি চমৎকার শান্তির ঘুমের পর।

প্লেট বাড়িয়ে দিল মুসা। 'প্যানকেক আর আছে?'

হাসি চওড়া হলো মিসেস হ্যারিয়েটের। 'নিশ্চয়ই।'

রবিন বলল, 'মাংস ভাজা থাকলে আমাকে আরেকটু দিন।'

'কি ব্যাপার?' ভুরু নাচাল কিশোর। 'মুসার সুর বাজছে তোমার কণ্ঠে!' হেসে বলল, 'আসলে, আমারও ডিমভাজা লাগবে।'

'আমার আলুভাজা,' রিচি বলল।

'একটু বসো। নিয়ে আসছি,' মিসেস হ্যারিয়েট বললেন। 'বাহ্, ঘরটা আবার জ্যান্ত হয়ে উঠল। তরুণ রক্ত না থাকলে কি ভাল লাগে?'

মিসেস হ্যারিয়েট খাবার আনতে চলে গেলে কিশোরের দিকে কাত হলো রবিন, 'আজ কি শহর থেকে বেরিয়ে যেতে পারব, কি মনে হয় তোমার?'

'বলা কঠিন,' জবাব দিল কিশোর। 'আবার ট্রেইলে ফিরে যেতে হবে

আমাদের। এবার আর শেরিফের সামনে পড়া চলবে না।'

অবশেষে টেবিল থেকে নিজেকে টেনে তুলল কিশোর। 'দারুণ একটা খাওয়া দিলেন, মিসেস হ্যারিয়েট। পেট একেবারে বোঝাই হয়ে গেছে। কিন্তু এখন তো আমাদের যেতে হচ্ছে।'

'হায় হায়, এখুনি!' হতাশই মনে হলো মিসেস হ্যারিয়েটকে। 'র‍্যাস্‌প্‌বেরির হালুয়াটা কে খাবে?'

'আমি থাকছি,' মুসা বলল।

নাক উঁচু করে গন্ধ শুঁকে রবিন বলল, 'গন্ধ তো আসছে দারুণ। কিন্তু থাকা সম্ভব নয়।'

মুসার কাঁধ খামচে ধরল কিশোর। ঝাঁকি দিয়ে বলল, 'ওঠো। জলদি করো। টমের কথা মাথা থেকে উধাও করে দিলে নাকি?'

আস্তে করে হাতটা ছাড়িয়ে নিল মুসা। 'না, উধাও করব কেন? কিন্তু নিজেদেরও তো একটা পেট আছে।'

'তোমার পেট তো সারাক্ষণই থাকে। আরেকবার যদি এখন নতুন করে নাস্তা দিতে চান মিসেস হ্যারিয়েট, তাতেও তোমার আপত্তি থাকবে না। নাও, ওঠো।'

'যা যা খেয়েছ, আরও প্রচুর আছে সে-সব,' মিটিমিটি হাসছেন মিসেস হ্যারিয়েট। 'চাইলে আরেকবার দিতে পারি।'

'না না, ম্যা'ম,' মুসা কিছু বলার আগেই তাড়াতাড়ি বাধা দিল কিশোর, 'এখন আর সময় নেই। আমাদের যেতে হবে।'

'আরেকটু বসো না,' মুসা বলল। 'র‍্যাস্‌প্‌বেরির হালুয়াটা খেয়েই যাই...'

টান দিয়ে তাকে চেয়ার থেকে তুলে ফেলল কিশোর।

ঘর ভাড়া আর মিসেস হ্যারিয়েটের খাবারের দাম মিটিয়ে দিল সে। বলল, শীঘ্রি এসে ব্যাগগুলো নিয়ে যাবে।

ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে সামনের দরজার দিকে এগোল ওরা। মেইন স্ট্রীট সকালের রোদে উজ্জ্বল।

রোজালিনের বাড়ির দরজায় তালা কিংবা ভেতর থেকে ছিটকানি লাগানো নেই। ঘরে ঢুকে দেখল, উত্তপ্ত তর্ক-বিতর্ক চলছে টম আর রোজালিনের মাঝে।

'তারপর?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'কেমন আছ তুমি?'

'দারুণ!' এক কথায় জবাব দিয়ে দিল টম। 'ভাগ্যিস পা'টা ভেঙেছিল। নইলে রোজালিনের কাহিনীগুলো মিস করতাম।'

'ভালই উন্নতি হচ্ছে টমের,' রোজালিন জানালেন। 'শেরিফ নউম এসেছিল। বলে গেছে রাস্তাঘাট এখনও খারাপ, সাংঘাতিক বিপজ্জনক, যাওয়ার উপযুক্ত হয়নি। তারমানে আরও কিছু সময় থাকতে হচ্ছে এখানে তোমাদের।'

'বাহ্, চমৎকার!' গুঙিয়ে উঠল রবিন। 'মনে হচ্ছে আমাদের আটকে রাখার জন্যে সবাই মিলে একটা ষড়যন্ত্র করছে এখানে।'

'তারমানে মিসেস হ্যারিয়েটের র‍্যাস্‌প্‌বেরির হালুয়াটা আমাদের ভোগেই লাগছে,' খুশি মনে বলল মুসা।

'এবং তারমানে এ মুহূর্তে এ শহরের সবচেয়ে খুশি দু'জন লোক হলো মুসা

আর টম,' আক্ষেপ করে বলল কিশোর। 'যাদের একজনের জন্যে আমাদের এই ভোগান্তি।'

'হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে ভোগান্তিটা আরও বাড়বে,' রবিন বলল। 'তারচেয়ে বরং চলো, দেখি, সময় কাটানোর জন্যে কিছু বের করা যায় কিনা। এখানে লোকে সময় কাটায় কি করে?'

'বিনোদনের তেমন কিছু নেই,' জবাব দিলেন রোজালিন। 'লোকে পড়শীর বাড়িতে আড্ডা দিতে যায়। কিংবা ঘরে বসে টিভি দেখে।'

'অ্যাই, এক কাজ করতে পারি তো আমরা,' মুসা বলল। 'ওই চাষী লোকটার বাড়িতে বেড়াতে যেতে পারি। ডজ ওরিগো তো আমাদের দাওয়াতই করে গেল।'

'আমি তেমন আগ্রহ বোধ করছি না,' জানিয়ে দিল রবিন।

'আর কোন কাজ নেই যখন,' কিশোর বলল, 'ওখানেই ঘুরে আসা যাক। বলা যায় না, আগ্রহ জাগানোর মত কিছু পেয়েও যেতে পারি।'

রোজালিনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের দিকে রওনা হলো ওরা। ওরিগো ম্যানসনের দিকে। কাছাকাছি আসতে বোঝা গেল, দূর থেকে যতটা মনে হয়েছিল, তারচেয়ে অনেক বড় বাড়িটা। সংস্কারের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। জায়গায় জায়গায় রঙ উঠে গেছে। কব্জা ছুটে গিয়ে কাত হয়ে ঝুলছে জানালার পাল্লা। সামনের চত্বরে অযত্নে বেড়ে উঠেছে ঘাস। কিছু কিছু পানির অভাবে মরে গেছে। বাকিগুলো কাটা হয় না বহুকাল।

ওদের আসতে দেখেছে ওরিগো। সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে দৌড়ে এল দেখা করার জন্যে। মুখে দরাজ হাসি। 'হাল্লো বয়েজ। তোমাদেরকে আমার জায়গাটা দেখানোর জন্যে কাল থেকেই অপেক্ষা করছি।'

'সুন্দর ফার্ম আপনার,' রিচি বলল। 'কি জন্মান?'

'এ মুহূর্তে গরুর জন্যে ঘাস,' জানাল ওরিগো। 'ঘাস থেকে খড় হবে। আমাদের কিছু দুধেল গরু আছে। ও, হ্যাঁ, চমৎকার কিছু ঘোড়াও আছে।'

'দারুণ!' বলে উঠল মুসা। 'ঘোড়া আমার খুব পছন্দ। দেখাবেন?'

'নিশ্চয়ই,' ওরিগো বলল। 'আমাদের সবচেয়ে ভাল ঘোড়া হলো ব্ল্যাক ক্যাট। খুব শান্ত স্বভাবের। তোমাদের পছন্দ করবে।'

'ঘোড়ার নাম ক্যাট?'

'কেন, অসুবিধে কি? ক্যাট মানে বিড়াল, কিন্তু ক্যাট ফ্যামিলি যদি ধরো? সিংহও পড়ে তার মধ্যে। আমাদের ব্ল্যাক ক্যাটকে সিংহের চেয়ে কম বলা যাবে না।'

'তুমি ঘোড়া দেখতে থাকো,' কিশোর বলল। 'আমি বাড়িটা ঘুরে দেখে আসি।' ওরিগোর দিকে তাকাল সে। 'আর্কিটেকচার আমার প্রিয় সাবজেক্ট।'

কিশোরের চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি লক্ষ করল রবিন। আর কারও চোখে সেটা পড়ল না।

'যাও না, যাও,' অনুমতি দিয়ে দিল ওরিগো। 'এ বাড়িটা তৈরি হয়েছে উনিশ শতকে। অনেক ইন্টারেস্টিং জিনিস পাবে এর মধ্যে।' মুসাদের দিকে তাকাল সে। 'তোমরা এসো আমার সঙ্গে।'

সবাই এগোলেও রবিন আসতে এক মুহূর্ত দেরি করল। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল কিশোরকে, 'কি ব্যাপার? কিছু চোখে পড়েছে নাকি?'

'কি যেন একটা ঘটছে এই শহরটাতে,' কিশোর বলল। 'টাকার ব্যাগওয়ালা ওই লোকগুলো; তারপর শেরিফ, যে আমাদের বেরিয়ে যেতে দিতে চাইছে না কোনমতেই, ঝড়-যা সত্যিই হয়েছে কিনা বুঝতে পারছি না, টেলিফোন-যেটা ইচ্ছে করেই ডেড করে দিল মনে হলো; তার ওপর এই বাড়ি-যেখান থেকে নিচের দিকে যেখানে খুশি চোখ রাখা সম্ভব, সব কিছুর মধ্যেই রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি আমি। সে-জন্যেই একবার দেখে আসতে চাই।'

'যাও। কিন্তু অকারণে গোলমালে জড়ানো বোধহয় ঠিক হবে না,' সাবধান করল রবিন। ওরিগো বলেছিল তার দু'জন সহকারী আছে। ওরা নজর রাখতে পারে।'

তাড়াহুড়ো করে চলে গেল রবিন। সবার সঙ্গে সঙ্গে নামতে লাগল পাহাড়ের ঢাল বেয়ে। পুরানো একটা গোলাঘরের দিকে ওদেরকে নিয়ে যাচ্ছে ওরিগো। ঘরের বাইরে তক্তার তৈরি ঘেরের মধ্যে একটা সুন্দর, বিশাল কালো ঘোড়া।

'ওর নাম ব্ল্যাক ক্যাট,' ওরিগো বলল। 'চড়ার ইচ্ছে আছে কারও?'

'আমি চড়ব,' সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল মুসা। 'শুধু একটা জিন দরকার আমার।'

'দাঁড়াও, এনে দিচ্ছি।'

গোলাঘর থেকে একটা জিন নিয়ে বেরিয়ে এল ওরিগো। ব্ল্যাক ক্যাটের পিঠে ছুঁড়ে দিল।

দ্রুত অভিজ্ঞ হাতে জিনটা ঘোড়ার পিঠে বেঁধে নিল মুসা। লাফ দিয়ে উঠে বসল। মনে হলো মুসাকে সহ্য করে নিয়েছে ব্ল্যাক ক্যাট।

ওরিগো একটা পিপা থেকে একটা আপেল বের করে মুসার হাতে দিয়ে বলল, 'নাও। ঘোড়াটাকে বশ করতে কাজে লাগবে।'

সামনে ঝুঁকে হাত লম্বা করে আপেলটা ঘোড়ার মুখের কাছে ধরল মুসা। 'আপেল পছন্দ করো তুমি, তাই না খোকা?' ঘোড়াটাকে জিজ্ঞেস করল সে।

আচমকা পেছনের পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে গেল ব্ল্যাক ক্যাট। আপেলটা কিছু একটা করেছে। ধনুকের মত পিঠ বাঁকা করে পাগলের মত লাফ দিল কয়েকটা। তারপর ঘুরে ঘুরে পাগলের মত লাফানো শুরু করল। মুসাকে পিঠ থেকে ফেলে দেয়ার সব রকম চেষ্টা করতে লাগল।

প্রাণপণে জিন আঁকড়ে বসে রইল মুসা। কোনমতে সোজা হয়ে লাগাম ধরে টান দিল জোরে। কিন্তু তাতে নরম হলো না ঘোড়া, আরও জোরে জোরে লাফানো শুরু করল।

শঙ্কিত হয়ে পড়েছে রবিন। বুঝতে পারছে, বাঁচতে হলে ঘোড়াটাকে এখন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে হবে মুসাকে, এবং যত দ্রুত সম্ভব। তা নাহলে যে কোন মুহূর্তে তাকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে ভর্তা করবে ঘোড়াটা।

ছয়

'আরে, কিছু একটা করুন!' চিৎকার করে উঠল রবিন। 'মিস্টার ওরিগো, থামান ঘোড়াটাকে!'

অসহায় ভঙ্গিতে হাত তুলল ওরিগো। 'কি করব বুঝতে পারছি না! এ রকম ব্যবহার তো কখনও করেনি ব্ল্যাক ক্যাট।'

বোকা হয়ে তাকিয়ে আছে রবিন আর রিচি। কি করবে বুঝতে পারছে না। জিনের সামনে বেরিয়ে থাকা শিং-এর মত একটা খুঁটা চেপে ধরল মুসা। আরেক হাতে আঁকড়ে ধরল ব্ল্যাক ক্যাটের কেশর। তারপর অন্য হাতটাও বাড়িয়ে দিল কেশরের দিকে। ধরে সঙ্গে সঙ্গে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল ঘোড়ার পিঠে। দুই হাতে গলা পেঁচিয়ে ধরল ঘোড়াটার।

হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছে রিচি আর রবিন। ওদের মনে হচ্ছে ঘোড়াটার কানে কানে কথা বলছে মুসা।

ধীরে ধীরে কমে আসতে লাগল ঘোড়াটার উন্মত্ততা। শান্ত হলো অবশেষে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল মুসাকে পিঠে নিয়ে।

'আমি জানতাম তুই আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবি, ব্ল্যাক ক্যাট,' ঘোড়াটাকে বলল মুসা। 'তুই একটা ভাল ঘোড়া। দেখেই বুঝেছিলাম।'

'কি জাদু ওকে করলে তুমি, মুসা?' বিস্ময়ের ঘোর কাটাতে পারেনি এখনও রিচি।

'আমিও তাই বলি,' রবিন বলল। 'এ রকম কাণ্ড জীবনে দেখিনি আমি!'

'ভাগ্য ভাল, বেঁচে গেলে,' ওরিগো বলল।

'ভাগ্যটাগ্যর ব্যাপার নয় এটা,' জবাব দিল মুসা। 'ঘোড়ায় চড়া আমার নেশা। অনেকেই বলে, ঘোড়া সামলাতে পারাটা আমার জন্মগত গুণ। কোন কোন সময় কথা বলেই ওদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা যায়।'

'যাই হোক, নেমে এসো,' ওরিগো বলল। 'দ্বিতীয়বার আর ওই ঘটনা ঘটতে দিতে চাই না আমি।'

'আর ঘটবে না,' ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল না মুসা। 'কি বলিস, ব্ল্যাকি? ওর সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় হয়ে গেছে আমার। আর কোন গণ্ডগোল করবে না। কি রে, করবি?'

ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে গোলাঘরের চত্বরে চক্কর দিতে লাগল মুসা। ওরিগোকে বলল, 'যান, রবিন আর রিচিকে খামারটা দেখিয়ে আনুন। আমরা আছি।'

ঘোড়াটার মাথার পাশে আলতো চাপড় দিল ওরিগো। 'কি হয়েছে বুঝে গেছি,' আচমকা উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর চেহারা। 'ব্ল্যাক ক্যাটকে মাঝে মাঝে

সিনেমায় ব্যবহার করা হয়েছে। স্টান্ট দেখানোর জন্যে। সবই ওয়েস্টার্ন ছবি। ওর ট্রেনার ওকে কিছু কিছু কায়দা শিখিয়ে দিয়েছে। শিখিয়েছে, আপেল দেখলেই ওরকম করে লাফাতে হবে।'

'আপনি বলতে চাইছেন···আপেলটাই যত অঘটনের মূল?' রবিনের কণ্ঠে সন্দেহ।

'হ্যাঁ,' ওরিগো বলল। 'সত্যি আমি খুব দুঃখিত। দোষটা আমার। তোমার বন্ধুর খারাপ কিছু ঘটে গেলে আজকে, নিজেকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারতাম না আমি।'

ওরিগো যাতে না শোনে, এমন করে রিচিকে বলল রবিন, 'ঘোড়াটা যদি আপেল দেখলেই অমন করে, তাহলে ওকে আপেল খাওয়াতে বলল কেন ওরিগো? ও তো বলল বশ করতে কাজে লাগবে? কেমন পরস্পর বিরোধী কথা না?'

'আমারও অবাক লাগছে,' ফিসফিস করে বলল রিচি।

ওদের কথা ওরিগো শুনল বলে মনে হলো না। হাত নেড়ে বলল, 'এদিক দিয়ে এসো। আমাদের ট্র্যাকটরটা দেখবে। নতুনই বলা চলে। খুব ভাল মেশিন।'

নিচু স্বরে রিচিকে বলল রবিন, 'যত ভাবেই বোঝাক না কেন, ওই ট্র্যাকটরে বসতে বললে কোনমতেই বসব না আমি।'

মাত্র কয়েকশো গজ দূরে এ ঘটনার কিছুই জানতে পারল না কিশোর। বাড়িটার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। ধসে যাওয়া, খসে পড়া পাথরের দেয়াল, ভাঙা জানালা এ সব দেখছে। এক সময় সাংঘাতিক একটা বাড়ি ছিল এটা। কিন্তু সেদিন আর এখন নেই। এটা এখন মেরামত করতে হাজার হাজার ডলার লেগে যাবে। বাইরের দিকটা যেমন তেমন, ভেতরের দিকটা নিশ্চয় আরও খারাপ হবে, আন্দাজ করল সে।

বাড়ির মধ্যে ঢোকার পথ আছে কিনা, খুঁজে বেড়াচ্ছে। সামনের দরজায় তালা লাগিয়ে গেছে কিনা ওরিগো, দেখেনি সে। পাথরের সিঁড়ি বেয়ে ওটার কাছে উঠে এল। কাঠের পাল্লা। ঠেলা দিতে সহজেই খুলে গেল।

'কেউ আছেন?' চিৎকার করে ডাকল কিশোর। চাকর-বাকরদের কেউ কিংবা খামারে যারা কাজ করে তাদের একআধজন থাকতে পারে।

কেউ সাড়া দিল না। বাড়িটা একেবারে নির্জন মনে হলো।

চওড়া অনেক বড় একটা বসার ঘর দেখা গেল। বিষণ্ণ পরিবেশ। দু'দিকের দেয়াল ঘেঁষে বড় বড় দুটো কাঠের টেবিল পাতা। পাগুলো বাঁকা, অলংকরণ করা। মিউজিয়াম কিংবা অ্যানটিক স্টোরে ছাড়া এ ধরনের আসবাব দেখেনি কিশোর। একটা টেবিলে রাখা ময়লা একটা ফুলের ভাস। তাতে ফুল নেই। আরেকটা টেবিল দেখে মনে হলো ভাস হয়তো ছিল এক সময়। টেবিলের নিচে ছড়ানো ছোট ছোট ভাঙা কাঁচের টুকরোও চোখে পড়ল তার। ভাস ভাঙাই হবে। বাঁ দিকের দেয়ালে বড় একটা ছবি ঝুলছে। অভিজাত পোশাক পরা একজন পুরুষ। বাঁ গালে মস্ত একটা আঁচিল। শার্টের খাড়া, সাদা কলার। ছবির নিচে পিতলের

ফলকে নাম লেখা: হিয়াম ওরিগো। ময়লা হয়ে আছে। মোছা হয় না বহুকাল। চারিদিকে অযত্ন আর অবহেলার ছাপ।

কিশোরের মনে হলো, এই ভদ্রলোকই এ বাড়ির প্রতিষ্ঠাতা।

বসার ঘরের ওপাশে একটা বিশাল পারলার। চারপাশে ছড়ানো লাল রঙের মখমলে মোড়া গদিওয়ালা অতিরিক্ত বড় বড় সোফা। ধুলো আর মাকড়সার জাল দেখে অনুমান করতে কষ্ট হয় না, বসার এই ঘরটাকে কেউ আর ব্যবহার করে না আজকাল।

একপাশের দেয়াল ঘেঁষে মস্ত বুককেস। প্রচুর বই আছে তাতে এখনও। বেশির ভাগই ধুলো পড়া। তবে একটা বই দেখা গেল বেশ পরিষ্কার। তারমানে মাঝে মাঝেই বের করে পড়া হয় ওটা। বইটার নাম পড়ল সে। দি রোরিং টোয়েন্টিজ: এন্ড অড এন ইরা।

টান দিয়ে বইটা নামাল সে। খুলতে গিয়ে আপনাআপনি খুলে গেল একটা পাতা। বহুবার ওল্টানো হয়েছে পাতাটা, বোঝা গেল। তাতে একটা প্রাসাদের ছবি। যেটার মধ্যে এখন দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। ১৯২৮ সালে তোলা ছবি। এখনকার চেয়ে ভাল ছিল তখন বাড়িটার অবস্থা। বাড়ির সামনে দাঁড়ানো সে-আমলের পোশাক পরা সুবেশী নারী-পুরুষ। সবার মাঝখানে দাঁড়ানো লোকটাকে চিনতে পারল কিশোর। হিয়াম ওরিগো। তখনই তার বয়েস সত্তরের কম হবে না।

পরের পাতাটায় ওরিগো ম্যানশনের বিবরণ রয়েছে। পড়তে আরম্ভ করল কিশোর।

উনিশ শতকের শেষ দিকে গ্র্যানিট কোঅরিটা কেনেন হিয়াম ওরিগো, হামফ্রে মরগান নামে এক লোকের কাছ থেকে। সেই মরগানের নামেই শহরটার নামকরণ হয়েছে। কিশোরের মনে পড়ল, রেডও তাকে একই কথা বলেছিল। তারমানে তার পূর্বপুরুষরা ওরিগোদের আগে থেকেই ছিল এখানে। খনির আয় দিয়ে বড়লোক হয়ে গিয়েছিল ওরিগোরা। এই প্রাসাদ তৈরি করেছিল। কিন্তু ১৯১০ সালে শেষ হয়ে যায় সমস্ত গ্র্যানিট। ততদিনে অন্য আরেকটা ব্যবসা দাঁড় করিয়ে ফেলেছেন হিয়াম ওরিগো। ১৯২০ সালে 'প্রহিবিশন', অর্থাৎ মদ বানানো আর বিক্রিকে নিষিদ্ধ করে দিয়ে এর ওপর যখন কড়া আইন তৈরি হলো, প্রাসাদটাকে তখন বেআইনী মদ বিক্রির আড্ডা বানিয়ে ফেললেন হিয়াম। ১৯২০ থেকে ১৯৩৩-এর মধ্যে এ ছিল অনেক দুঃসাহসের ব্যাপার। মদের আড্ডা বানানোর সঙ্গে সঙ্গে বাড়িটাকে সরাইখানাও বানিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। ধনী লোকেরা এখানে আসত উইকএন্ডের ছুটি কাটানোর জন্যে। কেউ কেউ পুরো হপ্তাটাই কাটিয়ে যেত। রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি তখন ছিল হিয়াম ওরিগোর, তাই পুলিশ তাঁকে কিছু বলত না। বেআইনী এই ব্যবসাটা বন্ধ করতেও আসেনি কেউ। কিন্তু ১৯৩৩ সালে যখন প্রহিবিশনের ওপর থেকে আবার আইন তুলে নেয়া হলো, ব্যবসাটা আর ধরে রাখতে পারলেন না তিনি। বেআইনী মদের আড্ডায় যাওয়ার আর প্রয়োজন পড়ল না কারও। হিয়াম ওরিগোর এই ব্যবসাটাও বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর প্রাসাদটার কি গতিক হলো, সেটা আর লেখা নেই বইটাতে।

পুরানো আসবাব আর অপরিষ্কার কার্পেটটার দিকে তাকাল আবার কিশোর।

নোংরা হয়ে আছে জায়গাটা। তবে ১৯৩৩-এর পরেও পরিষ্কার করা হয়েছে, বোঝা যায়। হয়তো গ্র্যানিট কোঅরি থেকে এখনও অল্প-বিস্তর আয় হয়, তবে বইয়ের কোথাও লেখেনি সে-কথা। কিংবা ফার্ম থেকে আয় হয়। সেটা দেখে অবশ্য মনে হয় না দুটো টাকাও আসে ওখান থেকে। বাড়িটার অবস্থা দেখেও বোঝা যায় আগের উপার্জনের কণামাত্রও আর নেই এখন এদের। যেহেতু এই বাড়িটাকে ঘিরেই সারা শহরের টাকা উপার্জন চলে, সুতরাং এর খারাপ হওয়ার অর্থ শহরটারও শুকিয়ে যাওয়া।

পারলারের এক পাশের একটা ঘর দৃষ্টি আকর্ষণ করল কিশোরের। কোন ধরনের অফিস-টফিস হবে। অনেক বড় একটা ডেস্ক আছে তাতে। তাকে রাখা সারি সারি লেজার। এখানেই নিশ্চয় ওরিগো কোম্পানির অফিস চলত, খনি এবং বেআইনী মদের ব্যবসার। একটা লেজার খুলে দেখল সে। ভেতরে নামের তালিকা। পাশে টাকার অঙ্ক। কোনটার পাশে যোগ চিহ্ন দেয়া, কোনটাতে বিয়োগ। নামের পাশের তারিখগুলো দেখে বোঝা গেল লেনদেনটা হয়েছে ১৯৬০ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে।

'কি সাহায্য করতে পারি তোমাকে?' অস্বাভাবিক ভারী একটা কণ্ঠ বলে উঠল কিশোরের পেছন থেকে।

এতটাই চমকে গেল সে, হাত থেকে পড়ে গেল খাতাটা। ঘুরে তাকিয়ে দেখল লম্বা একজন লোক দাঁড়ানো। বয়েস ষাটের কাছাকাছি। আড়ষ্ট ভঙ্গি, আগের দিনে রাজা-রাজড়া জমিদারদের বাড়িতে যেমন থাকত তেমন। তবে পরনের পোশাকটা আধুনিক। বাটলারের বিশেষ পোশাকের পরিবর্তে জিনস আর ফ্লানেলের শার্ট পরেছে।

ওরিগোর বাড়িঘর দেখাশোনার লোক হবে, ভাবছে কিশোর। কিন্তু এটাও বুঝতে পারছে না, বাড়িটাই যার সংস্কারের ক্ষমতা নেই, বাড়ি দেখার লোক দিয়ে কি করবে সে? খরচই বা পোষায় কি করে?

'আমি…ইয়ে…হারিয়ে গেছি,' বলল কিশোর। লেজার দেখছিল কেন, এর একটা কৈফিয়ত পাগলের মত খুঁজে বেড়াচ্ছে তার মগজ। 'মিস্টার ওরিগোর অনুমতি নিয়েই এসেছি। তিনি বললেন, বাড়িটা ঘুরে দেখতে পারি আমি। আমার বন্ধুদেরকে ফার্ম দেখাতে নিয়ে গেছেন তিনি। বেরোনোর পথ খুঁজছি এখন আমি।'

'সত্যি মিস্টার ওরিগো তোমাকে অনুমতি দিয়েছেন বাড়ির ভেতরে ঘোরাঘুরি করার জন্যে?' লোকটা জিজ্ঞেস করল। 'হয়তো বাইরের দিকটা দেখতে বলেছেন তিনি।'

'অ্যাঁ!' বোকা হয়ে গেছে যেন কিশোর। 'কি জানি! হয়তো আমিই ভুল শুনেছি। দয়া করে যদি বাইরে বেরোনোর পথটা দেখিয়ে দেন…'

'ওই যে। যাও,' একটা দরজা দেখাল লোকটা, যেটা আগে চোখে পড়েনি কিশোরের।

কোনদিক দিয়ে বেরোতে হয়, খুব ভালমত জানা আছে তার। কিন্তু লোকটা তাকে ওদিকে যেতে বলছে কেন? হতে পারে পাশ দিয়ে সহজ কোন পথ আছে। কিংবা সামনের দরজা দিয়ে ওকে বেরোতে দিতে চায় না।

টান দিয়ে দরজাটা খুলে অন্যপাশে পা রাখল কিশোর।

ঘড় ঘড় করে শব্দ হলো পেছনে। কোন ধরনের মেশিন চালু করে দিল নাকি লোকটা? ফিরে তাকাতে গেল কিশোর। কিন্তু ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যেতে শুরু করেছে ততক্ষণে।

পায়ের নিচে হাঁ হয়ে খুলে গেল মেঝেটা। পড়তে শুরু করল কিশোর। গ্রাস করে নিল তাকে অন্ধকার শূন্যতা।

সাত

শক্ত মেঝেতে পতনের ধাক্কা ক্ষণিকের জন্যে স্তব্ধ করে দিল কিশোরকে। একটা ট্র্যাপডোরের ভেতর দিয়ে পড়েছে সে, বুঝতে পারল। যেখানে এখন সে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে ট্র্যাপডোরটা রয়েছে আট ফুট ওপরে। মসৃণ ভঙ্গিতে বন্ধ হয়ে গেল আবার। তাকে ঘন অন্ধকারে নিক্ষেপ করে।

মাথা নেড়ে মাথার ভেতরটা পরিষ্কারের চেষ্টা করল সে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, লোকটা ওকে এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে দিতে নারাজ। কিন্তু কেন? কি এমন সে দেখে ফেলল যেটা দেখা ওর উচিত ছিল না? প্রহিবিশনের সময়কার বেআইনী মদের ব্যাপারে কোন কিছু? কিন্তু সে-সব কথা ইতিহাস বইতেই লেখা রয়েছে, গোপন কোন বিষয় নয়। পুরানো লেজার নিয়ে এত সাবধানতা কেন লোকটার? কিছুই অনুমান করতে পারল না কিশোর। তবে একটা কথা বোঝা গেল, বৈধ-অবৈধ যে কোন ধরনের ব্যবসার অর্ডারই হোক না কেন, সেটা এখান থেকেই দেয়া হত।

পকেট থেকে ছোট একটা দিয়াশলাইয়ের বাক্স বের করল সে। ট্রেইল ধরে আসার সময় আগুন জ্বালতে ব্যবহার করত। একটা কাঠি জ্বেলে চারপাশটা দেখে নিল। অনেক বড় একটা ঘরের মধ্যে রয়েছে সে। এত অল্প আলো দেয়ালের কাছে পৌঁছল না। অদ্ভুত সব জিনিসের কালচে অবয়ব চোখে পড়ল। কোনটা দেখতে মানুষের মত, কোনটা বড় টেবিল। সবই মোটা কাপড় দিয়ে ঢাকা।

দপ দপ করে নিভে গেল আলোটা। তবে ততক্ষণে হ্যারিকেনটা দেখে ফেলেছে সে। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে বের করে নিল ওটা। নাকের কাছে এনে শুঁকল। ঝাঁকি দিয়ে দেখল। সামান্য তেল অবশিষ্ট আছে মনে হচ্ছে এখনও। আরেকটা কাঠি জ্বেলে বাতিটা ধরিয়ে ফেলল সে।

হ্যারিকেনের আলোয় আগের চেয়ে ভাল দেখতে পাচ্ছে এখন। কিন্তু এখনও বুঝতে পারছে না কালো কালো জিনিসগুলো কি। একটা জিনিসের ওপর থেকে কাপড় তুলে নিল। নিচে একটা স্লট মেশিন। আরেকটা বড় জিনিসের ওপর থেকে কাপড় তুলল। একটা রুলেট টেবিল। আরও কয়েকটা জিনিসের ওপর থেকে কাপড় তুলতেই বেরোল একটা ব্ল্যাকজ্যাক টেবিল এবং আরও দুটো স্লট মেশিন। অন্ধকারে যতদূর চোখ গেল আরও অনেকগুলো কাপড়ে ঢাকা জিনিসের অবয়ব দেখতে

পেল। রুলেট, ব্ল্যাকজ্যাক টেবিল, স্লট মেশিন, এগুলো জুয়া খেলার সরঞ্জাম। তারমানে বিনোদন। কিন্তু কিছুতেই ঘরটাকে শুধু ওরিগোদের বিনোদন কক্ষ বলে মেনে নিতে পারল না সে।

ভাবতেই বুঝে গেল ব্যাপারটা। ক্যাসিনো ছিল এটা। প্রহিবিশন পিরিয়ড শেষ হওয়ার পর এ ভাবেই টাকা কামাত ওরিগো পরিবার। বেআইনী মদের ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাসিনো চালানোর বুদ্ধিটাও নিশ্চয় বুড়ো হিরাম ওরিগোর মগজ থেকেই বেরিয়েছিল। ছুটি কাটানোর জন্যে এখানে এসে উঠত ধনী লোকেরা। ক্যাসিনো ছিল তাদের পকেট খালি করার আরেক বুদ্ধি। মদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেলে এই ক্যাসিনো হয়ে উঠেছিল পরিবারটার টাকা কামানোর প্রধান উপায়। খনির পাথর বহু আগেই ফুরিয়ে গিয়েছিল। আর ফার্মটা তো পুরোপুরিই লোক দেখানো।

কিন্তু ক্যাসিনো বন্ধ করে দেয়া হলো কেন? ইতিহাস কি বলে মনে করার চেষ্টা করল সে। ১৯২০ এবং তারপরে অনেক বছর আমেরিকার অনেক জায়গায় মদের ব্যবসা বেআইনী ঘোষিত হয়েছিল। ক্যাসিনো ব্যবসায় আয়-রোজগার তখন ভালই ছিল। আর এই এলাকায় কোন রকম প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হয়নি ওরিগোকে। চুটিয়ে জুয়া খেলার ব্যবসা চালিয়ে গেছে ওরিগো। যদিও ওটাও ছিল বেআইনী।

১৯৭৮ সালে নিউ জার্সির আইন আটলান্টিক সিটিতে জুয়া খেলার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে বৈধ ঘোষণা করে দিতেই বেআইনী খেলার ঝুঁকির মধ্যে আর থাকল না খেলুড়েরা। সোজা সেদিকে গিয়ে ভিড় জমাতে লাগল ওরা। বনের মধ্যে দুর্গম জায়গায় কষ্ট করে ওরিগোর ক্যাসিনোতে কেউ এল না আর। নিউ জার্সির ক্যাসিনোগুলোতে যাওয়াও সহজ ছিল। অথচ মরগান কোঅরিতে আসার জন্যে বিমান চলাচল পথ দূরে থাক, একটা ভাল মহাসড়কও নেই।

ক্যাসিনো বন্ধ হয়ে যেতেই শহরে লোকের আয়-রোজগারও থমকে গেল। অনেকে নিশ্চয় কাজ করত ক্যাসিনোতে। ওরিগোর আমদানী করা টাকার ভাগ পেত। ক্যাসিনো বন্ধ তো লোকের রোজগারও বন্ধ।

এগুলো সবই বোঝা গেল, কিন্তু শহর থেকে ওদের বেরোতে না দিতে চাওয়ার কারণটা স্পষ্ট হলো না এখনও। ক্যাসিনো এখন অতীত। ও ধরনের কোন বেআইনী ব্যবসা চলছে না এখন শহরে।

নাকি চলছে?

শহরে ঢোকার মুখে সেই দু'জন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যাওয়ার কথাটা মনে পড়ল তার। ব্যাগ ভর্তি টাকা নিয়ে চলেছিল ওরা। ক্যাসিনো থেকে আসেনি ওই টাকা, কোন সন্দেহ নেই তাতে, কারণ ক্যাসিনো ব্যবসা বহু আগে বন্ধ হয়ে গেছে।

তাহলে টাকাটা এল কোত্থেকে?

সেটা নিয়ে পরেও মাথা ঘামানো যাবে, ভাবল সে। আপাতত এখান থেকে বেরোনোর পথ খোঁজা দরকার। হ্যারিকেনের তেল ফুরিয়ে যাবার আগেই। নইলে

কপালে দুঃখ আছে।

ততক্ষণে কিশোরের জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে রবিন। খামার দেখা শেষ করে রিচিকে নিয়ে শহরে ফিরে এসেছে। খামার না কচু! বিরক্তিতে নাক বাঁকাল সে। কিছু নেই। বিরক্তিকর। মাথায় ঢুকল না ওরকম একটা খামারের আয় দিয়ে কি ভাবে চলতে পারে কোন লোক।

তবে মুসা আছে আনন্দেই। এখনও ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে।

রিচি চলে গেল মিসেস হ্যারিয়েটের বাড়িতে মরগান'স কোঅরির ব্যাপারে জ্ঞান আহরণের জন্যে।

রবিন আশা করল, কিশোরকে ম্যানশনের আশেপাশেই কোনখানে পাওয়া যাবে। কিন্তু পেল না। ভাবল কিশোর হয়তো টমকে দেখতে রোজালিনের বাড়িতে চলে গেছে। তাই সে-ও চলে এল ওখানে। কিন্তু আসেনি কিশোর।

মিসেস হ্যারিয়েটের বাড়িতে এসে দ্রুত দুপুরের খাওয়া সেরে নিল রবিন। রিচি চলে গেছে। মিসেস হ্যারিয়েটকে বলে গেছে পুরানো খনিগুলো দেখতে যাচ্ছে সে। তার ধারণা, প্রাগৈতিহাসিক কালের প্রাণী ট্রাইলোবাইটের ফসিল পেয়ে যেতে পারে।

এখানে এসেও কিশোরকে পেল না রবিন।

এর একটাই মানে, এখনও প্রাসাদে রয়ে গেছে কিশোর। এবং অবশ্যই কোন অঘটন ঘটেছে।

বোমারি'স শ্যাকে গিয়ে খোঁজ নেয়ার কথা ভাবল রবিন। রেড ব্রিক হয়তো সাহায্য করতে পারবে তাকে। মেয়েটা মিশুক। অনেক খোঁজ-খবরও রাখে।

দোকানে ঢুকে দেখল কাস্টোমারদের নিয়ে ব্যস্ত রেড। লম্বা দু'জন ছিপছিপে দেহের লোক কথা বলছে তার সঙ্গে। দু'জনেরই বয়েস বিশের কোঠায়, পরনে মলিন জিনসের প্যান্ট, গায়ে টি-শার্ট।

লোকগুলোকে পরিচিত লাগল রবিনের। কোথায় দেখেছে? ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। গতকাল টাকার ব্যাগ বয়ে নিয়ে যেতে দেখেছিল এদেরকেই।

'কি চাই?' জিজ্ঞেস করল একজন।

'সরি,' সৌজন্য দেখিয়ে বলল রবিন, 'আমি বিরক্ত করতে আসিনি আপনাদের।'

উদ্বিগ্ন মনে হলো রেডকে। বলল, 'রবিন, এরা জর্ডান ব্রাদার্স। দুই ভাইই কাজ করে ডজ ওরিগোর খামারে।'

'তাই নাকি? খুশি হলাম,' হাত বাড়িয়ে দিল রবিন।

পাত্তাই দিল না দুই ভাই। হাতটা ধরল না। একজন বলল, 'আমরা খুশি হইনি তোমাকে দেখে। অপরিচিত কাউকে শহরে দেখলে ভাল লাগে না আমাদের।'

'হ্যাঁ। কেউ তোমাদের দাওয়াত করে আনেনি এখানে,' নিতান্ত অভদ্রের মত বলে উঠল দ্বিতীয় জন।

রাগ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল রবিনের মগজে। বলল, 'নেহায়েত ঠেকায় পড়েই এসেছি। নইলে কে আসে এই পচা জায়গায় মরতে।'

'পচা জায়গা!' রেগে উঠল প্রথম জন। 'আমাদের শহরটা পচা জায়গা?'

'বাইরে চলো!' চিৎকার করে উঠল দ্বিতীয় জন। 'তোমাকে একটা শিক্ষা দিয়েই ছাড়ব আজ। দোকানে মারামারি করব না। যাও, রাস্তায় যাও।'

ঘাবড়ে গেল রবিন। কারাতে জানে সে। মারপিটে একদম আনাড়ি নয়। কিন্তু ওই দু'জন লোকের বিরুদ্ধে এঁটে ওঠা তার সাধ্যের বাইরে। ওদের সঙ্গে লাগতে যাওয়ার সামান্যতম ইচ্ছেও তার নেই।

'ধন্যবাদ,' হাত নেড়ে বলল সে, 'বাইরে আমি যাচ্ছি না।'

'কি কাপুরুষরে!' বলল প্রথম জন।

'একেবারে কেঁচো!' বলল দ্বিতীয় ভাই। 'এই ছেলে, মেরুদণ্ড বলে কিছু আছে তোমার?'

'সেটা আপনাদেরকে জানানোর প্রয়োজন মনে করছি না,' রাগ দমন করতে কষ্ট হচ্ছে রবিনের। 'যারা এ ভাবে গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে আসে, তাদের পছন্দ করি না আমি।'

'সে-জন্যেই তো বলছি, বাইরে চলো, ফয়সালা হয়ে যাক। আমরা হারলে মাপ চেয়ে নেব,' বলল প্রথম জন। এগিয়ে আসতে শুরু করল রবিনের দিকে।

কি করবে বুঝতে পারছে না রবিন। সত্যিই মেরুদণ্ডহীন, এটা প্রমাণ করে দিয়ে রেডের সামনে দৌড়ে পালাবে? কিন্তু পালাতে চাইলেও বেরোনোর উপায় নেই। দরজার পথটা আটকে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দ্বিতীয় ভাই। দরজার কাছেই ধরে ফেলে বেদম মার দেবে।

'বেরোও!' কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল দ্বিতীয় জন। তার হাতে ঝিলিক দিয়ে উঠল কিছু।

ফিরে তাকিয়ে দেখল রবিন, লোকটার হাতে ভয়ঙ্কর দর্শন একটা লম্বা ফলাওয়ালা ছুরি।

আট

'না না!' চিৎকার করে উঠল রেড। 'দোহাই আপনাদের, এ সব করবেন না!'

'নিজের চরকায় তেল দাও, খুকি,' বলে দিল প্রথম ভাই। 'এই বিচ্ছুটাকে একটা শিক্ষা দিয়েই ছাড়ব আমরা।'

'অ্যাই,' অন্য ভাইটা বলল রবিনকে, 'যা করতে বলছি করো। বাইরে বেরোও। তারপর দেখব আমরা, সত্যি সত্যি মেরুদণ্ড বলে কিছু আছে নাকি তোমার।'

আর কোন উপায় নেই। দরজার দিকে পিছাতে শুরু করল রবিন। মুক্তির উপায় খুঁজছে। 'দেখুন, অন্যায় ভাবে মারামারিতে যেতে আমাকে বাধ্য করছেন

আপনারা।'

'ওসব বুঝিটুঝি না,' জবাব দিল প্রথম ভাইটা। 'যা করতে চাইছি, করব।'

দরজা খুলে রাস্তায় বেরিয়ে এল রবিন। দৌড় দেয়ার কথা ভাবল। কিন্তু তার আগেই লাফ দিয়ে তার সামনে চলে এল এক ভাই। অন্য জন পেছনে। দৌড় দিতে গেলেই ধরে ফেলবে।

'আগে কার সঙ্গে লড়বে?' জিজ্ঞেস করল দ্বিতীয় জন।

'কার সঙ্গে আবার?' জবাব দিল প্রথম ভাই। 'দু'জনের সঙ্গে একসাথে।'

হাসল দুই নম্বর। 'দারুণ হবে সেটা।' পাশে চলে এল সে।

রবিনের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করল দু'জনে। ছুরি তুলে ধরেছে দ্বিতীয় জন।

মরিয়া হয়ে পালানোর পথ খুঁজল রবিন।

হঠাৎ শোনা গেল ঘোড়ার পায়ের শব্দ। পেছন থেকে।

মুসা!

থামল না সে। সোজা ছুটে এল দুই ভাইয়ের দিকে।

'খবরদার!' চিৎকার করে লাফ দিয়ে সরে গেল দ্বিতীয় ভাইটা।

কাছে চলে এল মুসা। প্রথম জন কিছু করার আগেই হাত বাড়িয়ে ঘোড়ার জিনের পেছনটা ধরে ফেলল রবিন। ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াতে লাগল। হাত বাড়িয়ে দিল মুসা। হ্যাঁচকা টানে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিল রবিনকে।

পেছন পেছন খানিক দূর দৌড়ে এল দুই ভাই। ব্ল্যাক ক্যাটের সঙ্গে পারবে না বুঝে অবশেষে ক্ষান্ত দিল।

মোড় ঘুরে এল মুসা। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না জর্ডান ভাইদের।

'উফ্, একেবারে সময় মত হাজির হয়ে গেছিলে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রবিন। 'মেরেই ফেলত ওরা আজ আমাকে।'

'হ্যাঁ,' মুসা বলল। 'লোকগুলোর ভাবভঙ্গি ভাল লাগেনি আমারও।'

'র‍্যাটলস্নেকের চেয়ে পাজি। তা-ও তো র‍্যাটলস্নেক আত্মরক্ষার তাগিদে ছোবল দেয়।'

'কিশোর কোথায়?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'জানি না। প্রাসাদের চারপাশ ঘুরে দেখার কথা বলে গিয়েছিল আমাকে।'

'তাহলে ওখানেই দেখা দরকার।'

'ওখানে না পেয়েই তো রেডদের দোকানে গিয়েছিলাম খোঁজ নিতে।'

'রেডের সঙ্গে কথা বলার এটাই সুযোগ,' মুসা বলল।

বোমিনা'স শ্যাকের পেছনের দরজা দিয়ে বেরোতে দেখা গেল রেডকে। রবিনকে দেখে অবাক। 'তুমি এখানে! আমি তো আরও সাহায্য করার লোক আনতে যাচ্ছিলাম।'

'অনেক ধন্যবাদ,' ঘোড়া থেকে নামল রবিন। 'ওই দুই ভাই কি সবার সঙ্গেই এমন ব্যবহার করে নাকি?'

'জর্ডানরা শক্ত লোক, সন্দেহ নেই,' জবাব দিল রেড। 'যে ধরনের কাজ করে, তাতে শক্ত হওয়াটা স্বাভাবিক। ওরিগোর পুরো খামার দেখাশোনার ভার

ওদের ওপর। অতিরিক্ত খাটনি দিতে হয়। তাই মেজাজ খারাপ থাকে।'

'তার জন্যে কি যাকে দেখবে তাকেই ছুরির ভয় দেখাতে হবে?'

'উঁহু,' মাথা নাড়ল রেড। 'এ রকম তো ওরা করে না। মাঝেসাঝে ঝগড়া যে বাধায় না তা নয়–সে তো সবাই বাধায়; কিন্তু ছুরি বের করতে এই প্রথম দেখলাম।'

'তারমানে, বোঝা যাচ্ছে এই "শক্ত" ভদ্রলোকেরা বড় ধরনের কোন অঘটন ঘটিয়ে বসে আছেন,' মাথা দোলাল রবিন। 'ওদের ছেড়ে রাখা বিপজ্জনক। শীঘ্রি জেলে পাঠানোর ব্যবস্থা করা দরকার।' প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলল, 'রেড, কিশোরকে পাওয়া যাচ্ছে না। আমার আশঙ্কা, কোন কিছু হয়েছে ওর। শেষবার ওকে দেখেছি ওরিগো ম্যানশনের কাছে।'

কালো হয়ে গেল রেডের চেহারা। 'ভাল খবর শোনালে না। ওর...' বলতে গিয়ে থেমে গেল সে। বলাটা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছে না হয়তো।

'থেমে গেলে কেন? বলো?' রবিন বলল, 'রেড, শোনো, কিশোরকে খুঁজে আনতে সাহায্য হতে পারে এমন কিছু যদি জানা থাকে তোমার, বলে ফেলো। আমাদের উপকার হবে।'

'প্রাসাদের পুব পাশে একটা ঢোকার পথ আছে, মাটির নিচের ঘর দিয়ে। এই যে, চাবি,' জিনসের প্যান্টের পকেট থেকে ছোট একটা চাবি বের করে দিল রেড।

'তুমি পেলে কোথায়?' জানতে চাইল রবিন।

'ওরিগোর বাড়িতে মাঝে মাঝে জিনিসপত্র দিয়ে আসতে হয় আমাকে। চাবিটা কে দিয়েছে, ওকে বোলো না কিন্তু।'

'প্রশ্নই ওঠে না। আবারও অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, রেড।'

'এসো,' ডাক দিল মুসা। 'ঘোড়ায় চড়েই যাই। তাতে সময় কম লাগবে।'

ওরিগো ম্যানশনে যাওয়ার সহজ পথটাই ধরল মুসা। তবে বাড়ির কাছে এসে পাশের বনটাতে ঢুকে পড়ল, যাতে এগোনোর সময় সামনের জানালা দিয়ে কেউ দেখে না ফেলে।

'আমি আসব?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'একসঙ্গে বিপদে পড়ে লাভ নেই,' রবিন বলল। 'আমি আগে দেখে আসিগে।'

'ঠিক আছে। আমি বরং ঘোড়াটাকে গোলাঘরের সামনে রেখে আসি।' ঘোড়ার পিঠে চাপড় দিয়ে বলল মুসা, 'চল, ব্ল্যাকি, বাড়ি চল।'

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে রওনা হয়ে গেল মুসা।

রবিন এগিয়ে চলল বনের ভেতর দিয়ে। একশো ফুট দূরে ওরিগোর প্রাসাদ। বনের ভেতর দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল সে।

রেড যে দরজাটার কথা বলেছিল, সেটা নজরে পড়তে দেরি হলো না। পুরানো আমলের সেলার। কাঠের তৈরি দরজা। মাটিতে বসিয়ে সেটাকে ঘিরে দিয়েছে রোদে শুকানো ইঁট দিয়ে। মাটির নিচের ঘরে নামা যায় এটা দিয়ে। দরজায় লাগানো আঙটাগুলো মরচে পড়া, কিন্তু তালাটা নতুন।

মুখ তুলে জানালার দিকে তাকাল রবিন। কেউ দেখছে কিনা দেখল। তারপর

এক দৌড়ে দরজার কাছে এসে চাবি ঢুকিয়ে দিল তালায়।

তালা খোলাটা তত কঠিন হলো না, যতটা হলো দরজা খোলা। মরচে পড়ে থাকা কব্জার কারণে পাল্লা খুলতে প্রচুর শক্তি খরচ করতে হলো ওকে। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে নাড়া লেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল ধুলোর মেঘ। নিচে তাকিয়ে কালো একটা গর্ত ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। দিনের আলো ঢুকতে পারছে না তেমন।

সাবধানে ভেতরে পা রাখল সে। সিঁড়ির ধাপগুলো পাথরে তৈরি। নামতে শুরু করল ধীরে ধীরে। পিছলে পড়ার আশঙ্কায় অস্থির।

সাত ফুট মত নেমে পা রাখল মেঝেতে। অন্ধকার ঘর। ইলেকট্রিক বাল্ব আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। সুইচবোর্ড কোনখানে, তা-ও জানা নেই। ঘরটা এতই অন্ধকার, ওপর থেকে দরজার ফোকর দিয়ে আসা সামান্য আলো কোন সহায়তাই করতে পারল না।

হাত ছড়াতেই হাতে ঠেকল পাথরের দেয়াল। যাক, এটাই তাহলে প্রাসাদের মাটির নিচের ঘর। কি থাকতে পারে এখানে?

আচমকা তার কাঁধ খামচে ধরল কঠিন একটা হাত। 'খবরদার! নড়লেই মরবে!'

নয়

পরিচিত কণ্ঠ। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল রবিন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কিশোর।

'বাপরে! জান উড়িয়ে দিয়েছিলে,' কিশোর বলল।

'আমি তোমার জান উড়ালাম! পেছন থেকে অন্ধকারে কারও কাঁধ খামচে ধরলে তার অবস্থা কি হয় কল্পনা করেছ?'

'সরি।'

'কিন্তু তুমি এখানে নামলে কি করে?' রবিনের প্রশ্ন। 'সারা শহর তোমাকে খুঁজে বেড়ালাম।'

'সে অনেক কথা।'

'বলে ফেলো। অদ্ভুত কিছু ঘটছে এ-শহরে বলেছিলে যে, সেটাই কি ঠিক হলো?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল কিশোর। 'বেশ কিছু তথ্যও আমি জেনে গেছি এখন।' হাতে ধরে রেখেছে এখনও হ্যারিকেনটা। ধরাল আবার। 'চলো, চট করে দেখিয়ে

নিয়ে আসি এক পলক।'

'কি দেখাবে? মিউজিয়াম-টিউজিয়াম নাকি?'

'তা বলতে পারো। অপরাধীদের মিউজিয়াম।'

'বলো কি!'

স্লট মেশিন আর জুয়ার টেবিলগুলোর কাছে রবিনকে নিয়ে এল কিশোর। 'দেখো, সহ্য করতে পারো নাকি।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল রবিনের। 'আরে এ তো লাস ভেগাস শহরের মত লাগছে! কিন্তু এ সব এখানে কেন? এই এলাকায় ক্যাসিনো এখনও নিষিদ্ধ। আর যতদূর জানি, চিরকালই ছিল।'

ওপরতলায় বই পড়ে কি কি জেনেছে, জানাল কিশোর। তার নিজের ধারণার কথাও বলল।

'এই কাণ্ড!' হাসল রবিন। 'ওরিগোকে চাষী অবশ্য কখনোই মনে হয়নি আমার।'

চালাকি করে ঘোড়ার পিঠে তুলে দিয়ে আরেকটু হলেই যে মুসাকে খুন করে ফেলেছিল ওরিগো, কিশোরকে জানাল রবিন।

'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'তারমানে শহরের কিছু লোক আমাদের খুন করতে চাইছে!'

'কেন বলো তো?'

'নিশ্চয় অবৈধ কোন কাজ-কারবার করছে ওরা। ওদের ধারণা, আমরা অনেক কিছু জেনে ফেলেছি।'

'কিন্তু কি জেনেছি আমরা?' হ্যারিকেনের আলোয় ঝিলিক দিয়ে উঠল রবিনের চোখ। 'ওই টাকার ব্যাগটা দেখে ফেলেছিলাম যে, তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তো?'

'মনে হয় আছে,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'ওটা দেখে ফেলা উচিত হয়নি আমাদের। সে-কারণেই শহর থেকে বেরোতে দিতে চায় না। গিয়ে কাউকে বলে দিতে পারি এই ভয়ে। তারমানে টাকাগুলো অবৈধ উপায়ে হাতানো হয়েছে।'

'কে আমাদের মৃত্যু চাইছে?'

'ডজ ওরিগোর কথা ভাবা যেতে পারে।'

'হুঁ। জর্ডান ব্রাদাররাও রয়েছে এতে।'

'জর্ডান ব্রাদার্স?'

'যারা টাকার ব্যাগটা বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল,' জানাল রবিন। 'কয়েক মিনিট আগে বিচ্ছিরি একটা কাণ্ড ঘটে গেছে। ছুরি নিয়ে খুন করতে এসেছিল আমাকে।

সময়মত মুসা হাজির হয়ে যাওয়াতে বাঁচলাম। ওরা ওরিগোর ফার্মেই কাজ করে। তার অবৈধ কাজের সহকারী হতে বাধা নেই।'

'ওরিগোর চাকরটাও কম যায় না,' কিশোর বলল।

'চাকর? পুরানো উপন্যাসগুলোতে যেমন থাকত?'

ওপরে ক্যাঁচকোঁচ শব্দ হলো। যে ট্রাপডোর দিয়ে ফেলে দেয়া হয়েছে কিশোরকে, সেটা খুলল মনে হলো। আলো এসে পড়ল নিচে। ফোকর দিয়ে মই

নামিয়ে দিল দুটো হাত।

'ওই যে লোকটা,' ফিসফিস করে বলল কিশোর।

'সরে যাওয়া উচিত!'

'এই, কার সঙ্গে কথা বলছ?' ওপর থেকে চিৎকার করে জানতে চাইল লোকটা। 'মিস্টার ওরিগো তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান। নিচে কেউ থেকে থাকলে তাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে এসো, ভাল চাও তো।'

সোজা সিঁড়ির দিকে রওনা দিল দু'জনে, যেটা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যায়। আগে আগে গেল রবিন। ফিরে তাকাল কিশোর। ওপর থেকে নেমে পড়েছে লোকটা। কাঁধে ঝোলানো রাইফেল।

'জলদি ওঠো!' রবিনকে তাগাদা দিল কিশোর। 'একটা খেপা লোকের পাল্লায় পড়েছি আমরা। রাইফেল নিয়ে এসেছে।'

বাইরে বেরিয়ে গেল রবিন।

কিশোর বেরিয়েই জিজ্ঞেস করল, 'কোন্ দিকে যাওয়া যায়, বলো তো?'

'যেদিকেই যাই, এ মুহূর্তে শহরে যাওয়া বোধহয় ঠিক হবে না।' দরজাটা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিল রবিন।

কয়েক সেকেন্ড পরেই দরজায় থাবা পড়তে শুরু করল। বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে মনে হচ্ছে লোকটা।

'গোলাঘরের দিকে গেলে কেমন হয়?' কিশোর বলল।

'যেতে হবে ওদিকেই। মুসার ঘোড়াটায় চড়ে পালানো যাবে হয়তো।'

গোলাঘরের দিকে ছুটল দু'জনে। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে দ্রুত নেমে চলল। প্রাসাদের ভেতরে নানা রকম শব্দ কানে আসছে। গোলাঘরের কাছে প্রায় চলে এসেছে, এই সময় ঝটকা দিয়ে খুলে গেল সামনের দরজা। হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল ডন ওরিগো আর তার চাকর। দু'জনের হাতেই রাইফেল।

সামান্য ফাঁক হয়ে আছে গোলাঘরের দরজা। তাতে ঢুকে পড়ল দু'জনে। চারপাশে তাকাল। ঘোড়াটা নেই। তবে অনেক বড় দুটো খড়ের গাদা আছে।

'ওরিগো কি খালি খড়ই জন্মায় নাকি?' অবাক হয়ে বলল রবিন। 'এত বড় গাদা দিয়ে কি করে?'

'জলদি! ঢুকে পড়ো ওগুলোর মধ্যে।'

অস্বস্তি ভরা চোখে গাদা দুটোর দিকে তাকাল রবিন। 'ট্রেইলে আসতে রাতে যেগুলোতে ঘুমিয়েছিলাম, তারচেয়ে অনেক খারাপ এগুলো।'

'ভালমন্দ বিচারের সময় নেই এখন। গুলি খেয়ে মরার চেয়ে তো ভাল।' একটা গাদার দিকে রবিনকে ঠেলে দিল কিশোর।

শুকনো, খসখসে, ব্রাশের মত খাড়া হয়ে থাকা খড়ের ধারাল মাথাগুলোকে অগ্রাহ্য করে ঠেলেঠুলে তার মধ্যে ঢুকে পড়ল দু'জনে। একেবারে অদৃশ্য হয়ে যেতে চাইছে। শ্বাস নিতে পারে যাতে, সেটুকু ফাঁক থাকাও দরকার।

দরজার দিক থেকে কথা শোনা গেল। 'ওর ভেতরেই আছে,' চাকরটা বলছে। 'এদিকেই তো আসতে দেখলাম বলে মনে হলো।'

'কি দেখেছ তুমি, মর্টিকো, তুমিই জানো!' অনিশ্চিত শোনাল ওরিগোর কণ্ঠ।

আমার ধারণা মাঠের দিকে চলে গেছে ওরা। আমি ওদিকেই যাচ্ছি। তুমি এদিকটায় দেখো। প্রয়োজনে খড় খোঁচানোর কাঁটাটা ব্যবহার করতে পারো। না পেলে চলে এসো আমি যেদিকে যাচ্ছি সেদিকে।'

'আর যদি পাই?'

'কি করতে হবে জানা আছে তোমার।'

দ্রুত সরে গেল ওরিগোর পদশব্দ।

ক্যাচকোঁচ শব্দ করে পুরো খুলে গেল গোলাঘরের দরজা। ওদের কথাবার্তা থেকে বোঝা গেল, চাকরটার নাম মর্টিকো। ঘরে ঢুকল সে। শুকনো খড়ে তার হাঁটাচলার শব্দ থেকেই বোঝা যাচ্ছে কোন্‌দিকে যাচ্ছে সে।

খড় খোঁচানোর কাঁটাটার চেহারা ভেসে উঠল কিশোরের চোখের সামনে। গায়ে কাঁটা দিল তার। নিশ্চয় ওটা দিয়ে খড়ের গাদায় খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দেখবে মর্টিকো, কেউ লুকিয়ে আছে কিনা। মারাত্মক জিনিস। পেটে-পিঠে বেকায়দা জায়গায় খোঁচা লাগলে নির্ঘাত মরণ।

মেঝেতে ধাতব জিনিসের ঘষা লাগার শব্দ হলো। বোঝা যাচ্ছে কাঁটাটা তুলে নিচ্ছে মর্টিকো। শুকনো খড়ে খোঁচা মারার শব্দ হলো। তারমানে খড়ের গাদায় খোঁচানো শুরু করে দিয়েছে সে। ওরা যেটাতে লুকিয়ে আছে সেটাতে নয়। তবে তাতে স্বস্তি পাওয়ার কিছু নেই। ওটা খোঁচানো শেষ করে ওদেরটাও খোঁচাবে না, এমন কোন নিশ্চয়তা নেই।

কয়েক সেকেন্ড বিরতি দিয়ে আবার শোনা গেল খোঁচাখুঁচির শব্দ। এবার আরও কাছে। কিশোর যেখানে লুকিয়ে আছে, তার কাছে। দম বন্ধ করে পাথর হয়ে পড়ে রইল সে। ঘ্যাচাং করে এসে কাঁটাটা ঢুকল তার দুই পায়ের ফাঁকে। আপনাআপনি চিৎকার বেরিয়ে যাচ্ছিল মুখ থেকে। মনের সমস্ত জোর একত্রিত করে সেটা ঠেকাল সে।

আবার খোঁচা। এবার লাগল ডান বাহুর ইঞ্চিখানেক তফাতে। আর যদি সামান্য সরিয়ে মারত মর্টিকো, তাহলেই খেলাটা খতম হয়ে গিয়েছিল।

পরের খোঁচাটা সরে গেল বেশ খানিকটা। হাল ছাড়তে রাজি নয় মর্টিকো। খুঁচিয়েই চলল। তবে সরে যাচ্ছে ক্রমেই। কিন্তু স্বস্তি পাচ্ছে না কিশোর। তার বিপদ কেটেছে বটে, রবিনের জন্যে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে এখন।

জোরে আরেকবার খোঁচানোর শব্দ হলো। কিন্তু লাগল শুধু খড়ের মধ্যেই।

আবার খোঁচা। এবার খড়ের সঙ্গে ভিন্ন আরেকটা শব্দ কানে এল। না, মাংসে প্রবেশের নয়। ধাতব কিছুতে লাগল বলে মনে হলো।

খড়ের গাদায় ধাতব কি জিনিস থাকতে পারে?

শব্দটা মর্টিকোকেও চমকে দিল মনে হলো। তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে কাঁটাটা রেখে দিল আগের জায়গায়। আস্তাবলের দরজা খোলার শব্দ হলো এরপর। খানিকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করল ওখানেও। বাইরের দরজা খোলার শব্দ হলো। বেরিয়ে গেল মনে হলো।

বেরিয়ে আসতে আরও মিনিটখানেক দেরি করল কিশোর। সাবধান থাকা ভাল। আস্তে করে মাথা বের করে উঁকি দিল সে।

মর্টিকোকে দেখা যাচ্ছে না।

'বেরোনো যায় এখন,' নিচু স্বরে বলল কিশোর। 'রবিন, কি অবস্থা তোমার?'

'ভাল,' জবাব দিল রবিন। 'তবে কাঁটাটা জান উড়িয়ে দিয়েছিল আমার, রাইফেলের চেয়ে কম ভয় পাইনি ওটাকে।'

হামাগুড়ি দিয়ে খড়ের গাদা থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। মর্টিকোর সাড়াশব্দ নেই। আস্তাবলে ঘাপটি মেরে না থাকলে ধরে নিতে হবে চলে গেছে।

বেরিয়ে আসতে গেল রবিন। কিসে যেন বাড়ি লাগল।

'উফ্!' করে উঠল সে। ব্যথায় কুঁচকে গেল মুখ।

'আস্তে!' তাড়াতাড়ি সাবধান করল কিশোর। 'শুনে ফেলবে তো!'

'বাড়ি খেলাম মাথায়!' কণ্ঠস্বর নামিয়ে রাখার চেষ্টা করল রবিন। 'ভীষণ ব্যথা করছে।'

'তারমানে যে জিনিসটাতে ঠোকর লাগার আওয়াজ শুনেছিলাম, সেটাতেই বাড়ি খেয়েছ। ধাতব কিছু?'

'কি জানি! ব্যথার চোটেই অস্থির, দেখব আর কখন?'

উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল ওকে কিশোর। তারপর খুঁড়তে শুরু করল খড়ের গাদার মধ্যে।

'কি খুঁজছ?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'খড়ের গাদায় সুচ?'

'সুচ না হোক, অন্য কিছু আছে এই গাদার নিচে,' কিশোর বলল।

'কি আর থাকবে? আঠারোশো অষ্টাশী সালে বানানো লাঙলের ফলাটলা হবে।' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল বটে, কিন্তু নিজেও খুঁড়তে শুরু করল রবিন।

বিশাল একটা জিনিস রয়েছে খড়ের গাদায়। লাঙলের চেয়ে অনেক বড়। ধাতব জিনিস। সদ্য রঙ করা।

'এ তো মোটেও অষ্টাশী সালের নয়!' বলল বিমূঢ় রবিন। 'আনকোরা নতুন। এ শহরের সব কিছুর চেয়ে নতুন।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'ট্রাক। কিন্তু খড়ের গাদায় ট্রাক লুকানো কেন?'

'গ্যারেজ ভাড়া করার পয়সা নেই হয়তো,' রসিকতা করল রবিন।

ট্রাকের গা থেকে খড় সরিয়ে ফেলে ভাল করে দেখার জন্যে পিছিয়ে দাঁড়াল কিশোর।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার নিজের অজান্তেই। বিড়বিড় করে বলল, 'মনে হয় রহস্যের জবাবটা এখানেই লুকানো রয়েছে।'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'হ্যাঁ। এখন জানা গেল ডজ ওরিগো আর তার দোস্তরা কি জিনিস লুকিয়েছে।'

ট্রাকটা ছোট। ড্রাইভার সহ দু'জন লোক বসার মত করে তৈরি। পেছনের চারকোনা বক্সটার গায়ে লাল কালি দিয়ে লেখা: হেরিং'স আর্মার্ড ট্রান্সপোর্ট।

'টাকা আন-নেয়ার জন্যে এ ধরনের গাড়ি ব্যবহার করে থাকে ব্যাংক,' রবিন বলল।

'দেখা যাক, ভেতরে কি আছে।'

পেছনের দরজাটার কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। তালা নেই। খিল খুলে টান

দিয়ে দরজাটা খুলল সে। ঘরের আবছা আলোতেও ভেতরে কি আছে দেখতে অসুবিধে হলো না। বড় বড় কাপড়ের ব্যাগ। রাস্তায় যেটা খুলে পড়ে যেতে দেখেছিল সেদিন, সে-রকম। ব্যাগগুলোতে কি আছে বোঝার জন্যে খোলার প্রয়োজন পড়ল না। একশো ডলারের নোটের বান্ডিল।

'ট্রাকটা টাকায় ভর্তি!' বিশ্বাস করতে পারছে না রবিন।

'হ্যাঁ,' ধীরে ধীরে মাথা নাড়াল কিশোর। 'লাখ লাখ ডলার!'

দশ

'কোনখান থেকে এল এত টাকা?' রবিনের প্রশ্ন। 'লাখ লাখ ডলার নিশ্চয় আকাশ থেকে পড়েনি।'

'ট্রাকও আকাশ থেকে পড়ে না।' নিচের ঠোঁটে ঘন ঘন দু'তিন বার চিমটি কাটল কিশোর। কি যেন মনে করার চেষ্টা করছে। উজ্জ্বল হয়ে উঠল চোখ। 'রবিন, কয়েক মাস আগের কোল্ড রিজের ডাকাতিটার কথা পড়েছিলে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ!' রবিনও উত্তেজিত হয়ে উঠল। 'ট্রাক ভর্তি টাকা উধাও হয়ে গিয়েছিল রহস্যময় ভাবে। পুলিশ কোন কিনারাই করতে পারেনি।'

'তারমানে আমরা করে ফেলেছি,' কিশোর বলল। 'আমার বিশ্বাস সেই ট্রাকটাই দেখতে পাচ্ছি আমরা এখন।'

'কিন্তু কোল্ড রিজ তো এখান থেকে অনেক দূর,' রবিন বলল। 'একশো মাইলের কম হবে না।'

'হ্যাঁ, তাতে কি? অপরাধের জায়গা থেকে বহুদূরে সরে যাবে অপরাধী, এটাই তো বুদ্ধিমানের কাজ। এমন জায়গায় এনে লুকিয়েছে, যেখানে দেখার কথা মাথায়ই আসবে না কারও।'

'দেখতও না, যদি না ভাগ্যক্রমে এ শহরে এসে পড়তাম আমরা,' রবিন বলল। 'ওরা ভাবতেই পারেনি বাইরের লোক ঢুকে পড়বে এখানে।'

'আর সে-জন্যেই বাইরের লোকগুলোকে পছন্দ করতে পারছে না ওরা। আমাদের পেছনে লাগার এটাই কারণ।'

'কাউকে জানানো দরকার,' রবিন বলল।

'কাকে জানাবে? আমার তো ধারণা, শেরিফও এই ডাকাতির সঙ্গে জড়িত।'

'রেডকে জানাতে পারি। ও নিশ্চয় জড়িত নয়।'

'না, তা নয়। কিন্তু ও আমাদের কি সাহায্য করবে? মাঝখান থেকে জানিয়ে দিয়ে বিপদের মধ্যে ঠেলে দেব ওকেও।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'ভাল বিপদেই পড়েছি মনে হচ্ছে। তুমি, আমি, মুসা, রিচি–এমনকি টমও এর বাইরে নয়।'

'টমের কিছু হবে না। রোজালিনের কাছে সে ভালই থাকবে।'

'তা ঠিক। রোজালিনকে দুর্বল ভাবার কোন কারণ নেই। কিন্তু দলবল নিয়ে ওরিগো এসে হামলা চালালে কিছুই করার থাকবে না তার।'

'ওসব পরেও ভাবা যাবে,' কিশোর বলল। 'আপাতত এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া দরকার। ওরিগো নিশ্চয় খেতের ওদিকটায় খুঁজে বেড়াচ্ছে আমাদের। শহরে গিয়ে লোকের সামনে আমাদের খুন করার সাহস নিশ্চয় হবে না ওর।'

'সেটা কেবল আশা করতে পারি আমরা।'

গোলাঘরের দরজার সামনে এসে বাইরে উঁকি দিল ওরা। মটিকো কিংবা ওরিগো, কাউকেই দেখা গেল না। আস্তে করে বেরিয়ে এসে ফার্মটাকে ঘিরে রাখা কাঠের বেড়ার দিকে রওনা হলো ওরা। বেড়া ডিঙানো কঠিন হলো না। কিন্তু ওপাশে ঘন ঝোপঝাড়। ওগুলো পেরোতে গলদঘর্ম হতে লাগল। পুরো পনেরো মিনিট লেগে গেল।

মেইন স্ট্রীট ধরে হাঁটার সময়ও সতর্কতার অবসান হলো না। ওরিগো ম্যানশন থেকে কেউ নজর রেখেছে কিনা কে জানে। রিচিকে দৌড়ে আসতে দেখে অবাক হলো। চোখেমুখে ভয়ের ছাপ।

'জলদি এসো!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে। 'সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে গেছে!'

ভীষণ উত্তেজিত হয়ে আছে রিচি। তার পেছন পেছন রোজালিনের বাড়ির দিকে ছুটল কিশোর আর রবিন।

সামনের দরজা হাঁ হয়ে খোলা। দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন মিসেস হ্যারিয়েট। ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবেন।

ধড়াস করে উঠল কিশোরের বুক। রিচির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'টম কেমন আছে?'

'ওটাই তো কথা,' জবাব দিল রিচি। 'টম ঘরে নেই।'

'কোথায় গেছে?' জানতে চাইল রবিন। 'রোজালিন কোথায়?'

'সে-ও নেই। মিসেস হ্যারিয়েটের কাছে জানলাম, দু'জন বিশালদেহী লোক এসে–আমার ধারণা সেই দু'জন, যাদেরকে টাকার ব্যাগ ফেলে দিতে দেখেছিলাম–ধরে নিয়ে গেছে টম আর রোজালিনকে। পিস্তল দেখিয়ে।'

'ভয়ানক ব্যাপার!' দরজা থেকেই চিৎকার করে উঠলেন মিসেস হ্যারিয়েট। 'এ রকম কাণ্ড জীবনে দেখিনি!'

'জর্ডান ব্রাদার্স!' রবিনের দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর। 'দু'জনকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে।'

'কিন্তু টমকে নিল কি করে?' রবিনের প্রশ্ন। 'সে তো হাঁটতেই পারে না।'

'ক্রাচে ভর দিইয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে গেছে,' মিসেস হ্যারিয়েট বললেন।

'ক্রাচ পেল কোথায়?'

'নিশ্চয় রোজালিনের ঘরে ছিল। ডাক্তারি যখন করে, ক্রাচও রেখেছিল নিশ্চয়।'

'কোথায় নিয়ে গেছে, জানেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'উঁহু,' মাথা নাড়লেন মিসেস হ্যারিয়েট। 'কোথায় নিয়ে গেছে দেখিনি। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না।' তাঁর চেহারা দেখে এখনও মনে হচ্ছে বেহুঁশ হয়ে পড়ে

যাবেন।

'একটাই কাজ করার আছে এখন,' কিশোর বলল।

'রেডের সঙ্গে কথা বলবে তো?' ভুরু নাচাল রবিন। 'এমন কিছু জানে ও, যেটা সেদিন বলতে চায়নি।'

রাস্তা পেরিয়ে বোমিনা'স শ্যাকের দিকে এগোল তিনজনে। দরজায় তালা দেয়া। পাঁচ বার নক করার পর জানালা দিয়ে উঁকি দিল কিশোর।

'বাড়ি চলে গেছে মনে হয়। কাছেই তো থাকে বলল।'

'হ্যাঁ,' হাত তুলে দেখাল রবিন। 'ওই যে, ওটাই সম্ভবত ওদের বাড়ি।'

রাস্তার ধারের গোটা দুই বাড়ি পেরিয়ে একটা পুরানো বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। সামনে পুরানো আমলের উঁচু বারান্দা। ডাকবাক্সে নাম লেখা 'ব্রিক'।

দরজায় টোকা দিল কিশোর।

খানিক পরে দরজা খুলে দিল রেড। মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে ভয় পেয়েছে কোন কারণে।

'তোমাদের সঙ্গে কোন কথা বলতে পারব না,' দরজা লাগিয়ে দিতে গেল সে।

'কিন্তু আমাদের যে বলতেই হবে,' দরজাটা আটকে ফেলল কিশোর। 'ওরিগো আর তার দুই কর্মচারী একটু আগে আমাদের খুন করার চেষ্টা করেছিল। টম আর রোজালিনকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে।'

হতাশায় চোখ বন্ধ করে ফেলল রেড। 'ঠিক এই ভয়টাই করছিলাম আমি। তোমাদের বাঁচাতে চেয়েছিলাম।'

'কিন্তু এখন আর সে-সব ভেবে কোন লাভ নেই,' রবিন বলল। 'বিপদে আমরা পড়েই গেছি।'

'কে, রেড?' লিভিং রুম থেকে ডেকে জানতে চাইল একটা কণ্ঠ।

রেডের পেছনে এসে দাঁড়ালেন মাঝবয়েসী একজন ভদ্রলোক। পেশী দেখে বোঝা যায়, যথেষ্ট শক্তি ধরেন শরীরে।

'না, কিছু না, বাবা,' রেড বলল। 'তুমি তোমার টিভি দেখোগে।'

'মিস্টার ব্রিক,' কিশোর বলল, 'আমরা আসলে আপনার সঙ্গেও কথা বলতে চাই।'

সন্দেহ দেখা দিল রেডের বাবার চোখে। 'কে তোমরা?'

'হাইকার, মিস্টার ব্রিক। পর্বতে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। পথে আমাদের বন্ধুর পা ভেঙে যায়।'

কি ভাবে রোজালিনের বাড়িতে এনে তোলা হয়েছে টমকে, সব জানাল কিশোর।

'রোজালিন খুব ভাল মানুষ,' মিস্টার ব্রিক বললেন। 'সে তোমাদের বন্ধুকে জায়গা দিয়ে থাকলে আর কোন চিন্তা নেই।'

'কিন্তু একটা অঘটন ঘটে গেছে, মিস্টার ব্রিক। টম আর রোজালিন, দু'জনকেই কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে।'

'কিডন্যাপ?' তীক্ষ্ণ হয়ে গেল মিস্টার ব্রিকের কণ্ঠ।

'আমরা সন্দেহ করছি ওরিগো ম্যানশনের কর্মচারী দুই জর্ডান ভাইকে।'

'ওই লোকগুলোকে কখনোই আমার ভাল লাগেনি,' মিস্টার ব্রিক বললেন। 'ভাল লোক নয়ও ওরা। ওরিগো ম্যানশনে যাদের বাস, এই জর্ডানগুলো ঠিক তাদের মত।'

'ক্যাসিনো চালাতে এ ধরনের সহকারীই দরকার হয়, তাই না?' কিশোরের প্রশ্ন।

সাদা হয়ে গেল মিস্টার ব্রিকের মুখ। 'তুমি জানলে কি করে?'

'দেখে এলাম জিনিসগুলো। মাকড়সার জাল আর ধুলোর আস্তরে ঢাকা।'

'আমি যখন ওখানে কাজ করতাম, বয়েস তখন একেবারেই কম ছিল। আমি ছিলাম ব্ল্যাকজ্যাক ডিলার। ডজ ছিল পিট বস। ওর বাবার ছিল ব্যবসাটা। কিন্তু অবৈধ ওসব কাজ-কারবার আমার ভাল লাগেনি। তাই চাকরিই ছেড়ে দিলাম।'

'তারমানে এই কিডন্যাপিঙের পেছনে ডজ ওরিগোরও হাত আছে,' রবিন বলল।

অবাক মনে হলো মিস্টার ব্রিককে। 'ডজ? দুধে ধোয়া সে কখনোই ছিল না, কিন্তু কিডন্যাপিঙের মত জঘন্য অপরাধ করে বসবে, এটাও বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'আরেকটু হলে খুনই করে ফেলেছিল আমাদের,' কিশোর বলল। 'অনেক কষ্টে বেঁচেছি।'

'বলো কি! এ তো অসম্ভব!'

'অসম্ভব আর নয় এখন, বাবা,' রেড বলল। 'দোকানে বসে অনেক কথা কানে আসে আমার, যেগুলো তুমি জানো না।'

'কি কথা?'

'ব্যাংক ডাকাতির কথাই ধরা যাক,' ফস্ করে বলে বসল রবিন।

'রবিন ঠিকই বলেছে, বাবা,' মুখ আর বন্ধ রাখল না রেড। 'মাসখানেক আগে ট্রাক ভর্তি টাকা নিয়ে এসেছে ওরা। ওই টাকা পাঁচ মাস আগে উধাও হয়ে গিয়েছিল কোল্ড রিজ থেকে। আমি শুনেছি, জর্ডানদের এক ভাইয়ের সঙ্গে ব্যাংকের এক গার্ডের দোস্তী আছে। সেই লোকটার সহায়তায়ই ডাকাতিটা করেছে। ওরিগোদের গোলাঘরে লুকিয়ে রেখেছে ট্রাকটা।'

'আগে বলিসনি কেন আমাকে?' ভুরু কুঁচকে গেছে মিস্টার ব্রিকের।

'তোমাকে ঝামেলায় ফেলতে চাইনি,' রেড বলল। 'ডজ তোমার পুরানো বন্ধু।... হয়তো বলবে, সেটা তো অনেক আগের কথা, এখন আর বন্ধুত্ব নেই...। সেজন্যেই বেশি বিপজ্জনক। কোন কিছু করতেই হাত কাঁপবে না তার।'

'কোন সন্দেহ নেই তাতে,' রবিন বলল। 'আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে এ ব্যাপারে। রাইফেল নিয়ে তেড়ে এসেছিল আমাদেরকে মারার জন্যে ওরিগো আর তার চাকর মর্টিকো। মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে।'

নিজের হাতের তালুতে চটাস এক থাপ্পড় মারলেন মিস্টার ব্রিক। 'সব দোষ আমার! সব আমার দোষ। বহুকাল আগেই ডজ ওরিগোর একটা বিহিত করে ফেলা উচিত ছিল আমার, যখন ক্যাসিনোটা চালাচ্ছে সে।'

'কি করতে পারতে তুমি, বাবা?' রেড বলল। 'পুলিশ তো সব জানতই। জেনেশুনেও ওই অবৈধ ব্যবসা তাকে চালাতে দিয়েছে। তারমানে ওদের সঙ্গে

সমঝোতা একটা ছিল।'

'সমঝোতা মানেই টাকা। ঘুষ,' কিশোর বলল।

'ওর সঙ্গে দেখা করব আমি,' মিস্টার ব্রিক বললেন। 'হেস্ত-নেস্ত একটা করেই ছাড়ব এবার।'

'দেখা আমাদেরও করতে হবে। রোজালিনকে ধরে নিয়ে গেছে ওরা। আমাদের বন্ধু টমকেও।'

ওদের কথায় সমর্থন জানাতেই যেন পেছনে এসে উদয় হলো তিনজন লোক। মর্টিকো, আর জর্ডানরা দুই ভাই।

'তোমাদের সঙ্গে মিস্টার ওরিগোও কথা বলতে চান,' গোয়েন্দাদের উদ্দেশ্য করে বলল মর্টিকো। 'তাঁর বাড়িতে।' আদেশ অমান্য করলে কি করা হবে সেটা বোঝানোর জন্যে রাইফেল কক্ করল সে। 'এক্ষুণি চলো।'

এগারো

'তাহলে তুমিও আছ এর মধ্যে, মর্টিকো,' রাগে হিসিয়ে উঠলেন মিস্টার ব্রিক।

'আপনি তো আমাকে কোনকালেই পছন্দ করতে পারলেন না,' মর্টিকো বলল। 'আপনার ব্যাপারে আমারও একই অবস্থা। আমিও আপনাকে কোনদিন পছন্দ করতে পারিনি।'

'তোমার মত একটা ছ্যাঁচড়া চোরের পছন্দে-অপছন্দে কি এসে যায় আমার,' মিস্টার ব্রিক বললেন। 'নর্দমা থেকে তুলে এনে ডজ তোমাকে সর্দার বানালেই কি সাংঘাতিক কিছু হয়ে গেলে নাকি।'

'জবাব দেয়ার সময় থাকলে খুশি হতাম,' মর্টিকো বলল। 'কিন্তু বস্ বসে আছেন। আপনাকেও নিয়ে যেতে বলে দিয়েছেন আমাদের।'

রওনা হলো কিশোর, মুসা, রিচি। তাদের সঙ্গে রেড আর তার বাবা। রবিনের দিকে তাকিয়ে চোখ থেকে গোক্ষুরের বিষ ঝাড়ল যেন দুই ভাই।

কিশোর আর রবিন মিছিলের আগেভাগে রয়েছে। ওদের পাশে পাশে থাকছে মর্টিকো। সতর্ক রয়েছে, যাতে কোনমতেই থাবা দিয়ে তার হাত থেকে রাইফেলটা কেড়ে নিতে না পারে ওরা। মিছিলের পেছনে রয়েছে দুই ভাই। দু'জনের কাছেই পিস্তল।

প্রাসাদের দরজা লাগানো। তবে ঠেলা দিতেই খুলে গেল। আগে ভেতরে ঢুকল কিশোর।

বড় প্রধান ঘরটা পার হয়ে ওদেরকে একটা ছোট পড়ার ঘরে নিয়ে এল মর্টিকো। ঘরের একপ্রান্তে মস্ত একটা সোফায় বসে আছে ওরিগো।

ওকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন মিস্টার ব্রিক, ট্রাক ভর্তি টাকা নাকি লুট করেছ?'

'ধীরে, এড, ধীরে,' ওরিগো বলল। 'তোমার সঙ্গে নতুন কোন কথা নেই আমার। বহু আগেই সেটা চুকেবুকে গেছে।'

'সেটা তোমার মনে হচ্ছে,' থামলেন না মিস্টার ব্রিক। 'বহু আগেই তোমাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেয়া উচিত ছিল। তাহলে এখন আর এ সব কুকর্ম করে বেড়াতে পারতে না। ডাকাতিই শেষ নয়। শুনলাম, তুমি নাকি কিডন্যাপও করেছ?'

দাঁত বের করে হাসল ওরিগো। 'এখনও বুঝতে পারছ না? তোমাকেও তো কিডন্যাপ করেই আনা হলো।'

'কেন নিয়ে এসেছেন আমাদেরকে এখানে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'অতিরিক্ত জেনে ফেলেছ তোমরা,' ওরিগো বলল। 'তোমাদেরকে ছেড়ে রাখা এখন ভয়ানক বিপজ্জনক। আপাতত তোমাদেরকে এখানে তালা আটকে রাখব, তারপর ভেবেচিন্তে দেখব কি করা যায়।'

'আমাদের ছাড়বেন না, এটুকু বুঝতে পারছি।'

'ছাড়াটা কি উচিত হবে? তুমি হলে কি করতে?' ভুরু নাচাল ওরিগো। 'ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এডের তো গিয়ে কবুতরের মত বাক-বাকুম বাক-বাকুম শুরু করে দেবে। বাকি সবাইও তোমরা একই কাণ্ড করবে। এটা জেনেও ছাড়তে বলো তোমাদের?'

অবাক হয়ে গেল রেড। 'তারমানে...তারমানে আপনি...'

'এতজনকে কিডন্যাপ করে এনে পার পাবে না সে,' রেডকে বলল কিশোর। 'পার পেতে দেব না আমি ওকে।'

'তুমি, সত্যি, খুব সাহসী ছেলে,' হেসে বলল ওরিগো। 'মর্টিকো, ওদের রাত কাটানোর ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে এসো না।'

'যাচ্ছি, স্যার,' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে কিশোর আর তার সঙ্গীদের দিকে তাকাল মর্টিকো।

মেয়ের কাঁধে হাত রাখলেন মিস্টার ব্রিক। 'ভয় নেই, মা, আমি তো আছি। তুই জানিস, তোর একটা চুলও খসাতে দেব না আমি কাউকে।'

স্টাডি থেকে ওদের বের করে নিয়ে এল মর্টিকো। আগের মতই পেছনে সেঁটে থাকল জর্ডানরা। অলঙ্করণ করা রেলিংওয়ালা একটা সিঁড়ি দিয়ে ওদেরকে দোতলায় নিয়ে আসা হলো। লম্বা হলের ধার ঘেঁষে অনেকগুলো ঘর। একটা ঘরে ঢুকিয়ে দেয়া হলো ওদের।

দু'জন লোকের দেখা পাওয়া গেল সেখানে। রোজালিন আর টম। কিশোরদেরকে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে তাকাল ওরা। সবাইকে দেখে খুশি হলো।

টম বলল, 'যাক, এলে, ভালই করলে।...আমাদের নিতে এসেছ, না?'

'চেয়েছিলাম তো নিতেই,' জবাব দিল রবিন। 'কিন্তু তোমাদের সঙ্গে আমাদেরও আটকে দিতে চায় যে।'

বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা লাগিয়ে দিল মর্টিকো। তালা লাগানোর শব্দ হলো।

ঘরের আসবাবপত্রগুলো অদ্ভুত। অনেক লম্বা একটা টেবিলের একপাশে

কয়েকটা চেয়ার। টেবিলে রাখা আধ ডজন পুরানো আমলের টেলিফোন সেট। ব্যবহার হয় না বহুকাল। একটা রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল কিশোর। ডায়াল টোন নেই।

'ডেড,' জানাল সে।

'এতগুলো টেলিফোন কেন এখানে?' রবিনের প্রশ্ন।

টম বলল, 'আমি আর রোজালিনও ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম।'

'আমি অবশ্য বুঝে গেছি,' কিশোর বলল। 'এই বাড়িটার মধ্যে একটা ক্যাসিনো বানানো হয়েছিল।'

'তাই নাকি? রীতিমত একটা খবর শোনালে।'

'হ্যাঁ। পুরানো যন্ত্রপাতিগুলো আবিষ্কার করেছি এ বাড়ির নীচের নিচের ঘরে। রুলেট টেবিল, স্লট মেশিন, সব কিছু আছে। আর এ ঘরটা ছিল জুয়ার আড্ডা। নিচে যে জুয়া খেলা হত, তার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। এখানে হত অন্য ধরনের জুয়া। এই যেমন ঘোড়দৌড়।'

'একটু পর পরই তো চমকে দিচ্ছ তুমি!' রবিন বলল। 'এই অকাজটাও বাদ রাখেনি নাকি ওরিগোরা?'

'না, রাখেনি,' জবাব দিল কিশোর। 'লেজারবুকের লেখার মানে বুঝতে পারছি এখন। এ ধরনের জুয়াও চালিয়েছে ওরিগোরা।'

'এখন আর বুঝেও কোন লাভ নেই,' টম বলল। 'আটকা পড়ে গেছি। আমি সত্যি দুঃখিত, তোমাদেরকে এই বিপদে ফেলার জন্যে।'

'তাতে তোমার দোষটা কোথায়?'

'দোষ নেই? কি বলছ তুমি?' রবিন বলল কিশোরের দিকে তাকিয়ে। 'ও পা না ভাঙলে...'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও!' জোরে কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিল রিচি। 'মনে হচ্ছে এই ফোনগুলো আমাদের খানিকটা উপকার করলেও করতে পারে।'

'কি ভাবে?' জানতে চাইল রবিন।

'এই তারগুলো দেখেছ?'

রিচির দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল সবাই। দেয়ালের একটা গোল ফুটো দিয়ে একসঙ্গে ঢুকে গেছে সবগুলো তার।

'তাতে কি?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'কোথাও না কোথাও গিয়েছেই ওগুলো, তাই না?'

'তা তো গেছেই। কিন্তু আমাদের লাভটা কি?'

'ভাল করে তাকাও দেয়ালের দিকে।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল কিশোর। একটা দেয়ালের চিহ্ন দেখতে পেল ওখানে, প্লাস্টার করে ঢেকে দেয়া হয়েছে। ঠিক ছিদ্রটার ওপরে। ধীরে ধীরে মাথা দুলিয়ে বলল, 'হুঁ, তারমানে একটা দেয়াল আলমারি ছিল এখানে এক সময়।'

'উঁহু, আলমারি না,' রিচি বলল। 'টেলিফোন এক্সচেঞ্জ। এ ঘরের টেলিফোনগুলো অতি পুরানো। এগুলোকে কাজ করানোর জন্যে বড় ধরনের যন্ত্রপাতির প্রয়োজন ছিল, পুরানো আমলে যে ধরনের জিনিস ব্যবহার করা হত।

জুয়ার আসর যখন জমে উঠত এখানে, টেলিফোনের প্রয়োজন তো পড়তই। বর্তমানে যখন ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি সব আধুনিক আর ছোট হয়ে এসেছে, তখনও সিসটেমটাকে বদলাতে পারেনি। কারণ এখন আর টাকাই আসে না ওদের।'

'সবই বুঝলাম। কিন্তু তাতে আমাদের লাভটা কি?' রবিন কোন আগ্রহ বোধ করছে না।

'এখনও জানি না,' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কান চুলকাল রিচি। 'তবে যন্ত্রপাতিগুলো একবার দেখতে চাই আমি। এখানে ফোনগুলো ডেড হয়ে আছে বলেই যে এগুলো অকেজো, সেটা ভাবার কোন কারণ নেই। দেয়াল ভেদ করে ওপাশে যেতে পারলে, হয়তো ফোনগুলো চালু করার ব্যবস্থা করতে পারব।'

'চেষ্টা করতে দোষ কি?' কিশোর বলল। 'অ্যাই, কারও কাছে কিছু আছে, যেটা দিয়ে এই দেয়ালে গর্ত করা যেতে পারে?'

'এটা দিয়ে চেষ্টা করে দেখতে পারো,' ক্রাচটা বাড়িয়ে দিল টম। 'দয়া করে ভেঙে ফেলো না। বেরোনোর সময় দরকার হবে আমার।'

ক্রাচটা নিয়ে দেয়ালে ঠুকতে শুরু করল কিশোর। শব্দ যতটা সম্ভব কম করতে চাইল। মর্টিকোর কানে গেলেই ছুটে চলে আসবে দেখার জন্যে। রঙের আস্তর খসে পড়তে শুরু করল দেয়াল থেকে। গর্ত হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

হাত দিয়ে টেনে টেনে দেয়ালের কাঠের বোর্ড ভাঙতে আরম্ভ করল সে। বাকি সবাই হাত লাগাল তার সঙ্গে। ভেতর দিয়ে হেঁটে বেরোনোর মত একটা ফোকর তৈরি করে ফেলতে সময় লাগল না।

দেয়াল আলমারির সমান একটা প্যাসেজ। তার ওপাশের ঘরটা বড়ই ছোট। বৈদ্যুতিক বাতি নেই। তবে যে ঘরটা থেকে ঢুকল এইমাত্র, সেটা থেকে প্যাসেজ দিয়ে আলো গিয়ে পড়ছে। সারা ঘরে তারের ছড়াছড়ি। সাপের দেহের মত জড়াজড়ি করে পড়ে আছে মেঝেতে। একটার ওপর আরেকটা পড়ে মাকড়সার জাল তৈরি করেছে কোথাও কোথাও।

'সরো তো,' রিচি বলল। 'আমি দেখি।'

'দেখো আবার, টমের মত না অকেজো হয়ে যাও। ইলেকট্রিক শক খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলে তোমাকে আর বহন করে নিয়ে যেতে পারব না।'

সাবধানে ঘরটাতে গিয়ে ঢুকল রিচি। সাবধান রইল যাতে জ্যান্ত তারে পা পড়ে না যায়। বৈদ্যুতিক শক খেয়ে মরার কোন ইচ্ছেই তার নেই। চারপাশে তাকিয়ে দেখতে লাগল। ম্লান আলো পড়েছে দেয়ালগুলোতে। দেখতে দেখতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখ। চিনতে পেরেছে।

'এটা একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ টেলিফোন সুইচিং স্টেশন,' উল্লসিত কণ্ঠে জানাল সে। 'আমার ধারণা, সেই উনিশশো চল্লিশ সালে তৈরি করা হয়েছিল। শহরের প্রতিটি টেলিফোন লাইন এ ঘরের ভেতর দিয়ে গেছে।'

'সাংঘাতিক কথা শোনালে হে!' চেঁচিয়ে উঠল টম। 'জলদি কোন একটা লাইন প্লাগ করে দাও। তারপর এমন কাউকে ফোন করো, যে এসে উদ্ধার করে

নিয়ে যেতে পারবে আমাদের।'

'অত সহজ না,' তাকে নিরাশ করল রিচি। 'এ তারগুলোর কাজ কি, আমি এখনও জানি না। সেন্ট্রাল রুটিং সার্কিট্রিটা আগে খুঁজে বের করতে হবে আমাকে।'

'করে ফেলো না,' রবিন বলল। 'কথা বলে সময় নষ্ট করছ কেন?'

তারগুলোর মধ্যে খুঁজতে আরম্ভ করল রিচি। দেয়ালে বসানো একটা ধাতব বাক্স দেখতে পেল।

'এটা হয়তো সাহায্য করবে,' অন্যদের শুনিয়ে শুনিয়ে আপনমনেই বিড়বিড় করল সে। 'দরজা খুলে ভেতরে দেখতে হবে কি আছে।'

'কি দেখবে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'যে জিনিস খুঁজছি আমরা,' জবাব দিল রিচি। 'গোটা দুই তার জুড়ে দিলেই হয়তো কোন একটা সেট চালু করে ফেলতে পারব।'

'সত্যি পারবে?' জানতে চাইল রবিন।

জবাব না দিয়ে তারগুলো নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করে দিল রিচি। হঠাৎ তীক্ষ্ণ চড়চড় শব্দ শুরু হলো। উজ্জ্বল নীল রঙের ফুলকি ফোয়ারার মত ঝরে পড়তে লাগল রিচির হাতে। বোতলের মুখ থেকে ছিপি খোলার মত একটা শব্দ করে ছিটকে গিয়ে মেঝেতে চিৎ হয়ে পড়ল রিচি। কিশোরের পায়ের কাছে।

'রিচি! রিচি!' বলে চিৎকার দিয়ে হাঁটু গেড়ে তার কাছে বসে পড়ল কিশোর।

'কিছু হয়নি আমার,' জবাব দিল রিচি। ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেছে মুখ। 'ভয়ানক একটা শক খেয়েছি কেবল। বহুকাল পরে আবার খেলাম...'

'বাড়ির ইলেকট্রিক লাইন মেরামতের সময় যেটা খেয়েছিলে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'ওটা বোধহয় এরচেয়ে খারাপ ছিল,' কিশোর বলল। 'তখন তো হাসপাতালে নেয়া লেগেছিল।' রিচির দিকে তাকাল সে। 'এর মানেটা দাঁড়াচ্ছে, বাইরে কোথাও আর ফোন করতে পারছি না আমরা?'

'না না, তা কেন?' লাফ দিয়ে উঠে বসল রিচি। 'এবার সাবধান হয়ে কাজ করব।'

বাতাস শুঁকছে টম। 'আই, নিচের রান্নাঘরে বোধহয় খাবার পুড়ছে ওদের।'

রবিনও নাক কুঁচকে শুঁকল। 'খাবার? ওই জিনিস সেধে দিলেও খাব না আমি। পোড়া রবারের মত গন্ধ।'

টেলিফোন রুমের ভেতরে কালো ধোঁয়া উঠতে দেখে অস্ফুট শব্দ করে উঠল রিচি।

'সর্বনাশ!' চেঁচিয়ে উঠল টম। 'আগুন ধরিয়ে দিয়েছ তো তুমি ঘরটার মধ্যে!'

'বদ্ধ ঘরে আটকে থেকে মরব এবার!' রবিন বলল।

বারো

'পানি! পানি!' বলে চিৎকার শুরু করল টম। 'আগুন নেভানোর জন্যে পানি দরকার!'

'পানিতে কাজ হবে না,' অবিচলিত কণ্ঠে দুঃসংবাদটা জানাল রিচি। 'এটা বৈদ্যুতিক আগুন। তারের স্পার্কিঙের কারণে ধরে। সার্কিট শর্ট করে দিয়েছি আমি, এটা তারই ফল। নেভানোর জন্যে বালি দরকার এখন।'

'তা তো বটেই!' তিক্তকণ্ঠে বলল টম। 'বালি কোথায় পাব? ঘরে বালির ঢিবি আছে ভাবছ নাকি?'

'জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলে দেখা যেতে পারে, নেভে কিনা,' কিশোর বলল।

চারপাশে তাকানো শুরু করল রিচি। 'কি আর ফেলব? এখানে যা আছে সবই দাহ্য পদার্থ। একটা কম্বলও নেই যে চেপে ধরব।'

ধোঁয়ার মধ্যে আগুনের শিখা দেখা গেল। ছোট ঘরটাকে গ্রাস করতে সময় লাগবে না। তার বেয়ে গিয়ে খুব সহজেই দেয়ালে লাগবে। পুরানো খড়খড়ে শুকনো কাঠের দেয়াল পুড়িয়ে দেবে পাটকাঠির মত। কাঠ আর তার পোড়াতে পোড়াতে চলে আসবে প্রথম ঘরটাতে।

এবং সেটা আসতে সময় লাগল না।

ধোঁয়া ঘন হচ্ছে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

'উহ্, মনে হচ্ছে আগুন ধরে গেছে আমার চোখে,' রবিন বলল।

কাশতে লাগল রেড। 'আমার ফুসফুসটা গেছে!'

'মেঝেতে বসে পড়ো সবাই,' রিচি বলল। 'ধোঁয়া ওঠে ওপরের দিকে। নিচের দিকে অতটা থাকে না। নাকে-চোখে কম লাগবে। বেশিক্ষণ শ্বাস নিতে পারব, যদি ধোঁয়াটাকে আমাদের মাথার ওপরে রাখতে পারি।'

'বেশিক্ষণ?' টম জিজ্ঞেস করল। 'কতক্ষণ? সারা ঘর যখন ধোঁয়ায় ভরে যাবে তখন কি করব? পুরানো টেলিফোন সেটের মাধ্যমে নিশ্চয় দম নেয়ার কোন ব্যবস্থা নেই?'

বড় ঘরটার দরজার ওপাশে হই-চই শোনা গেল। 'এই, কি হচ্ছে কি? এত চেঁচাচ্ছ কেন?'

মর্টিকোর কণ্ঠ।

'ওই পাজি লোকটার কণ্ঠ শুনতেও ভাল লাগছে এখন,' কিশোর বলল।

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে উঁকি দিল মর্টিকো। তার পেছনে জর্ডান ব্রাদারদের মাথা দেখা যাচ্ছে।

'করেছ কি!' রাগে চিৎকার করে উঠল মর্টিকো। 'বাড়িটা পুড়িয়ে দেয়ার ইচ্ছে নাকি?'

'নাহ্, বাড়ি পোড়ানোর কোন ইচ্ছেই আমাদের ছিল না,' কাশতে কাশতে জবাব দিল টম।

দুই ভাইয়ের দিকে ফিরে তাকিয়ে চিৎকার করে আদেশ দিল মর্টিকো, 'জলদি গিয়ে ইমারজেন্সি সাপ্লাই বক্স থেকে বালি নিয়ে এসো।' ঘরের দিকে ফিরে রাইফেল নাড়াল। 'তোমরা সবাই বেরিয়ে এসো ওখান থেকে। ধোঁয়ার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না।'

খুশি মনেই ঘর থেকে বেরিয়ে চলে এল সবাই। হলওয়েতে, যেখানে দাঁড়িয়ে আছে মর্টিকো। দরজা দিয়ে ওদের সঙ্গে সঙ্গে বেরোতে লাগল কালো ধোঁয়া।

দৌড়ে ফিরে এল জর্ডানরা। একজনের হাতে বালির বালতি। আরেকজনের হাতে ফায়ার এক্সটিংগুইশার।

'আগুন নেভাও আগে,' আদেশ দিল মর্টিকো। 'ছড়িয়ে পড়লে সর্বনাশ হয়ে যাবে। দমকলও নেই এ মরার শহরে যে এসে আগুন নেভাবে।'

বন্দীদের দিকে রাইফেল তুলে রেখেছে সে। 'যাও, নিচে নামো সবাই। মিস্টার ওরিগো কথা বলবেন।'

আগুন নেভাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল জর্ডানরা। বাকি সবাই সারি দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে শুরু করল, যেটা দিয়ে মাত্র বিশ মিনিট আগে উঠে এসেছিল।

লবিতে দাঁড়িয়ে আছে ওরিগো। রেগে আগুন। ধমক দিয়ে কিছু বলতে যাবে, কিন্তু তার আগেই মিস্টার ব্রিক বলে উঠলেন, 'আরেকটু হলেই তো পুড়িয়ে মেরেছিলে আমাদের। দোষ পুরোটাই তোমার, ডজ। তোমাকেই আমি অভিযুক্ত করছি।'

'গাধা যে, সে-জন্যে!' গর্জে উঠল ওরিগো।

'খবরদার, গালাগাল করবেন না বলে দিলাম!' চিৎকার করে উঠল রেড।

'তুই চুপ থাক, রেড,' মিস্টার ব্রিক বললেন। 'আমার আর আমার পুরানো দোস্তের মাঝে তুই আর কথা বলিস না।'

'তুমি কখনোই আমার বন্ধু ছিলে না,' নিমের তেতো ঝরল ওরিগোর কণ্ঠ থেকে। 'তুমি ছিলে একটা "অতি ভালমানুষ"। ক্যাসিনোর কাজ তোমার ভাল লাগত না। তখন যে পুলিশের হাতে আমাদের তুলে দেবার চেষ্টা করোনি, এটাই বেশি। তবে আমি তোমার মত বোকা নই। হাতে যখন পেয়েছি, আর ছাড়ছি না। মেয়েটাও হয়েছে তোমার মত, "অতি ভালমানুষ রেড"।'

সবাইকে অবাক করে দিয়ে টেবিল থেকে একটা ফুলদানি তুলে নিয়ে ছুটে গেলেন মিস্টার ব্রিক। বাড়ি মেরে বসলেন ওরিগোর মাথায়। টুঁ শব্দ না করে টলে মেঝেতে পড়ে গেল ওরিগো।

দৌড়ে আসতে গেল মর্টিকো।

ঝট করে ডান পা'টা সামনে বাড়িয়ে দিল কিশোর। তাতে হোঁচট খেয়ে উড়ে গিয়ে পড়ল মর্টিকো। কাঠের মেঝেতে বিকট শব্দ হলো। কপাল ঠুকে গেল লোকটার।

'দারুণ! দারুণ!' বাতাসে ক্রাচ নাচাতে নাচাতে বলল টম। 'এত সহজে এত

বড় বড় কথা থেমে যাবে, কল্পনাই করতে পারিনি।'

'বেশিক্ষণ থাকবে না,' জরুরী কণ্ঠে রবিন বলল। 'সময় যখন পাওয়া গেছে, এখুনি বেরিয়ে যাওয়া দরকার।'

সামনের দরজার দিকে ছুটল সবাই। আগে আগে রয়েছে কিশোর আর রবিন। ওদের পেছনে মিস্টার ব্রিক আর রেড। সবার পেছনে টম, রিচি আর রোজালিন। টমের পাশে পাশে আসছেন রোজালিন। সবাইকে অবাক করে দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতেও সমান তালে ছুটে আসছে টম।

'কোনদিকে যাব?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'ট্রেইলে ফিরে যাব?'

'উঁহু,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'আধ মাইল যাওয়ার আগেই আমাদের ধরে ফেলবে ওরা। একটা গাড়ি দরকার।'

'ট্রাকটা! আর্মার্ড ট্রাক!' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল রবিন। 'আমি দেখেছি চাবিটা ইগনিশনেই ঢোকানো রয়েছে।'

'বাহ্, তাই নাকি!' খুশি হলো কিশোর। 'এক ঢিলে কয়েক পাখি মেরে ফেলব আমরা তাহলে। পালানোও হবে, টাকাটাও বের করে নিয়ে যেতে পারব শহর থেকে। তুলে দেব কর্তৃপক্ষের হাতে।'

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে পুরানো গোলাবাড়ির দিকে ছুটল ওরা।

গোলাঘরের ভেতরে ঢুকেই দরজা লাগিয়ে দিল রবিন। শত্রুপক্ষের কেউ যাতে আর ঢুকতে না পারে।

'গুড,' কিশোর বলল। 'কে কোথায় বসবে এখন, দেখা যাক। রিচি, ট্রাকের পেছনের দরজাটা খোলো তো।'

টান দিয়ে দরজা খুলল রিচি। হাঁ করে তাকিয়ে রইল টাকার ব্যাগগুলোর দিকে।

'দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ঢোকো,' কিশোর বলল। 'মিস্টার ব্রিক, আপনি আর রেড ওখানে বসেই যাবেন।'

'আর আমি?' রোজালিন জানতে চাইলেন।

'আপনি সামনে বসবেন, আমার আর রবিনের সঙ্গে। শহর থেকে বেরোনোর রাস্তা দেখাবেন।'

টাকার বস্তার সঙ্গে গাদাগাদি করে গিয়ে ট্রাকের পেছনের বাক্সটায় বসল টম, রিচি, রেড আর মিস্টার ব্রিক।

'গাড়ি চালাবে কে?' রবিনের দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর।

'তুমিই চালাও,' রবিন বলল। 'ঝুঁকি নেয়ার সাহস অনেক বেশি তোমার।'

'কিন্তু আমি যে তোমাদের মত চালাতে অভ্যস্ত নই?'

'সে-জন্যেই তো সাবধান থাকবে বেশি।'

'রোজালিন,' কিশোর বলল, 'আপনি আমাদের দু'জনের মাঝখানে বসুন।'

'জায়গা তো একেবারেই নেই,' সামনের সীট দুটোর দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করলেন রোজালিন। 'যা-ই হোক, বসা তো লাগবেই, যে ভাবেই হোক।' ভঙ্গি দেখে মনে হলো ট্রাকে করে যাওয়ার ইচ্ছে নেই তাঁর।

রোজালিন উঠে বসতেই লাফ দিয়ে তাঁর পাশে উঠে বসল রবিন। কিশোর

উঠল ড্রাইভিং সীটে। চাবিতে মোচড় দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে গুঞ্জন করে উঠল নতুন ইঞ্জিন। চালু হয়ে গেল কোন রকম প্রতিবাদ না করে।

'খড়ের গাদার নিচে পড়ে থেকেও সামান্যতম ক্ষতি হয়নি,' রবিন বলল।

গীয়ার বদল করল কিশোর। ডান পা চেপে ধরল অ্যাক্সিলারেটরে।

'আরি আরি!' চিৎকার করে উঠল রবিন। 'গোলাঘরের দরজাটা আগে খুলে নিলে হত না?'

'আর সময় কই?' কিশোর বলল। 'তা ছাড়া বলা যায় না, বাইরে হয়তো ঘাপটি মেরে রয়েছে শত্রুরা। বেরোলেই ধরতে আসবে। কোন সুযোগই দেব না ওদের।'

পেডালে পায়ের চাপ বাড়িয়ে গাড়িটাকে সোজা গোলাঘরের দরজার দিকে ছুটিয়ে দিল কিশোর। তেজী ঘোড়ার মত লাফ দিয়ে আগে বাড়ল গাড়ি। দুই হাতে ড্যাশবোর্ড ঠেলে ধরে শক্ত হয়ে বসে রইল রবিন আর রোজালিন।

কাঠের দরজায় আঘাত হানল ট্রাকের নাক। এত জোরে শব্দ হলো, মনে হলো শহরের সমস্ত লোক শুনতে পেয়েছে। ছিটকানি খুলে, দরজা ভেঙে বাইরে বেরিয়ে এল ট্রাক। দরজার বাইরে কেউ কান পেতে থাকলে চিৎ হয়ে যেত এতক্ষণে। ওঠার আর ক্ষমতা থাকত না।

কিন্তু কেউ নেই বাইরে। পাহাড়ের দিকে গাড়ি ছোটাল কিশোর। মেইন রোড ধরে ছুটল, প্রাসাদ থেকে শহরে যাওয়ার রাস্তা ধরে। কিন্তু রাস্তা মোটেও নিষ্কণ্টক নয়। সেটা আশাও করেনি ওরা। দুটো মোটর সাইকেল তীব্র গতিতে ছুটে আসতে শুরু করল ওদের দিকে। জর্ডানরা দুই ভাই।

'আর কোন রাস্তা নেই?' এদিক ওদিক তাকাতে শুরু করল রবিন।

'রাস্তার কি দরকার?' কিশোর বলল। 'ট্রাকের গায়ে গুঁতো দেয়ার সাহস ওরা করবে না। নিজেদের মরারও তো ভয় আছে।'

'কিন্তু সত্যি যদি গুঁতো মেরে বসে? ট্রাকটার ক্ষতি করে আটকে ফেলতে পারে আমাদের। তারচেয়ে বাড়িটার পেছন ঘুরে ওদিক দিয়ে চলে গেলে কেমন হয়?' ডানে হাত তুলল রবিন।

'না, তাতেও কোন লাভ হবে না। মোটর সাইকেল নিয়ে ওদের ছুটে আসতে কোনই অসুবিধে হবে না। সংঘর্ষ এড়ানো যাবে বলে মনে হচ্ছে না আমার।'

যেদিকে যাচ্ছিল, সেদিকেই চালিয়ে নিয়ে চলল কিশোর। তাদের অনুসরণ করল মোটর সাইকেল দুটো। ঢাল বেয়ে নামতে গিয়ে চাপ পড়ছে ইঞ্জিনে, প্রচণ্ড শব্দ করছে। সেকেন্ড গীয়ারে রেখেছে তাই কিশোর। অ্যাক্সিলারেটর চেপে রেখেছে ফ্লোরবোর্ডের সঙ্গে।

'আমাদের ধরার জন্যে পাগল হয়ে গেছে ওরা,' রবিন বলল।

সোজা ট্রাক লক্ষ্য করে ছুটে আসছে দুই জর্ডান। দৃষ্টি যেন আঠা দিয়ে আটকে দেয়া হয়েছে গাড়ির সঙ্গে। গুঁতো লাগলে কি ঘটবে, সেই পরোয়াও করছে না।

কাছে চলে এল মোটর সাইকেল। আচমকা ডানে কাটল কিশোর। অল্পের জন্যে ধাক্কা লাগা থেকে বেঁচে গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রবিন।

মোটর সাইকেল চালাতে জানে দুই ভাই। চোখের পলকে ঘুরিয়ে নিয়ে পিছু নিল ট্রাকের।

খোলা মাঠের দিকে ছুটল কিশোর। লম্বা লম্বা ঘাস দেখে দ্বিধা করছে কিশোর। বড় গর্তটর্ত থাকলে মুশকিল হয়ে যাবে।

কিন্তু অত কথা ভাবার সময় নেই এখন।

লম্বা ঘাসের মধ্যে নেমে পড়ল ট্রাক। নামার সময় সামান্য ঝাঁকুনি লাগা ছাড়া আর কিছুই হলো না। দূরে তাকাল কিশোর। ওরিগোর ফার্মের সীমানা থেকে বেরোনোর আর কোন পথ আছে কিনা খুঁজল তার চোখ। নেই। পেছনে তীব্র গতিতে ছুটে আসছে দুই মোটর সাইকেল আরোহী। লম্বা ঘাস ওদের গতি রোধ করতে পারছে না। তবে জায়গাটা সমান। গর্ত নেই।

প্রাসাদটা এখন ওদের বাঁয়ে। ট্রাকের নাক ঘুরিয়ে সেদিকে ছুটল সে।

ওদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে গেল জর্ডানরাও।

মাঠ থেকে উঠে ওরিগোর বাড়ির পেছনের চত্বর ধরে ছুটে চলল ট্রাক। কোনমতে শহরের রাস্তাটায় নেমে যেতে চায় কিশোর। তাহলে শহর থেকে বেরোনোর রাস্তাটায় সরে যেতে পারবে।

বাড়ির সামনের দরজাটা দেখা যাচ্ছে এখন। মাত্র কয়েকশো গজ দূরে রাস্তাটা। প্রধান গেট দিয়ে বেরিয়ে শহরের দিকে চলে গেছে।

হঠাৎ দমে গেল সে। বড় কালো একটা লিমুজিন গাড়ি। পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে বসে আছে মর্টিকো আর তার বস্ ওরিগো।

তেরো

'নাও, হয়েছে,' হতাশ ভঙ্গিতে হাত নাড়ল রবিন। 'পড়লাম এখন ফাঁদে আটকা!'

কিন্তু এত সহজে হাল ছাড়ার বান্দা নয় কিশোর। গাড়ির নাক ঘুরিয়ে দিয়ে এক পাশের বেড়া লক্ষ্য করে ছুটল। বেড়ার অন্য পাশে ঘন ঝোপঝাড়।

গুঁতো লাগল বেড়ায়। উড়ে চলে গেল ওই অংশটা। হারিয়ে গেল ঝোপঝাড়ের মধ্যে। বেড়ার চেয়ে বরং ঝোপঝাড়ের সবুজ দেয়াল বাধা সৃষ্টি করল বেশি। ডালপালা ভেঙে, গাছগুলোকে মাড়িয়ে ট্রাকটা ছোটার সময় ভয়াবহ শব্দ হতে লাগল।

অন্য পাশে বেরিয়ে চলে এল ওরা। সামনের জানালায় পাতা আটকে গিয়ে দৃষ্টিপথে বাধার সৃষ্টি করছে। উইন্ডশীল্ড ওয়াইপার চালু করে দিল কিশোর। পাতাগুলো ঝেড়ে ফেলে গতি বাড়িয়ে দিল। গর্জন তুলে ছুটে চলল মেইন স্ট্রীটের দিকে।

'হ্যাঁ, এখন বলুন,' রোজালিনকে জিজ্ঞেস করল কিশোর। রাস্তার ওপর থেকে চোখ সরাচ্ছে না। 'শহর থেকে বেরোব কি করে?'

'ওদিক দিয়ে,' হাত তুলে দেখালেন রোজালিন। 'মেইন স্ট্রীটের শেষ মাথায় গেলে রাস্তা পেয়ে যাবে।'

মুসার জন্যে দুশ্চিন্তা হচ্ছে কিশোরের। তাকে একা শহরে ফেলে যেতে হচ্ছে বলে। তবে মুসার কাছে ঘোড়াটা আছে। শত্রুদের খপ্পরে পড়ে না গেলে সহজেই ঘোড়া চালিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে এখান থেকে। মুসার একার জন্যে অপেক্ষা করে বাকি সবাইকে বিপদে ফেলার ঝুঁকি নিতে পারবে না কিশোর। তাদেরকে নিরাপদে শহর থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া এখন তার প্রধান দায়িত্ব। শহরে গেলে তখন মুসার খোঁজে পুলিশ পাঠাতে পারবে। নিজেরাও আসতে পারবে সঙ্গে। তা ছাড়া নিজেকে বাঁচানোর ক্ষমতা মুসার আছে। অত সহজে তাকে কাবু করতে পারবে না ওরিগোর দল। এত সব বলে নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করল বটে কিশোর, কিন্তু মনের খুঁতখুঁতিটা গেল না। কিন্তু কি করবে? পেছনে শত্রু তাড়া করছে। এই অবস্থায় মুসাকে খুঁজে বের করবে কি করে এখন?

ভাবতে ভাবতে গাড়ি চালাচ্ছে সে। ওরিগোর প্রাসাদের উল্টো দিকে ছুটে চলল ট্রাক। মেইন স্ট্রীটের মাথার কাছে কয়েকটা বাড়িঘর দেখা গেল। তার ওপাশে জঙ্গল। শহরের অন্য প্রান্তে যে রাস্তাটা দেখেছিল ওরা, অ্যাপালাশিয়ান ট্রেইলে বেরোনো যায়, এই রাস্তাটাও ওটারই মত।

রাস্তায় নামতেই মনে হলো গাছপালার একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। শ'খানেক ফুট এগোনোর পর দু'ভাগ হয়ে গেল রাস্তাটা।

'কোন্ দিকে যাব?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কোন্ দিকে যাওয়া নিয়ে মাথাব্যথার কি দরকার আছে?' রবিন বলল। 'যে কোন এক দিকে গেলেই হয়।'

'না, হয় না,' রোজালিন বললেন। 'ওদিকে যাও।' ডানের রাস্তাটা দেখালেন তিনি। একটু যেন দ্বিধা করলেন বলে মনে হলো কিশোরের।

দ্বিধার কারণ যা-ই থাক না কেন, ওদের চেয়ে এখানকার রাস্তা ভাল চেনেন তিনি। তর্ক না করে তাঁর নির্দেশিত পথে গাড়ি চালাল সে।

রাস্তাটা সরু। খোয়া বিছানো। বছরের পর বছর গাড়ি চলাচলের ফলে রাস্তায় চাকার দুটো গভীর খাঁজ তৈরি হয়ে গেছে। গাছের ডালপালা ওপর থেকে নেমে এসে চাঁদোয়া তৈরি করেছে মাথার ওপর। তাতে সুড়ঙ্গের মত লাগছে জায়গাটাকে।

পেছনে ইঞ্জিনের গর্জন শুনে রিয়ারভিউ মিররের দিকে চোখ ফেরাল কিশোর। মোটর সাইকেল নিয়ে ছুটে আসছে জর্ডানরা দুই ভাই। দুটো খাঁজের মধ্যে দিয়ে দু'জনে মোটর সাইকেল চালাচ্ছে।

'ধরে ফেলতে দেরি হবে না,' রবিন বলল।

'শর্টকাটে এসেছে,' কিশোর বলল। 'ওরা অনুমান করে ফেলেছে কোন্ দিকে যাচ্ছি আমরা।'

'তবে এখন আর কোন ক্ষতি করতে পারবে না আমাদের। ওরা কিছু করার আগেই শহর থেকে বেরিয়ে চলে যাব আমরা।'

রবিনের কথা শেষ হতে না হতেই গতি বাড়িয়ে দিয়ে তার জানালার পাশে চলে এল এক ভাই। আগুন ঝরা দৃষ্টিতে তাকাল রবিনের দিকে।

কি করতে চায় সে, বোঝা গেল মুহূর্ত পরেই। একটা শাবল ঢুকিয়ে দিতে চাইল রবিনের জানালা দিয়ে।

চিৎকার দিয়ে মাথা নামিয়ে ফেলল রবিন।

ঠং করে আঘাত লাগল কাঁচে। পিছলে গেল শাবলটা। জানালার কাঁচ ভাঙল না।

'বাঁচলাম!' রবিন বলল। 'বুলেটপ্রুফ গ্লাস। বাড়ি মেরে কিছু করতে পারবে না।'

'বেশি আশা কোরো না,' কিশোর বলল। 'অন্য ভাবে ক্ষতি করে দিতে পারে।'

আবার শাবল তুলে বাড়ি মারল লোকটা। এবার মারল ইঞ্জিনের হুড লক্ষ্য করে।

'মোটর নষ্ট করার চেষ্টা করছে সে,' কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। 'হুড কি খুলতে পারবে?'

'জানি না। জানতে চাইও না। তার আগেই আমি বেরিয়ে যেতে চাই।'

দড়াম করে আবার বাড়ি পড়ল হুডের ওপর। এ হারে পড়তে থাকলে খুলে যাবে হুড।

'এই লোকটার একটা ব্যবস্থা করা দরকার,' কিশোর বলল। 'বড় ধরনের ক্ষতি করে ফেলার আগেই।'

ডান দিকে গাড়ি সরিয়ে ফেলল সে। অন্য পাশে গাছের দেয়াল। কোণঠাসা করে ফেলতে চাইল ওকে। কিশোরের ইচ্ছে বুঝে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক কষল লোকটা। মুহূর্তে পেছনে পড়ে গেল।

'হুঁ, ভয় তাহলে ওরাও পায়,' রবিন বলল।

হঠাৎ রবিনের দিকের গাড়ির গায়ে দমাদ্দম বাড়ি পড়া শুরু হলো। ফিরে তাকিয়ে দেখে দ্বিতীয় লোকটা। ডান দিকে ওদের মনোযোগের সুযোগে এসে হাজির হয়েছে। হুডে বাড়ি মারছে শাবল দিয়ে।

ঝাঁকি থেকে বাঁচার জন্যে সীটের নিচেটা খামচে ধরতে গিয়ে একটা শাবল লাগল রবিনের হাতে। জর্ডান ব্রাদাররা যে জিনিস ব্যবহার করছে, ঠিক একই জিনিস।

'কি করব?' জিজ্ঞেস করল কিশোরকে। 'মারব নাকি বাড়ি?'

'মারো। তবে মেরে ফেলো না।'

আচমকা বাঁয়ে কাটল কিশোর। ব্রেক কষে পেছনে থেকে গেল লোকটা। অন্য লোকটা এগিয়ে চলে এল ডান পাশে।

রবিন এখন তৈরি। দ্রুত জানালার কাঁচ নামিয়ে ফেলে শাবলটা বের করে দিল বাইরে। লোকটা নাগালের মধ্যে আসতেই দিল বুক সই করে বাড়ি মেরে।

বিকট চিৎকার দিয়ে মোটর সাইকেলের হ্যান্ডেল ছেড়ে দিল সে। গাছের গায়ে ধাক্কা খেল সাইকেল। ডিগবাজি খেয়ে গিয়ে বনের মধ্যে পড়ল লোকটা। সাইকেলটা ফিরে এসে বাড়ি খেল গাড়ির সঙ্গে। গড়াতে গড়াতে চলে গেল বনের মধ্যে।

দ্বিতীয় জর্ডানকে আর কিছু করতে হলো না ওদের। সময় মত বাইক সরাতে পারল না সে। ভাইয়ের মোটর সাইকেলে লেগে গেল। তীব্র গতিবেগের মধ্যে এ

ধরনের রাস্তায় কোন মতেই সামলাতে পারল না সে। ভাইয়ের মতই উড়ে গিয়ে পড়ল মাটিতে। প্রচণ্ড বাড়ি খেল মাথায়। পড়ে রইল ওভাবেই।

'কি বুঝলে!' কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল রবিন। 'আমাদের বিরক্ত করা বন্ধ হলো। মাথার ব্যথায় বিছানা থেকেই উঠতে পারবে না মাসখানেক।'

'ওরা তো গেল। এখন আমাদের নিজেদের কথা ভাবা উচিত।' রোজালিনকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'খোয়া বিছানো রাস্তা ছেড়ে পাকা রাস্তায় উঠব কখন?'

'বেশিক্ষণ নেই আর,' রোজালিন জানাল। 'সামনে একটা ব্রিজ আছে। শহর থেকে বেরোনোর। ব্রিজটা পার হয়ে মাইলখানেক গেলেই হাইওয়ে পাওয়া যাবে।'

'তারমানে পাড়ি দিয়ে ফেললাম,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রবিন।

তীক্ষ্ণ একটা মোড় ঘুরে এল গাড়ি।

'বাপরে!' কিশোর বলল, 'এই রাস্তাটার মধ্যে কত ঘোরপ্যাঁচ আর মোচড়। মনে হচ্ছে একই জায়গায় চক্রাকারে ঘুরে মরছি আমরা।'

'ওই দেখো! সামনে!' চিৎকার করে উঠল রবিন। 'রাস্তায় একটা গাড়ি। মনে হচ্ছে এখানেই সাহায্য পেয়ে যাব।'

কিন্তু আশাটা বেশিক্ষণ টিকল না ওদের। গাড়িটা চিনে ফেলেছে কিশোর।

কালো লিমুজিন।

ডজ ওরিগো আর মর্টিকো বসে আছে ভেতরে।

কিশোরের কথাই ঠিক হলো। সত্যি চক্রাকারে বনের রাস্তায় ঘুরে মরেছে ওরা। শহর থেকে বেরিয়েছিল, আবার ফিরে চলেছে শহরের দিকেই।

চোদ্দ

ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল কিশোর। কিন্তু থামানো গেল না গাড়িটা। হড়হড়ে খোয়ায় কামড় বসাতে পারল না চাকা। পিছলে চলে গেল প্রায় শ'খানেক ফুট।

দুই পাশের দরজা খুলে গাড়ি থেকে নেমে এল ওরিগো আর তার চাকর মর্টিকো।

রাইফেল কক করল মর্টিকো।

আরেকটা গাড়ি আসতে দেখা গেল। পুলিশের গাড়ি। লিমুজিনের কাছে এসে থামল। গাড়ি থেকে নামল শেরিফ জোহানেস নউম। পিস্তলের খাপে হাত বোলাল।

'ও কি আমাদের সাহায্য করবে?' জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল রবিন।

জানতে পারল অল্পক্ষণের মধ্যেই।

কিশোরের জানালার কাছে এসে দাঁড়াল শেরিফ। 'ভাল চাও তো নেমে এসো। গাড়ি চুরির অপরাধে তোমাদের অ্যারেস্ট করছি আমি।'

রাগত চোখে তার দিকে তাকিয়ে দরজা খুলল কিশোর। 'গাড়ি চুরি? সেটা আমরা করিনি। করেছে ওই ওরিগো আর তার চামচারা।'

'কি বলছ তুমি ছেলে কিছুই তো বুঝতে পারছি না,' ভঙ্গি দেখে মনে হলো ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না ওরিগো। 'ও, তারমানে তোমরাই ট্রাকটা এনে আমার গোলাঘরে লুকিয়ে রেখেছিলে।'

'আমরা লুকিয়েছি?' নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না রবিন। 'আপনার মত মিথ্যুক লোক তো জীবনে দেখিনি। লাখ লাখ ডলার বোঝাই গাড়িটা শুধু চুরিই করেননি, এখন সব দোষ আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বাঁচতে চাইছেন। ঠিক আছে, চুরিই যখন করেছি বলছেন, যাদের জিনিস তাদের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আমরা। দেখি, তারা কি বলে।'

'ওসব বোলচাল বাদ দিয়ে এখন জেলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হও,' শেরিফ বলল। 'শুনলাম, আরও নাকি লোক ছিল তোমাদের সঙ্গে? ট্রাকের পেছনে ভরে রেখেছ নাকি?'

'ভরে রাখিনি,' জবাব দিল কিশোর। 'সামনে জায়গা নেই দেখে ওরাই যাবার জন্যে উঠে বসেছে।'

মর্টিকো গিয়ে টান মেরে ট্রাকের পেছনের দরজাটা খুলে ফেলল। টলোমলো পায়ে লাফ দিয়ে নেমে এল রিচি। দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে।

'এ জন্যেই তোমাকে চালাতে দেবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না আমার,' কিশোরকে বলল সে। 'খুবই খারাপ চালাও তুমি। গত পনেরোটা মিনিট ধরে মনে হচ্ছিল ঝাঁকি দিয়ে জামের ভর্তা বানাচ্ছ।' রাইফেল হাতে মর্টিকোকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'এই লোকটা এখানে কি করছে? আমি আরও ভাবলাম শহরে পৌঁছে গেছি বুঝি।'

মিস্টার ব্রিক নেমে এলেন। 'আবার তুমি, মর্টিকো? যতবার দেখছি, তত বেশি অপছন্দ হচ্ছে।'

'আপনাকে দেখে একই অবস্থা আমারও,' হেসে জবাব দিল মর্টিকো।

রেডকে নামতে সাহায্য করলেন মিস্টার ব্রিক।

'হায় হায়!' রেড বলল। 'শহরেই তো রয়ে গেছি এখনও। এগোলাম আর কোথায়?'

একটা ক্রাচ বাইরে বাড়িয়ে দিল টম। সেটায় ভর দিয়ে নেমে পড়ল রাস্তায়। 'চেষ্টা তো করা হলো বেরোনোর। না পারলে আর কি করা।'

'সামনে রাস্তার ধারেই জেলখানাটা,' শেরিফ বলল। 'পুরানো, তবে কয়েদী আটকে রাখার জন্যে যথেষ্ট। হেঁটেই যেতে হবে ওখানে। খোঁড়াটাকেও হাঁটতে হবে।'

'কিন্তু আমরা কি করলাম, বলুন তো?' জিজ্ঞেস করল টম। 'এ শহরে যে খারাপ কিছু ঘটছে, সেটা তো আপনার অজানা থাকার কথা নয়।'

'সবই জানে,' টমের জবাবটা কিশোর দিল। 'আপনিও এই ডাকাতিতে জড়িত, তাই না শেরিফ?'

ভ্রূকুটি করল শেরিফ। 'আইনের লোককে অভিযুক্ত করছ তুমি? সাহস তো

কম না!'

'ডাকাতকে ডাকাত বলার জন্যে সাহসের দরকার হয় না।'

'দাঁড়াও, জেলে আগে ঢোকাই। তারপর মজাটা টের পাবে।'

'টের পাওয়ানো ছাড়া আর কোন উপায়ও নেই,' ওরিগো বলল। 'অনেক বেশি জেনে ফেলেছে ওরা। জেনেই যখন ফেলেছে, বাকিটাও বলে দিই, কি বলো?' কিশোরদের দিকে তাকাল সে। 'শোনো, এ শহরের হাতে গোণা দু'চার জন বাদে বাকি সবাই আমাদের দলে। টাকাগুলো ভাগ করে নেব আমরা সবাই। অল্প ক'জন যারা এতে নেই, তাদেরকে কোন দিনই আর শহর থেকে বেরোতে দেয়া হবে না।'

মিস্টার ব্রিক আর রেডের দিকে আড়চোখে তাকাল সে। তাকানোর মানেটা বুঝতে কষ্ট হলো না গোয়েন্দাদের। এই দৃষ্টির অর্থ, ওরা তার দলে নয়।

'বেরোতে দেবে না তো কি করবে?' মিস্টার ব্রিক জিজ্ঞেস করলেন। 'সারা জীবন জেলে আটকে রাখবে? আমাদের সবাইকে ভরে রাখার মত অত বড় নয় তোমাদের জেলটা।'

'ঠাসাঠাসি করে ভরলে জায়গা হয়ে যাবে,' বিশ্রী শব্দ করে নাক টানল শেরিফ।

'তা ছাড়া ওখানে বেশি দিন রাখবও না তোমাদের,' ওরিগো বলল। 'টাকাগুলো নিয়ে ট্রাকটা মাটি চাপা দিয়ে দেব। ওটা খালি রেখে চাপা দেয়ার কোন মানে হয় না। তাই না?'

'সত্যি কথা বলছে?' ফিসফিস করে কিশোরকে জিজ্ঞেস করল টম। 'নাকি ধাপ্পা?'

'মিথ্যে বলার কোন কারণ নেই,' গম্ভীর মুখে জবাব দিল কিশোর। 'আমাদের সবার মুখ বন্ধ করতে হলে এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই ওদের।'

'মাটি চাপা দিয়েও পার পাবে না,' দাঁতে দাঁত চেপে ওরিগোকে বললেন মিস্টার ব্রিক। 'মরে গেলে ভূত হয়ে তোমার ঘাড় মটকাতে আসব আমি, মনে রেখো।'

'ভূত আর হবে কি? হয়েই তো আছ,' ওরিগো বলল। 'ক্যাসিনোর চাকরি ছাড়ার পর থেকেই তো একটা টেনশনে রেখেছ আমাকে। জিনের মত আসর করে রেখেছ।'

'এ রকম শয়তানি করবে, আগে জানলে শুধু আসর না করে মটকে দিয়ে তারপর ক্ষান্ত হতাম। তবে ভেবো না। এরপর প্রথম সুযোগেই সে-কাজটা করে ফেলব।'

'এ সব আস্ফালন করে এখন আর কোন ফায়দা নেই, এড।'

ওদের তর্কাতর্কির দিকে নজর সবার। রবিনের নজর অন্য দিকে। আড়চোখে বার বার দেখছে জিনিসটা। গাড়ির সামনে দরজা খুলে রেখেছে শেরিফ। ড্রাইভিং সীটের কিনার ঘেঁষে পড়ে আছে একজোড়া হাতকড়া। খুব সাবধানে ধীরে ধীরে সরে যেতে শুরু করল রবিন। সবার অলক্ষে নিচু হয়ে চট করে তুলে নিল জিনিসটা। সরে চলে এল আবার।

রবিন কি করেছে, দেখে ফেলল কিশোর। শান্ত ভঙ্গিতে শেরিফের দিকে ফিরে বলল, 'গাড়ির সীটে ওভাবে পিস্তল ফেলে রাখাটা মোটেও উচিত হয়নি আপনার।'

তাজ্জব হয়ে গেল শেরিফ। 'পিস্তল? কিসের পিস্তল?' ঘুরে দৌড় দিল গাড়ির দিকে।

তার অসাবধানতাটা কাজে লাগাল রবিন। চোখের পলকে কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই কাজটা সেরে ফেলল। হাতকড়ার একটা দিক পরিয়ে দিল শেরিফের ডান হাতে। অন্য দিকটা আটকে ফেলল গাড়ির জানালার ফ্রেমে। পরমুহূর্তে খাপ থেকে টান দিয়ে বের করে আনল পিস্তলটা। বাধা দেয়ার কোন সুযোগই পেল না শেরিফ।

'এই, কি করলে? কি করলে?' ছাড়া পাওয়ার জন্যে ছটফটানো শুরু করল শেরিফ।

'খোলো ওর হাতকড়া!' ধমকে উঠল মর্টিকো। রাইফেল তাক করল রবিনের দিকে। 'পিস্তলটা ফেলো!'

চোখের পলকে তার পেছনে দাঁড়ানো টমের হাতের একটা ক্রাচ শূন্যে উঠে গেল। পরক্ষণে ধাঁ করে নেমে এল মর্টিকোর কোমর বরাবর। প্রচণ্ড আঘাতে বাঁকা হয়ে গেল ওর দেহটা। থামল না টম। আরেক বাড়ি মারল মর্টিকোর হাতে। হাত থেকে রাইফেলটা ফেলে দিল। ততক্ষণে মিস্টার ব্রিকের দিকে শেরিফের পিস্তলটা ছুঁড়ে দিয়েছে রবিন।

রাগে লাল হয়ে গেল ওরিগোর মুখ। চিৎকার করে কিছু বলতে গেল। থেমে গেল নিজের গাড়ির দিকে তাকিয়ে। তার নিজের রাইফেলটা গাড়ির মধ্যে, আওতার বাইরে। ভয় দেখা দিল চোখেমুখে।

হাসি ফুটল মিস্টার ব্রিকের মুখে। 'দাবার ছক পাল্টে গেল ডজ। মনে হচ্ছে ট্রাকের মধ্যে আমাদের ভরে কবর দেয়ার আর সুযোগ হলো না তোমার।'

'শহর থেকে বেরোতে পারোনি এখনও তোমরা,' ওরিগো বলল।

'পারি কিনা দেখই না,' রবিনের দিকে তাকালেন মিস্টার ব্রিক। 'গাড়িতে আরও হ্যান্ডকাফ পাবে। এই দুটোকেও বাঁধো।'

খুশি মনে হাতকড়া বের করতে এগিয়ে গেল রবিন আর কিশোর।

দুটো হাতকড়া বের করে এনে ওরিগোর গাড়ির একপাশের জানালার ফ্রেমে আটকাল তাকে, অন্য পাশে মর্টিকোকে।

'হ্যান্ডকাফগুলোর চাবি কোনখানে?' কিশোর বলল। 'ওদের হাতে পড়া চলবে না কোনমতেই। আবার পিছু নেবে তাহলে।'

'ওই যে,' শেরিফের বেল্ট দেখিয়ে বললেন মিস্টার ব্রিক।

চাবি খুলে আনতে গেল রবিন। ঘুসি মারার জন্যে হাত তুলল শেরিফ। হাতটা চেপে ধরল কিশোর। এই সুযোগে চাবির গোছাটা খুলে নিয়ে পকেটে পুরল রবিন।

'হয়েছে, না?' ওরিগো আর মর্টিকোর রাইফেল দুটো নিয়ে এল কিশোর। 'সবাই ট্রাকে ওঠো।'

'উঠতে পারি,' রিচি বলল, 'যদি কথা দাও, এবার আর জামের ভর্তা বানাবে না।'

'চেষ্টা করব,' কিশোর বলল। 'তবে রাস্তার যা অবস্থা, তাতে ঝাঁকি বাঁচানো সম্ভব হবে না কোন ভাবেই।'

প্রথম বার যারা যারা পেছনে উঠেছিল, তারা আবার উঠলে দরজাটা লাগিয়ে দিল রবিন। আগের মত সামনে এসে বসল সে, কিশোর আর রোজালিন। ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে গীয়ার দিল কিশোর।

'এবার আর ভুল করছি না,' বলল সে। 'বাঁ দিকের রাস্তাটা ধরব এবার।'

'যা ঘটে গেছে তার জন্যে সত্যি খুব দুঃখিত আমি,' রোজালিন বললেন। 'শহর ছেড়ে এত কম বেরিয়েছি, রাস্তাটাই খেয়াল ছিল না। ভুল দিকে চলে গিয়েছিলাম। কিছু মনে করোনি তো তোমরা?'

'তা কেন করব?' জবাব দিল রবিন। 'ভুল হতেই পারে মানুষের। শুরু থেকে বহুত সাহায্য করেছেন আমাদের। মনে করার প্রশ্নই ওঠে না।' কিন্তু একটা প্রশ্ন খচখচ করতেই থাকল তার মনে, ওরা যে ওদিকেই যাবে, জানল কি করে ওরিগোরা?

আরেক বার ট্রাক নিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। বনের মধ্যে সেই রাস্তাটার মাথায় চলে এল, যেখান থেকে দুই ভাগ হয়ে গেছে। বাঁয়ের পথটা ধরল এবার।

এই পথটা আগেরটার চেয়ে মোটামুটি ভাল। কিন্তু ঝাঁকি কমানো গেল না। তারমানে জামের ভর্তাই হচ্ছে এবারেও পেছনে যারা উঠেছে।

ওপরে গাছের ডালপালার চাঁদোয়া সরে গেল। একটা খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসেছে গাড়ি। সামনে আবার ব্রিজ দেখা গেল। একটা কাঠের ব্রিজ।

'আবার ব্রিজ?' ভুরু কুঁচকাল রবিন।

'হ্যাঁ, আবার ব্রিজ,' জবাব দিলেন রোজালিন।

আবার গাড়ি নিয়ে আশেপাশে কেউ অপেক্ষা করছে কিনা দেখে নিল কিশোর। নেই। ব্রিজের কাছে এসে গতি কমাল সে। পুরানো ব্রিজ। ভার সইতে পারবে কিনা কে জানে। একটানে দ্রুত পার হয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

ব্রিজের ওপর ট্রাকের সামনের চাকা তুলে দিল সে।

সঙ্গে সঙ্গে ক্যাঁচকোঁচ, মড়মড়, নানা রকম শব্দ তুলে আর্তনাদ শুরু করে দিল ব্রিজ। দম আটকে ফেলেছে রবিন।

হঠাৎ করে, প্রায় একই সঙ্গে ঘটে গেল যেন অনেকগুলো ঘটনা। বাঁ দিকে হেলে পড়ল ব্রিজটা। কাত হয়ে যাচ্ছে ক্রমে। গাড়িটা বাঁ দিকে সরে গিয়ে কাঠের রেলিঙে ধাক্কা মারল। পলকা পাটকাঠির মত মট্ করে দুই টুকরো হয়ে গেল রেলিঙ।

ব্রিজ থেকে নিচে পড়ে গেল গাড়ি। সরু একটা নদীর মধ্যে।

পনেরো

গালে ঠাণ্ডা পানির স্পর্শে জেগে উঠল কিশোর। কোথায় রয়েছে সে? অনুমান করল, জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল।

বাঁ দিকে কাত হয়ে পড়ে আছে। ভারী কিছু চেপে রয়েছে গায়ের ওপর। মাথা ঘুরিয়ে দেখল, রোজালিন আর রবিন, দু'জনেই তার ওপর পড়ে আছে। ট্রাকের মধ্যেই রয়েছে এখনও। নব্বই ডিগ্রি কাত হয়ে আছে ট্রাকটা। যত ফাঁকফোকর আছে, সবগুলো দিয়ে ঠাণ্ডা পানি ঢুকছে।

'আই, সরো, সরো!' চিৎকার করে বলল সে। থু থু করে মুখে ঢোকা পানি ফেলে দিল। 'ডুবিয়ে মারবে তো আমাকে!'

'কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে···ব্রিজে উঠেছিলাম আমরা···'

'আগে আমার ওপর থেকে সরো!' চিৎকার করে উঠল সে। 'যত তাড়াতাড়ি পারো বেরোও এটা থেকে!'

গুঙিয়ে উঠলেন রোজালিন।

হাত বাড়িয়ে প্যাসেঞ্জার সাইডের জানালাটা খুলে দিল রবিন। ওটা এখন ওদের মাথার ওপরে। জানালার কিনারে নিজেকে টেনে তুলল সে। জানালায় উঠে বসে নিচে হাত বাড়িয়ে টেনে তুলল রোজালিনকে। নিচ থেকে ঠেলে দিয়ে সাহায্য করল কিশোর। জড়িত কণ্ঠে বিড়বিড় করে কি যেন বলছেন রোজালিন।

জানালা দিয়ে বেরিয়ে এল তিনজনেই। লাফ দিয়ে দিয়ে নামল পানিতে। কাত হয়ে পড়ে আছে ট্রাকটা। বিশ ফুট চওড়া নদীটার ঠিক মাঝখানে।

'এখন কি করা?' রবিনের প্রশ্ন। 'এটাকে এখান থেকে তুলব কি করে?'

'আগে ট্রাক থেকে সবাইকে বের করি, তারপর ভাবব।' পেছন দিকে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল কিশোর।

আগের বারের মতই টলতে টলতে বেরিয়ে এল রিচি। ঝপাস করে পড়ে গেল পানিতে। গুঙিয়ে উঠে বলল, 'জামের ভর্তার চেয়ে অনেক অনেক খারাপ হয়েছে এবারকার চালানো।'

তার পেছনে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে বেরিয়ে এলেন মিস্টার ব্রিক ও রেড। টম ক্রাচে ভর দিয়েও আর বেরোতে পারছে না। হাঁটুতে প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছে আবার।

'ঘটনাটা কি?' জিজ্ঞেস করল রেড।

'পুরানো ব্রিজ,' রোজালিন বললেন। 'আয়ু শেষ। ভেঙে পড়েছে।'

'উঁহু,' মাথা নাড়লেন মিস্টার ব্রিক। 'পুরানো হয়েছে বলে যে ভেঙেছে, তা নয়। ভাল করে দেখো।'

ব্রিজটার কাছে এগিয়ে গেলেন তিনি। মাঝখানের বিরাট একটা অংশ ভেঙে গেছে। কাত হয়ে ঝুলে রয়েছে একপাশে। তার রাখার লম্বা, মোটা তক্তাগুলোতে করাতের দাগ দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট।

'কেটে রেখেছিল কেউ,' জায়গাটা দেখিয়ে বললেন মিস্টার ব্রিক। 'ওই দুই ভাইয়েরই কাজ। নিশ্চিত হতে চেয়েছিল, গাড়ি জোগাড় করতে পারলেও যাতে শহর থেকে বেরিয়ে যেতে না পারো।'

এতক্ষণে বুঝতে পারল রবিন, শহরে ঢোকার ব্রিজটার কাছে কেন গাড়ি নিয়ে বসে ছিল ওরিগোরা। ওরা জানত, এদিক দিয়ে পালাতে চাইলে ব্রিজ ভেঙে পানিতে পড়বে। আর যদি ব্রিজটা দেখে পেরোনোর সাহস না হয় তাহলে ফিরে যাবে অন্য রাস্তাটায়, সোজা গিয়ে পড়বে ওদের খপ্পরে।

'কিন্তু ট্রাকটাকে এখন কি করব আমরা?' রবিন বলল। 'টেনে তো আর তোলা যাবে না।'

'হাইওয়ে পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারি,' কিশোর বলল। 'সেখান থেকে কাউকে ধরে শহরে লিফট নিতে পারি।'

'না,' রোজালিন বললেন, 'তাতে অনেক সময় লেগে যাবে। ততক্ষণে হাতকড়া খুলে আমাদের ধরতে ছুটে আসবে শেরিফ।'

'তা ঠিক,' মিস্টার ব্রিক বললেন। 'কেউ না কেউ দেখতে পাবেই ওদের। হাতকড়া খুলে দেবে। ওরিগো আর মর্টিকোকেও ছেড়ে দেবে।'

'তাহলে আর একটাই উপায়,' কিশোর বলল। 'ট্রাকটা নিয়েই যাওয়ার চেষ্টা করা। সোজা করতে পারলে ইঞ্জিন চালু করে ওপরে হয়তো তোলা যাবে।'

'আমি তোমাদের কোন সাহায্যই করতে পারছি না,' বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল টম। 'পা'টার এমন অবস্থা···'

'থাক থাক, তোমার কিছু করা লাগবে না,' রোজালিন বললেন। 'সুযোগ পেলেই আবার ওটা ঠিক করে বেঁধে দেব। তুমি যাও, চুপচাপ বসে থাকোগে।'

খোঁড়াতে খোঁড়াতে বহু কষ্টে নদীর পাড়ে উঠে গেল টম। একটা পাথরের ওপর বসে ক্রাচ দুটো শুইয়ে রাখল দুই পাশে।

বাকি সবাই এসে দাঁড়াল ট্রাকের কাছে। ছাতের যে দিকটা পানিতে পড়ে আছে, সেটার কিনারা চেপে ধরল, যতটা সম্ভব শক্ত করে। তারপর কিশোরের নেতৃত্বে টানতে শুরু করল ওপর দিকে।

নড়ে উঠল ট্রাক। খুব ধীরে ধীরে উঠতে শুরু করল। গায়ের জোরে ঠেলছে সবাই। দুই ফুট উঠে আটকে গেল। শত ঠেলাঠেলি করেও আর ওঠানো গেল না ওটাকে। ব্যথা হয়ে গেল হাত। আস্তে করে ট্রাকটাকে আবার আগের মত শুইয়ে দিতে বাধ্য হলো।

'হবে না,' মিস্টার ব্রিক বললেন। 'আমাদের শক্তিতে কুলোবে না। অন্য সাহায্য দরকার।'

'কোথায় পাওয়া যাবে সেটা?' কিশোর বলল। 'এই গভীর বনের মধ্যে?'

তার প্রশ্নের জবাবেই যেন শোনা গেল ঘোড়ার পায়ের শব্দ। শহরের দিক থেকে ছুটে আসছে। বিপদের সময় সময়মত হাজির হওয়া সিনেমার হিরোর মত

কালো ঘোড়ার পিঠে চড়ে ভাঙা ব্রিজটার মাথায় উদয় হলো শ্রীমান মুসা আমান।

'খাইছে!' চিৎকার করে উঠল সে। 'আমাকে ফেলেই পালাচ্ছিলে তোমরা?'

'আর কি করব?' খানিকটা রাগ দেখিয়েই জবাব দিল রবিন। 'তোমার জন্যে অপেক্ষা করতে গিয়ে সবাই মরব নাকি? তোমার তো পাত্তাই নেই। সেই যে গোলাঘরে ঘোড়া রাখার কথা বলে গেলে!…কোথায় গিয়েছিলে?'

'ঘোড়া রাখতেই গিয়েছিলাম,' জবাব দিল মুসা। 'কিন্তু লোকজন কাউকে না দেখে মনে হলো, ঘোড়াটা যখন আছেই, শহর থেকে বেরোনোর অন্য কোন পথ আছে কিনা দেখে এলে কেমন হয়? ওরিগো কিংবা শেরিফের চোখকে ফাঁকি দিয়ে। ঝড়টা সেদিন সত্যি সত্যি হয়েছিল কিনা, সেটাও জানার ইচ্ছে ছিল।'

'তা কি জানলে? রাস্তা পেয়েছ?'

'নাহ্,' হতাশ ভঙ্গিতে জবাব দিল মুসা। 'তারপর ফিরে এলাম শহরে। শেরিফ আর তার দোস্তদের অবস্থা দেখেই অনুমান করে ফেললাম কি ঘটেছে। জিজ্ঞেস করতে বলে দিল কোন্ দিকে গেছ তোমরা। ওরিগো অবশ্য বার বার পটানোর চেষ্টা করছিল আমাকে। বলছিল, ওদের ছেড়ে দিলে আমাকে ওরা কিছু বলবে না। শহর থেকে নিরাপদে বের করে দিয়ে আসবে।'

'দিলে না কেন?' হাসল কিশোর।

'অত নিরাপত্তার দরকার নেই আমার। নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নিতে পারব, বলে চলে এসেছি।…কিন্তু তোমরা এখানে কি করছ? নদীর মাঝখানে ট্রাক ফেলে দিয়ে ওভাবে দাঁড়িয়ে আছ কেন? দেখে তো মনে হচ্ছে মৌচাকের কাছে মৌমাছি ভিড় করেছে।'

'বাহ্, উপমাও শিখে ফেলেছ দেখি আজকাল। শোনো, আমরা শহর থেকে বেরিয়ে যেতে চাইছি।'

'ওরা আমাদের খুন করে কবর দিয়ে ফেলতে চেয়েছিল,' রবিন জানাল।

'আর এই আনাড়ি ড্রাইভারটা আমাদের পানিতে ফেলে দিয়েছে,' কিশোরকে দেখাল রিচি। 'গাড়ির ব্যাপারে ও একটা কুফা। ধরলেই অঘটন ঘটায়।'

রিচির কথায় কান দিল না মুসা। কিশোরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কারা খুন করতে চেয়েছিল? রাস্তায় যাদের হাতকড়া পরিয়ে রেখে এসেছ?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল রবিন। 'আরও লোক আছে ওদের। তাদেরকেও ঠাণ্ডা করে এসেছি। কষ্ট করতে হয়েছে আরকি।'

'সব কথা পরে শুনো। এসো এখন,' মুসাকে ডাকল কিশোর। 'ট্রাকটা তুলতে হবে।'

লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নামল মুসা। ঢাল বেয়ে নেমে আসতে গেল।

'ঘোড়াটা রেখে আসছ কেন?' কিশোর বলল। 'ওটাকেই তো বেশি দরকার।'

ব্ল্যাক ক্যাটের দিকে ফিরে তাকাল মুসা। 'ও, হ্যাঁ, তাই তো। ভীষণ শক্তি ওর। ঠিকই টেনে তুলে ফেলবে ট্রাকটাকে।'

আবার উঠে এসে ঘোড়ার লাগাম ধরে ওটাকে টেনে নামিয়ে নিয়ে এল নিচে। নদীর ঠাণ্ডা পানিকে তোয়াক্কাই করল না ঘোড়াটা। তারমানে অভ্যস্ত।

টাকার ব্যাগগুলো একটার সঙ্গে আরেকটা বেঁধে রাখার জন্যে মোটা দড়ি

ব্যবহার করা হয়েছে। খুলে আনলেন মিস্টার ব্রিক। রবিন আর কিশোর সেটাকে গাড়িতে বাঁধল। দড়ির আরেক মাথা বাঁধল ঘোড়ার জিনের সঙ্গে। শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগল ঘোড়াটা।

'এখন আমরা ঠেলতে থাকি,' কিশোর বলল, 'আর ও টানুক।'

আগের মত আবার নিচু হয়ে গাড়ির ছাতের নিচের দিকটা চেপে ধরল সবাই। মুসা গিয়ে ঘোড়ায় চাপল। আদেশ দিল, 'আসল খেলটা দেখা তো এবার, ব্ল্যাকি। টেনে তোল্ গাড়িটাকে।'

অবাক কাণ্ড। মুসার কথা যেন মানুষের মতই বুঝতে পারল ঘোড়াটা। সঙ্গে সঙ্গে টানা শুরু করে দিল। বাকি সবার মিলিত শক্তির সঙ্গে যোগ হলো ঘোড়ার শক্তি। আগের বারের চেয়ে অনেক দ্রুত উঠতে লাগল গাড়িটা। এক ফুট…দুই ফুট…তিন…

হঠাৎ জোরে একটা ঝাঁকি দিয়ে চাকার ওপর খাড়া হয়ে গেল ট্রাক।

একযোগে হুল্লোড় করে উঠল সবাই। আনন্দে।

'এখন দেখা যাক ইঞ্জিনটা চালু হয় কিনা,' বলেই লাফ দিয়ে গিয়ে ড্রাইভিং সীটে বসল কিশোর। ইগনিশনে মোচড় দিতেই গুঞ্জন শুরু হলো। কিন্তু স্টার্ট নিল না ইঞ্জিন।

'পানি ঢুকে গেছে,' মুসা বলল।

'আমারও তাই মনে হয়,' রিচিও তার সঙ্গে একমত।

'চেপে ধরে রাখো,' কিশোরকে পরামর্শ দিল মুসা। 'পানি উড়ে গিয়ে তেল ঢুকে যাবে।'

'সেটাই তো করছি,' জবাব দিল কিশোর।

অবশেষে গর্জে উঠল ইঞ্জিন।

আরেক বার আনন্দে হুল্লোড় করে উঠল সবাই।

খোলা দরজার কাছে হেঁটে গেলেন রোজালিন, কিশোর যেদিকটায় বসে আছে। আচমকা হাত বাড়িয়ে কিশোর কিছু বুঝে ওঠার আগেই এক টানে ইগনিশন থেকে খুলে নিয়ে এলেন চাবিটা। হাত ঘুরিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন দূরের ঝোপের মধ্যে।

'এ কি করলেন?' চিৎকার করে উঠল বিস্মিত কিশোর।

সবাই হতবাক।

'সরি,' একটানে পকেট থেকে পিস্তল বের করলেন রোজালিন। শেরিফেরটা। তাঁর কাছে গেল কি করে বুঝতে পারল না কিশোর। হট্টগোলের মাঝে কোন এক ফাঁকে হাতিয়ে নিয়েছেন। 'কোথাও যাচ্ছ না তোমরা। এখানেই অপেক্ষা করতে হবে শেরিফ আর ডজ ওরিগোরা না আসা পর্যন্ত। তারপর ফিরে যেতে হবে মরগান'স কোঅরিতে। ওটাই এখন তোমাদের শেষ ঠিকানা।'

ষোলো

শেরিফ আর ওরিগোদের কাছ থেকে কেড়ে আনা রাইফেলগুলো খুঁজল কিশোরের চোখ। দেখতে পেল। অকেজো হয়ে পড়ে আছে পানির নিচে।

ক্রাচে ভর দিয়ে নিজেকে টেনেটুনে খাড়া করল কোনমতে টম।

'রোজালিন!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'কি বলছেন আপনি? আমরা তো ভেবেছিলাম আপনি আমাদের দলে।'

'দুঃখের বিষয়, ভুল করেছ তোমরা,' জবাব দিলেন রোজালিন। 'ডাকাতির পরিকল্পনার একেবারে শুরু থেকেই আমি এর মধ্যে ছিলাম। বরং সত্যি কথাটা হলো, পরামর্শটা আমিই দিয়েছিলাম ওদের। যখন শুনলাম, ব্যাংকে জর্ডানদের লোক আছে। ট্রাক ভর্তি টাকা নিয়ে অন্য ব্যাংকে যাবে।'

'তাহলে···তাহলে আমাদের সাহায্য করলেন কেন আপনি?' বিমূঢ় হয়ে গেছে কিশোর।

'একজন আহত লোককে নিয়ে এসেছিলে তোমরা আমার কাছে,' রোজালিন বললেন। 'আমি একজন নার্স। বহুকাল আগে শপথ করেছিলাম: যেখানে যে অবস্থায়ই থাকি না কেন, আহতর সেবা করাই হচ্ছে আমার ধর্ম–সেটা ভুলতে পারিনি কখনোই।'

'কিন্তু তাহলে আমাদের পালানোয় সাহায্য করার অভিনয় করলেন কেন?' রবিন জিজ্ঞেস করল। 'ওরিগো ম্যানশনে টমের সঙ্গে আটকে থাকতেই বা গেলেন কেন?'

'সেদিন তোমরা আমার বাড়িতে টমকে নিয়ে ঢোকার আগেই আমার বাড়িতে গিয়েছিল ওরিগো,' রোজালিন বললেন। 'তোমরা যে টাকার ব্যাগটা দেখে ফেলেছ, জানিয়েছিল। তোমাদের সঙ্গে এমন আচরণ করতে বলেছিল, যাতে তোমরা আমাকে বিশ্বাস করো, আমার পক্ষে তোমাদের ওপর নজর রাখা, তোমাদের সব কথা জানার সুবিধে হয়। জানতে পারি, তোমরা কি করছ, কখন শহর ছেড়ে চলে যেতে চাও।'

'অবিশ্বাস্য!' বলে উঠল টম। 'আর আমরা ভেবেছিলাম আপনি বুঝি সত্যি সাহায্য করছেন আমাদের।'

'আমি···আমি ভান করেছি,' টমের চোখে চোখে তাকাতে পারছেন না রোজালিন। 'সবটাই ছিল অভিনয়, সাজানো নাটক, বুঝলে। শহরের মধ্যে তোমাদের আটকে রাখার জন্যে।'

'কিন্তু আমার সঙ্গে যে ভাবে কথা বলেছেন, যা যা বলেছেন, সবই তো খুব আন্তরিক মনে হয়েছিল আমার।'

'ওগুলো তো আর মিথ্যে বলিনি। পুরানো দিনের যুদ্ধের গল্প। কাউকে বলা শুরু করলে আর থামতে পারি না।'

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল কিশোর। সব ক'টা চোখ ঘুরে গেল তার দিকে। হাসল সে। হাসিতে ষড়যন্ত্রের আভাস লক্ষ করল সবাই।

'রোজালিন!' হালকা স্বরে বলতে লাগল কিশোর, 'আপনিও ভুল করেছেন। আমাদের ধাপ্পাবাজিতে পড়েছেন। আপনার কি ধারণা এতগুলো টাকা সত্যি সত্যি পুলিশের হাতে তুলে দিতাম আমরা? আপনি এ সবের মধ্যে নেই, আমাদেরকে সাহায্য করতে রাজি হবেন না ভেবেই মিথ্যে কথা বলেছিলাম। সত্যি কথাটা হলো, আমি, মুসা আর রবিন যুক্তি করেছিলাম, টাকাগুলো গাপ করে দেব। শহর থেকে দূরে রাস্তার মাঝে কোথাও জোর করে আপনাকে নামিয়ে দিয়ে চলে যেতাম আমরা। টাকাগুলো ভাগাভাগি করে নিয়ে হাওয়া হয়ে যেতাম। মুসাকে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলাম দেখতে, রাস্তায় পুলিশ-টুলিশ আছে কিনা। মিস্টার ব্রিক আর রেড এখানে একঘরে হয়ে ছিলেন বলে তাদেরকেও নিয়ে যাচ্ছিলাম আমরা। তাই না, রবিন? রিচি, তুমিও তো জানতে।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থেকে আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল রবিন আর রিচি। হালকা একটা হাসির আভাস ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল মুসার ঠোঁটে। যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার ব্রিক আর রেড। কিন্তু টমের তরফ থেকে কোন রকম সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। যেন কিছুই বুঝতে পারছে না সে। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রোজালিনের দিকে।

'কিন্তু এখন যখন আমরা জেনে গেছি আপনি আসলে আমাদেরই দলে,' বলে যাচ্ছে কিশোর, 'আর কোন সমস্যা নেই। টাকার ভাগ আপনাকেও দেয়া হবে। যেহেতু মূল পরিকল্পনাটা আপনার, ভাগটা বরং বেশিই দেব ভাবছি। যান, অর্ধেকটাই আপনার। এত টাকা ওরিগোরা কোনমতেই দিত না আপনাকে। টাকাটা নিয়ে যদি হাওয়া হয়ে যান আপনি, ওরা কিছুই করতে পারবে না আপনার। পুলিশকে জানাতে গেলে নিজেরাও ফ্যাসাদে পড়বে। কাজেই চুপ করে থাকা ছাড়া উপায় নেই ওদের। বসে বসে খালি হাত কামড়াবে তখন।'

'তোমার কথার বিশ্বাস কি?' রোজালিন বললেন। 'তোমাদেরকে মোটেও খারাপ ছেলে মনে হয়নি আমার। কোন ধরনের খারাপ কাজ তোমাদের দিয়ে হবে না।'

'আপনাকেও তো খারাপ মনে হয় না,' হাসল কিশোর। 'কিন্তু এখন তো দেখা যাচ্ছে আমাদের চেয়ে কোন অংশেই ভাল নন আপনি। বরং আমাদের ওস্তাদ।'

'সত্যি তাহলে তোমাদের সঙ্গে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানাচ্ছ আমাকে? অর্ধেক টাকা দিয়ে দেবে, কথা দিচ্ছ?'

'দিচ্ছি। এখানে সবাই আমরা একদলে। তারমানে সবাই বন্ধু। ঠকানোর কোন প্রশ্নই ওঠে না। অ্যাই, কি বলো তোমরা?'

'তা তো বটেই! তা তো বটেই!' চেঁচিয়ে উঠল রিচি।

'হ্যাঁ,' রবিন বলল।

'তাহলে আর কি? হয়েই তো গেল,' রোজালিনকে বলল কিশোর। 'পিস্তলটা এবার সরান। ট্রাকে উঠুন। সময় থাকতে কেটে পড়ি।'

'জলদি করুন,' রিচি বলল। 'ঠাণ্ডায় জমে আইসক্রীম হয়ে যাচ্ছে আমার পা।'

কিন্তু অত সহজে কিশোরের ফাঁদে পা দিলেন না রোজালিন। 'উঁহু। আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে বেঈমানী করতে পারব না। ওরা না আসা পর্যন্ত এখানেই থাকব আমি।'

'আমরাও তো আপনার বন্ধু,' টম বলল। 'আর কাউকে না হোক, আমাকে তো অন্তত বন্ধু ভাবছেন? আমার সঙ্গে বেঈমানী করবেন কি করে আপনি?'

আগে বাড়তে গেল সে। হাত থেকে পিছলে গেল একটা ভেজা ক্রাচ। আহত পা'টা মাটিতে ঠেকে গিয়ে চাপ লাগতেই গলা ফাটিয়ে এক চিৎকার দিয়ে পড়ে গেল সে।

বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন রোজালিনের দেহে। দৌড় দিলেন টমকে সাহায্য করার জন্যে। মুসার পাশ কাটানোর সময় তাঁর পিস্তল ধরা হাত লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল মুসা। কেড়ে নিল পিস্তলটা। তাতে যেন কোন মাথাব্যথা নেই রোজালিনের। ফিরেও তাকালেন না। একমাত্র লক্ষ্য: টমের কাছে পৌঁছানো।

তিনি কাছে পৌঁছতেই উঠে বসল টম।

থমকে গেলেন রোজালিন। 'এ ভাবে ধোঁকা দিলে!'

'সত্যি বলছি, ধোঁকা দিইনি,' জোরে জোরে মাথা নাড়ল টম। 'আসলেই আমি পড়ে গিয়েছিলাম।'

মিস্টার ব্রিকের হাতে পিস্তলটা তুলে দিতে দিতে মুসা বলল, 'এটা এখন আপনার হাতেই থাক। মনে হয় আর প্রয়োজন হবে না আমাদের।'

ব্রাইটন শহরটা বড় নয়। তবে মরগান'স কোঅরির তুলনায় মেট্রোপলিটান সিটি। পুলিশ স্টেশন আছে, যেখানে সৎ, যোগ্য পুলিশ অফিসাররা দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত। ছোট, কিন্তু আধুনিক হাসপাতাল আছে।

জরুরী বিভাগের দরজার কাছে বসে রইল কিশোর আর রবিন, ডাক্তারের মুখ থেকে টমের অবস্থা শোনার অপেক্ষায়। শেষ বিকেল। সাংঘাতিক ক্লান্ত ওরা। কিন্তু টমের খবর না জেনে হোটেলে যেতে ইচ্ছে করছে না। খানিক দূরে মেয়েকে নিয়ে বেঞ্চে বসে আছেন মিস্টার ব্রিক। দামী একটা ডাক্তারি যন্ত্রের দিকে আগ্রহ রিচির, গভীর মনোযোগে তাকিয়ে আছে। মুসা নেই, খাবারের দোকান খুঁজতে গেছে। পেলে সবার জন্যেই নিয়ে আসবে।

'সাংঘাতিক একটা মেশিন, তাই না!' কিশোরদের মনোযোগ এদিকে ফেরানোর চেষ্টা করল রিচি। 'ভিডিও মনিটরে দেখা যায় রোগীর হৃৎপিণ্ডের গতি, রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা, এবং দেহের অন্যান্য যন্ত্রাংশের আরও নানা রকম মাপজোক।'

'তা তো বুঝলাম,' খোঁচা না দিয়ে পারল না রবিন। মনিটরের এক প্রান্ত

থেকে আরেক প্রান্তে চলে যাওয়া রঙিন রেখাগুলোর কোন রকম কাঁপন নেই। স্থির হয়ে আছে। সেটা দেখিয়ে বলল, 'কিন্তু নড়ে না কেন? মরে গেছে নাকি রোগীটা?'

'আরে দূর!' হতাশ ভঙ্গিতে হাত নাড়ল রিচি। 'কিছুই বোঝো না। রোগীর দেহে লাগানো আছে নাকি এটা? লাগালে, তখন নড়বে।'

আর কারও আগ্রহ এদিকে ফেরানো যাবে না বুঝে একাই আবার যন্ত্রটার দিকে মন দিল রিচি।

দুই গোয়েন্দার কাছে উঠে এলেন মিস্টার ব্রিক। 'অনেকক্ষণ থেকেই ভাবছি, তোমাদের একটা ধন্যবাদ দেয়া উচিত। আমাদের সাহায্য করার জন্যে।'

'ধন্যবাদ?' ভুরু কুঁচকাল কিশোর। 'ধন্যবাদটা তো আমাদের দেয়া উচিত আপনাদের। আপনি আর রেড সাহায্য না করলে মরগান'স কোঅরি থেকে প্রাণ নিয়ে বেরোতে পারতাম না আমরা।'

'আমরা আর কি সাহায্য করলাম? তোমরা প্রথমবার গিয়ে যা করলে, অনেক আগেই সেটা করতে পারা উচিত ছিল আমাদের। ডজ ওরিগোকে বহুদিন আগেই ধরে জেলে পোরা উচিত ছিল।'

'যা-ই বলো,' রেড এসে দাঁড়িয়েছে বাবার পাশে, 'শহরটা থেকে এক ছুতোয় বেরোতে পেরে জানে বেঁচে গেছি আমি। ওর মধ্যে কি মানুষ থাকতে পারে! সারাজীবন ওখানে থাকার কথা ভাবলেই হাত-পা অসাড় হয়ে আসত আমার। কতগুলো শয়তান লোকের আজ্ঞাবহ হয়ে থাকা। ওরিগোর মত একটা ক্রিমিন্যাল আমাদের সবচেয়ে বড় কাস্টোমার, ভাবা যায়? জর্ডানরা যখন আমার দিকে তাকিয়ে বিশ্রী হাসি হাসত, ভয়ে কুঁকড়ে যেতাম।'

মিস্টার ব্রিককে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'এখন কোথায় যাবেন ঠিক করেছেন?'

'আপাতত কোন আত্মীয়র বাড়িতে,' মিস্টার ব্রিক বললেন। 'তারপর কাজের ব্যবস্থা করব। নতুন করে জীবন শুরু করব আমরা আবার। মরগান'স কোঅরির ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মধ্যে আর ঢুকতে যাচ্ছি না!'

বাইরে থেকে ঘরে ঢুকলেন সাদা চুলওয়ালা একজন মানুষ। ওরো ডাউসন, ব্রাইটনের পুলিশ চীফ। ট্রাক ভর্তি টাকা নিয়ে শহরে ঢুকেই আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিল গোয়েন্দারা। ট্রাকটা তাঁর হাতে তুলে দিয়ে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে।

'তোমাদের নিশ্চয় জানার আগ্রহ হচ্ছে,' বললেন তিনি, 'ডজ ওরিগো আর তার দোস্তদের কি হলো? হেলিকপ্টার পাঠিয়ে দিয়েছিলাম মরগান'স কোঅরিতে। ধরে নিয়ে আসছে, জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে।'

'জেলে পাঠাবেন না?' জানতে চাইল রেড।

'তা তো পাঠাবই,' জবাব দিলেন চীফ। 'এফ বি আইকে খবর দেয়া হয়েছে। ওরাও আসছে। এটা এখন ফেডারেল কেসে পরিণত হয়েছে। বাকি জীবনটা জেলেই পচতে হবে ওরিগোর।'

'যেটা ওর উপযুক্ত জায়গা,' মিস্টার ব্রিক বললেন।

দুই হাতে বড় বড় দুটো কাগজের ব্যাগ নিয়ে ঘরে ঢুকল মুসা। ব্যাগ ভর্তি নানা রকম খাবার। হাসিমুখে এগিয়ে এল ওদের দিকে।

'হ্যাঁ,' কিশোরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন চীফ, 'তোমাদের বন্ধুর কি অবস্থা? ডাক্তার কিছু বললেন?'

ঠিক এই সময় ইমার্জেন্সি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল সাদা অ্যাপ্রন পরা একজন ডাক্তারকে।

'অ্যাই যে, হেনরি,' জিজ্ঞেস করলেন চীফ, 'পা ভাঙা ছেলেটার খবর কি? এই যে খানিক আগে নিয়ে আসা হলো?'

'ভাল,' জানালেন ডাক্তার। 'তবে উঠতে সময় লাগবে। ছয় সপ্তা পুরোপুরি বেড রেস্ট, আর আরও দু'মাস সাবধানে হাঁটাহাঁটি। তারপর ফুটবল খেলতে যেতে পারবে।'

'দারুণ খবর,' বলে উঠল মুসা। 'ও খেলতে নামতে না পারলে রকি বীচ হাই স্কুলের টীমটাই কানা হয়ে যেত। ডাক্তার, আপনার খিদে পেয়েছে? অনেক তো খাটাখাটনি করে এলেন। হট ডগ খাবেন?'

হেসে ফেললেন ডাক্তার। 'সত্যি কথাটা বলব? আসলেই খিদে পেয়েছে। খাব। দাও।'

'চলুন, ওখানে গিয়ে বসি,' ঘরের প্রান্তে বড় একটা সোফা দেখাল মুসা।

'এক মিনিট,' হাত তুলল রিচি। 'ডাক্তার হেনরি, তারমানে আপনি বলতে চাইছেন, টমের পা আবার আগের মত হয়ে যাবে? অ্যাপাল্যাশিয়ান ট্রেইলের যেখানে ও আমাদের থামিয়ে দিয়েছে, ওখান থেকে আবার এগোতে পারব?'

ডাক্তার কিছু বলার আগেই খেঁকিয়ে উঠল মুসা, 'জাহান্নামে যাক তোমার অ্যাপাল্যাশিয়ান ট্রেইল। তোমার পাল্লায় পড়ে আবারও শুকনো গরুর মাংস চিবাতে যাই! পাগল পেয়েছ আমাকে?'

মুচকি হাসল কিশোর। রিচিকে বলল, 'তোমার প্রস্তাবে আমার কিন্তু কোন আপত্তি নেই।' রবিনের দিকে তাকাল। 'কি বলো, রবিন?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল রবিন।

'নাহ্, এগুলোকে নিয়ে আর পারা গেল না!' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল মুসা, 'কখনোই ভোটে পারি না এদের সঙ্গে। সব সময় হারায়!'

—: শেষ: —

মরুভূমির আতঙ্ক

(অ্যাডভেঞ্চার সিরিজের 'অনুসন্ধান' বইটির পরিবর্তিত রূপ। উল্লেখ্য, অনুসন্ধানের লেখক জাফর চৌধুরী রকিব হাসানের ছদ্মনাম।)

এক

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে চাকরি নিয়েছে ওমর শরীফ। এয়ার ডিটেকটিভ। কতদিন টিকবে বলা যায় না। এর আগেও বহুবার বহু জায়গায় চাকরি নিয়েছিল সে। বেশিদিন কোথাও টেকেনি।

খবরটা শুনে হেসেছে তিন গোয়েন্দা। ছুটি পাওয়া মাত্র আর দেরি করেনি কিশোর, ওমরভাই কি করে দেখার জন্যে ইংল্যান্ডে চলে এসেছে। ছুটিতে বেড়ানোটাও হয়ে যাবে এই সুযোগে। ওমরের ফ্ল্যাটে উঠেছে। মুসা আর রবিন বাড়ি থেকে ছুটি পায়নি, প্রবল ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তাই আসতে পারেনি।

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের বিশাল বাড়ির আটতলার একটা ঘরে ওমরের অফিস। সেখানে বসা সে আর কিশোর। ননঅফিশিয়্যালি অ্যাসিসট্যান্ট এয়ার ডিটেকটিভ হিসেবে কিশোরকে সহকারী করে নিয়েছে ওমর। সেটা জানেন ওমরের বস্ কমোডোর ব্র্যানডন। আপত্তি তো করেনইনি, কিশোরের বায়োডাটা দেখে হেসে বলেছেন, 'পাসটাস করে সোজা চলে এসো এখানে। এয়ার ডিটেকটিভের চাকরিটা দেয়ার আগাম আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলাম।'

ওমর আর কিশোর কথা বলছে, এই সময় বেজে উঠল ইনটারকম টেলিফোন। হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে নিল ওমর।

'ওমর বলছি, স্যার।' নীরবে শুনল কিছুক্ষণ ওপাশের কথা। তারপর বলল, 'এখুনি আসছি।' কিশোরকে বলল, 'চীফ ডেকেছেন। তুমি বসো।' বেরিয়ে গেল সে।

বারান্দার শেষ মাথায় একটা দরজার সামনে এসে থামল। চৌকাঠে লাগানো নেমপ্লেটে লেখা রয়েছে:
অ্যাসিসটেন্ট কমিশনার

এয়ার কমোডোর জেমস ব্র্যানডন।

ইংল্যান্ডে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের স্পেশাল এয়ার সেকশনের প্রধান তিনি। দরজায় টোকা দিল ওমর। তারপর পাল্লা ঠেলে ভেতরে ঢুকল।

ডেস্কের ওপাশে বসে রয়েছেন এয়ার কমোডোর। বয়েস ষাট পেরিয়েছে অনেক আগেই। মাথার ঠিক মাঝখানে সিঁথি, সিঁথির কাছাকাছি দু'পাশের চুল সাদা, তারপর থেকে কালো। চওড়া কপাল, মোটা নাক, দাঁতে কামড়ে রেখেছেন

বিশাল পাইপ।

'হ্যাঙ্গার থেকে কোন প্লেন চুরি যাওয়ার খবর পেয়েছ?' কোন রকম ভূমিকা না করে জিজ্ঞেস করলেন কমোডোর। 'কিংবা নিখোঁজ?' চোখের ইশারায় বসতে বললেন ওমরকে।

'না, স্যার। তেমন কোন রিপোর্ট তো আসেনি। আপনি পেয়েছেন নাকি?'

'পাইনি, পাব আশা করছিলাম। যাকগে। যে-জন্যে ডেকেছি। স্যার ওয়েসলি থারগ্রুডের নাম শুনেছ? শোনোনি। বেশ, তাহলে জেনে রাখো তিনি এখন ডিপলোম্যাটিক কোর-এ একটা জরুরী দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর বিশ্বাস, আমরা তাঁকে, অর্থাৎ তাঁর এক বন্ধুকে সাহায্য করতে পারব। মানে বুঝতে পারছ তো?'

'পারছি, স্যার। তারমানে কাজটা করতেই হবে আমাদের। তা মিস্টার থারগ্রুডের এই বন্ধুটি কে?'

'ফারনডেলের লর্ড উইলিয়াম কলিনস।'

মৃদু হাসল ওমর। 'বড় ঘরের লোক।'

'চেনো নাকি?'

'এই প্রথম নাম শুনলাম।'

'আমিও শুনেছি আজ সকালে। মিস্টার থারগ্রুডের মুখে।'

'কি কি জানলেন, স্যার?'

'বয়েস বাষট্টি। একটা মেয়ে রেখে বহুদিন আগেই গত হয়েছেন স্ত্রী। সারেতে কলিনস ম্যানরে থাকেন লর্ড। হবি: ভ্রমণ আর শিকার–বিগ গেম হান্টিং। শিকারের ওপর গোটা দুই বইও লিখেছেন। খামখেয়ালি লোক, পাবলিসিটি পছন্দ করেন না, নিঃসঙ্গ।'

'তা ভদ্রলোকের অসুবিধেটা কি?'

'দামী জিনিস চুরি গেছে।'

'কি জিনিস?'

'কতগুলো গহনা আর চুনি পাথর। তার মধ্যে একটার আবার অতীত ইতিহাস রয়েছে।'

'বাড়ি থেকে?'

'সম্ভবত।'

'লোকাল পুলিশ কিছু করতে পারেনি?'

'জানানোই হয়নি ওদেরকে।'

'কেন?'

'খবরের কাগজওয়ালাদের ভয়ে। বললাম না, পাবলিসিটি চান না তিনি।'

'তা আমাদের কি করতে হবে?'

'পাথরগুলো খুঁজে বের করে দিতে হবে বোধহয়। লর্ডের সঙ্গে দেখা হলেই জানতে পারব।'

'দেখা করতে যাচ্ছি নাকি?'

'হ্যাঁ, এখুনি। লর্ডকে ফোন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রাখা হয়েছে। সাড়ে

এগারোটায়।'

হাতঘড়ি দেখল ওমর। 'আর বেশি সময় নেই।'

'ডরকিঙের কাছেই কলিনস ম্যানর। যেতে ঘণ্টাখানেকের বেশি লাগবে না আমাদের।'

'উনি নিজে এখানে এলেই তো পারতেন। এলেন না কেন?'

'কি জানি। হয়তো বাড়িতে এমন কিছু আছে, যেটা আমরা দেখলে চুরির কিনারা করতে সুবিধে হবে, সেজন্যেই যেতে বলেছেন। কিংবা হয়তো লর্ডগিরি দেখাতে চাইছেন। যেতাম না। কিন্তু মিস্টার থারগ্রুড...'

'বুঝেছি। কিন্তু আমরা কেন?'

'মিস্টার থারগ্রুডের ধারণা, এ-কাজের জন্যে আমরাই উপযুক্ত লোক।' দাঁতের ফাঁক থেকে পাইপটা বের করে সেটা দিয়ে টেবিলে আস্তে দু'বার বাড়ি দিলেন কমোডোর। 'লর্ড নাকি বলেছে, প্লেনে করে পালিয়েছে চোর। তাই ভাবলাম, তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাই।'

'প্লেনে করে পালিয়েছে! তারমানে বেশ বড়লোক চোর। চুরিটা হয়েছে কবে?'

'এক মাসও হতে পারে, বেশিও হতে পারে।'

'লর্ড জানালেন কবে?'

'তিন দিন আগে। আলমারি খুলে দেখেন পাথরগুলো নেই।'

'তারমানে বলতে পারবেন না ঠিক কখন চুরি হয়েছে?'

'না।'

'খুঁজে বের করা কঠিন হবে। তিন দিন আগে হঠাৎ দেখার শখ হলো কেন?'

'জানি না। গিয়ে জিজ্ঞেস করব। চলো, বেরোই।'

'ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছে আমার কাছে!' উঠে দাঁড়াল ওমর। 'আপনি রেডি হোন, স্যার। আমি কিশোরকে বলে দিয়ে আসি, বাইরে যাচ্ছি। ও অফিস সামলাক।'

'অফিস আর কি সামলাবে?' কমোডোর বললেন। 'ওকেও নিয়ে নাও না সঙ্গে। ওকে যাচাই করে দেখেছি আমি। মাথাটা খুব পরিষ্কার। বুদ্ধি খুব ভাল খোলে।'

মুচকি হাসল ওমর।

কমোডোরের অফিশিয়াল গাড়িতে করে রওনা হলো তিনজনে। গাড়ি চালাল ওমর। কমোডোর আর কিশোর পেছনের সীটে বসা।

ঘণ্টাখানেক পরেই চওড়া সড়কের পাশে শুরু হলো ঘন গাছপালা।

'নতুন লাগানো হয়নি,' দেখতে দেখতে বলল কিশোর।

'না, অনেক পুরনো,' জবাব দিলেন কমোডোর। 'কয়েক পুরুষ ধরে এখানে আছেন কলিনসরা, সেই ষোলোশো সাল থেকে।'

'কিন্তু এখানে প্লেন নামার জায়গা কোথায়? খোলা জায়গাই তো দেখছি না।'

পুরনো আমলের বিরাট এক বাড়ি দেখা গেল। 'আরিব্বাবা, অনেক বড় তো! এখনও খুব ভাল অবস্থায় রেখেছেন। খরচ আসে কোত্থেকে?' আনমনে বিড়বিড়

করল কিশোর, 'এরকম বাড়ি আজকাল আর খুব একটা চোখে পড়ে না। বেশির ভাগই ধসে গেছে…'

কিশোরের কথাটা শেষ করে দিলেন কমোডোর, 'কিংবা মেরামত করে ফ্ল্যাটবাড়ি অথবা অফিস বানিয়ে ফেলা হয়েছে।'

'লর্ড কলিনস চালাচ্ছেন কিভাবে?'

'ব্যবসা-ট্যাবসা আছে হয়তো কিছু। অনেক সম্পত্তি আছে, হয়তো ফার্ম করেছে,' আন্দাজ করলেন কমোডোর। 'বেশি জমি থাকলে সুবিধে। কিছু বিক্রি করে দিলেই ব্যবসার পুঁজি জোগাড় হয়ে যায়।'

'পাথর বিক্রি করলেও টাকা আসে…' নিচু কণ্ঠে বলল কিশোর।

ঝট করে তার দিকে ফিরলেন কমোডোর। 'কি বললে?'

'অ্যাঁ!…না, কিছু না, স্যার। বলছিলাম, পাথরেরও অনেক দাম, বিক্রি করে ব্যবসার পুঁজি জোগাড় করা যায়।'

ঘড়ি দেখলেন কমোডোর। 'একেবারে ঠিক সময়ে এসেছি। ওমর, রাখো।'

বড় বড় থামওয়ালা গাড়িবারান্দার ছাউনির নিচে এনে গাড়ি থামাল ওমর।

ঘণ্টা বাজালে দরজা খুলে দিল ইউনিফর্ম পরা এক বুড়ো চাকর। কমোডোর নিজের পরিচয় দিতে বলল সে, 'তিনি লাইব্রেরিতে আছেন।' বোঝা গেল, কমোডোর যে আসবেন এ কথা বলা আছে তাকে। 'আসুন, স্যার, আমার সঙ্গে।'

করিডরের দেয়ালে শিকার করা জন্তুর মাথা আর চামড়া দিয়ে সাজানো। শেষ মাথার একটা দরজার কাছে মেহমানদের নিয়ে এল বুড়ো। মৃদু টোকা দিতেই ভেতর থেকে সাড়া এল, 'নিয়ে এসো।'

প্রাচীন ফায়ার প্লেসের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন লর্ড। পায়ের তলায় কার্পেটের ওপর বাঘের চামড়া বিছানো, মাথার ওপরে দেয়ালে বসানো আফ্রিকান মহিষের ছড়ানো শিংওয়ালা মাথা। পুরনো ধাঁচের সোফা দেখিয়ে মেহমানদের বললেন, 'বসুন।' ধারাল কণ্ঠস্বর।

'আমি কমোডোর…'

'জানি জানি,' হাত নাড়লেন লর্ড। 'ওয়েসলি বলেছে।' জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন ওমর আর কিশোরের দিকে।

'এয়ার ডিটেকটিভ ইনসপেক্টর ওমর শরীফ,' পরিচয় করিয়ে দিলেন কমোডোর। 'আমাদের চীফ এভিয়েশন এক্সপার্ট। আর ও কিশোর পাশা। জুনিয়র এয়ার ডিটেকটিভ।'

'বিদেশী?' খুশি হতে পারছেন না খাঁটি ইংরেজ লর্ড, ভুরু কুঁচকে রেখেছেন।

'কেন, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে কি বিদেশী নেই?' হেসে শান্তকণ্ঠে বললেন কমোডোর। 'নিগ্রো আছে, পলিনেশিয়ান আছে…বাংলাদেশীও আছে। ইনসপেক্টর ওমর মিশরীয়, কিশোর বাংলাদেশী, দু'জনেই এখন আমেরিকা আর ইংল্যান্ডেরও নাগরিক। ওমর খুব ভাল পাইলট। রয়্যাল এয়ারফোর্সে চাকরিও করেছে কিছুদিন। আর গোয়েন্দা হিসেবে কিশোরের ভাল রেকর্ড আছে। প্লেন চালাতে পারে। লাইসেন্স পাবে শীঘ্রি।'

তবু খুশি হতে পারছেন না কলিনস।

'দেখুন, লর্ড, ওদের আমি বিশ্বাস করি বলেই নিয়ে এসেছি,' কিছুটা গম্ভীর হলেন কমোডোর। 'বিদেশী হয়েও নিজেদের যোগ্যতায় স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে ঢুকেছে ওরা। ওদের মতো পাইলট আর বুদ্ধিমান নাগরিক যে কোন জাতির গর্ব। আমি তো বলব ওরা যে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে যোগ দিয়েছে, এটা আমাদের সৌভাগ্য…'

'না না, আমি সেকথা বলছি না,' তাড়াতাড়ি হাত নাড়লেন লর্ড। 'আপনি যখন এনেছেন, ভাল বুঝেছেন বলেই এনেছেন। ডোন্ট মাইন্ড, ইয়াং ম্যান। আসলে ওই চুরির ব্যাপারটায় এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছি…তো, এক গ্লাস করে শেরি চলবে, আপনাদের?'

'শুধু এক গেলাস,' হাত তুলল ওমর, 'আমি আর কিশোর মদ খাই না।'

কলিনসকে আর দশজন ইংরেজ লর্ডের মত লাগল না কিশোরের কাছে। প্রায় সাড়ে ছয় ফুট লম্বা, চওড়া কাঁধ–যেন বুনো মোষ। আসল বয়েসের তুলনায় দেখতে কম বয়েস মনে হয়। চুলে পাক ধরেনি। শুধু কুচকুচে কালো দাড়ির এখানে ওখানে কয়েকটা ধূসর হয়ে এসেছে। মুখের চামড়ায় ভাঁজ খুব কমই পড়েছে। লম্বা বাঁকা নাক, শকুনের ঠোঁটের কথা মনে করিয়ে দেয়। ঘন ভুরু, যেন ছোটখাট দুটো ঝোপ।'

ঘরের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে গেছেন লর্ড। ঘরটা লাইব্রেরি, মিউজিয়াম আর আলমারির মিশ্রণ। কাচের পাল্লাওয়ালা প্রতিটি বুককেসের ওপরের দেয়ালে বসানো কোন না কোন ভয়ংকর জানোয়ারের মাথা; বিকট হাঁ করে রয়েছে। এক দিকের দেয়ালে লম্বালম্বি গেঁথে রাখা হয়েছে বিশ ফুট লম্বা এক অ্যানাকোণ্ডা সাপের চামড়া। বোঝা যায় প্রাণীগুলোর এই মর্মান্তিক পরিণতির জন্যে লর্ডই দায়ী। জীবনের বেশ বড় একটা সময় ওই জানোয়ারগুলোকে খুন করার কাজে ব্যয় করেছেন তিনি।

আরেক দিকের দেয়ালে রয়েছে সারি সারি ব্র্যাকেট, সেগুলোতে সাজানো রয়েছে খুনের সরঞ্জামগুলো। নানারকম আগ্নেয়াস্ত্র: শটগান, রাইফেল, পিস্তল, রিভলভার। ভয়ংকর সব জিনিসপত্রের মাঝে এক কোণে যেন জড়োসড়ো হয়ে রয়েছে পুরনো আমলের একটা সাধারণ আয়রন সেফ। তালা-চাবির ব্যাপারে মোটামুটি জ্ঞান আছে, ওরকম একজন ছিঁচকে চোরেরও বড়জোড় পাঁচ মিনিট লাগবে সেফটার তালা খুলতে।

ড্রিংক এল। একটা গেলাস তুলে কমোডোরের দিকে বাড়িয়ে দিলেন লর্ড। কব্জি আর থাবার আকার দেখে মনে হয় কিল মেরে বুনো মোষের মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে দিতে পারেন কলিনস।

'আপনাদেরও ডাকতাম না,' আসল কথায় এলেন লর্ড। 'কেন ডেকেছি জানেন? ওয়েসলি পরামর্শ দিয়েছে। ওকে আমি খুব বিশ্বাস করি, আমার হাতে গোণা কয়েকজন বন্ধুর একজন। আমি পাবলিসিটি পছন্দ করি না। আশা করি, এই চুরির ব্যাপারটা যদ্দূর সম্ভব গোপন রাখবেন। কাগজওয়ালাদের কানে যেন কিছুতেই না যায়। পাথরগুলো ফেরত চাই আমি, চোরটাকে আমার দরকার নেই। তাকে নিয়ে কোন মাথা ব্যথাই নেই আমার। জাহান্নামে যাক সে।'

'কিন্তু ধরা পড়লে তো তাকে কোর্টে নিতেই হবে,' কমোডোর বললেন।

'আমরা ধরে দিতে পারব, কিন্তু দোষ প্রমাণ করা কোর্টের কাজ। আর কোর্টে গেলে জানাজানি হবেই, পত্রিকাওয়ালারা জানবে।'

'সেটা পরে ভাবব। আগে আমার গল্পটা শুনুন। গোড়া থেকেই শুরু করি,' একটা সোফায় বসে পড়লেন লর্ড।

দুই

'বেশ কিছু গহনা আর পাথর ছিল আমার কাছে,' বললেন কলিনস। 'পারিবারিক সূত্রে পেয়েছিলাম। আজকের বাজারে ওগুলোর দাম কত বলতে পারব না। ওই সেফটায় থাকত,' কোণের আলমারিটা দেখালেন তিনি। 'কবে চুরি হয়েছে জানি না। তবে কে চুরি করেছে, জানি।'

'কবে চুরি হয়েছে আন্দাজও করতে পারবেন না?' জিজ্ঞেস করলেন কমোডোর।

'না। ওই সেফ প্রায় খুলিই না আমি। একটা ঘটনা না ঘটলে এখনও জানতাম না।'

'লোকাল পুলিশকে জানানো উচিত ছিল আপনার।'

'মাথা গরম করি না আমি। তাড়াহুড়ো করে কোন কাজ করি না। কিছু করার আগে ভালমত ভেবে নিই।'

'ইনশিওরেন্স কোম্পানি কিন্তু আপত্তি তুলবে।'

'ইনশিওর করা ছিল না ওগুলো।'

অবাক হলো ওমর। 'কেন?'

'কে যায় ঝামেলা করতে? করাতে গেলেই নানারকম নিয়ম-কানুন, এটা করো ওটা করো—আমার এত সময় কোথায়? বেশির ভাগ সময়ই তো বাড়ির বাইরে থাকি।'

'সেফের ভেতরে কিসে ছিল জিনিসগুলো?' জানতে চাইলেন কমোডোর। 'বাক্সে?'

'না। একটা কালো মখমলের কাপড়ে পুঁটুলি বাঁধা। আমার স্ত্রী বেঁচে থাকতেও ওভাবেই রাখত। কালেভদ্রে এক আধবার খুলে পরত। আর আমার মেয়ে পরেইনি কখনও।'

'সেফে ছিল আপনার মেয়ে জানত?' জিজ্ঞেস করল ওমর।

'হ্যাঁ। আমিই একদিন দেখিয়েছিলাম।'

'আপনি বললেন, কে নিয়েছে জানেন?'

'জানি। তবে প্রমাণ নেই।'

'কে?'

'আমার এক কর্মচারী। জন বারনার। বছরখানেক আগে আমার পুরনো কর্মচারী হ্যারি বুড়ো হয়ে মারা যায়। আরেকজন লোক দরকার পড়ল। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিলাম। কয়েকজনই এল। বারনারকে পছন্দ হয়ে গেল আমার। নিয়ে নিলাম।'

'রেফারেন্স এনেছিল নিশ্চয়? কোথায় কোথায় কাজ করেছে, যোগ্যতা...'

টেবিল থেকে পিনে গাঁথা কয়েকটা কাগজ তুলে দেখালেন কলিনস। 'এই যে, এগুলো। সব জাল। প্রত্যেকটা পেপার নকল।'

'কখন জানলেন?'

'দু'দিন আগে।'

'চাকরি দেয়ার আগে চেক করেননি কেন?'

'তখন কি আর জানি নাকি চুরি করবে? তবু, দোষটা আমারই। খোঁজখবর নিয়েই চাকরি দেয়া উচিত ছিল।'

'হ্যাঁ, ভুলই করেছেন,' বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন কমোডোর। 'জিনিসগুলো যে সেফে নেই তিন দিন আগে জানলেন কি করে?'

'সেটা আরেক কাকতালীয় ঘটনা। গত হপ্তায় লন্ডনে গিয়েছিলাম কিছু বাজার-সদাই করতে। বন্ড স্ট্রীটের এক জুয়েলারির দোকানের শো-কেসে দেখলাম একটা আঙটি। মস্ত এক চুনিকে ঘিরে হীরা বসানো। খুব চেনা লাগল জিনিসটা।'

'দোকানদারকে জিজ্ঞেস করেছেন কোথায় পেয়েছে?'

'না। শিওর ছিলাম না, যদি আমার না হয়? তখনও জানি না যে চুরি গেছে। বাড়ি ফিরে সেফ খুলে দেখি শুধু আঙটিই নয়, সবই গেছে।'

'তারপর কি করলেন?'

'ভাবতে বসলাম।'

'ওই দোকানে আর যাননি, জিজ্ঞেস করতে?'

'না। গিয়ে কি করব? প্রমাণ তো করতে পারব না আঙটিটা আমার।'

'বারনার চুরি করেছে, কি করে বুঝলেন?'

'সে তখন নেই। চলে গেছে।'

'কোথায়?'

'কিছু জানি না। মাসখানেক আগে ওর সঙ্গে রাগারাগি করেছিলাম, কথা কাটাকাটি হয়েছিল। তখনই চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। বোধহয় তখনই নিয়ে গেছে জিনিসগুলো।'

'কি জন্যে রাগ করলেন?'

দ্বিধা করলেন লর্ড। 'ব্যাপারটা—কি বলব—এ-কারণেই পুলিশকে জানাতে পারিনি, চাই না খবরের কাগজে উঠুক। কেলেঙ্কারি করে বসেছে আমার মেয়ে।'

'আরেকটু খুলে বলবেন?'

'বারনারের সঙ্গে গোপনে দেখা করত নিনা, মানে আমার মেয়ে। টের পেয়ে চোখ রাখতে লাগলাম ওদের ওপর। সিঁড়িতে ফিসফিস করে কথা বলত। একদিন পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে ঝোপের ভেতরে গিয়ে ঢুকল নিনা। পিছু নিলাম। গিয়ে দেখি বারনারের সঙ্গে কথা বলছে। বাড়ির চাকরের সাথে মালিকের মেয়ের

বিয়ে হয় না, তা নয়, তবে শেষ পর্যন্ত টেকে না ওসব বিয়ে। তা ছাড়া নিনার বিয়ের বয়েসই হয়নি, মাত্র সতেরো।'

'বারনারকে জিজ্ঞেস করেছেন কিছু?'

'করেছি। সে বলেছে, আমি যা ভাবছি তা নাকি নয়।'

'আপনার মেয়ে কি খুব বেশি বাইরে-টাইরে যেত?' জিজ্ঞেস করল ওমর।

'খুবই কম। কেন?'

'না, ভাবছি বাড়িতে বসে থাকলে একা একা লাগে। হয়তো কথা বলার সঙ্গী বানিয়েছিল বারনারকে।'

'শুধু সে-রকম কিছু হলে ভাবতাম না। কথা বলতে বলতেই অনেক দূর গড়িয়ে যায়।'

'কাজেই লোকটাকে তাড়িয়েছেন?'

'না। ওকে শুধু মনে করিয়ে দিয়েছিলাম, সে বাড়ির কাজের লোক। অনেক কিছুই তাকে মানায় না।'

'তারপর?'

'তারপর আর বোধহয় নিনার সঙ্গে কথা বলেনি। একদিন সকালে উঠে দেখি চলে গেছে।'

'সেফে কি ছিল জানত?'

'জানার তো কথা নয়। আমি অন্তত বলিনি। ওর সামনে সেফটা কখনও খুলিওনি।'

'ক'টা চাবি আছে?'

'একটা।'

'কার কাছে থাকে?'

'ওটাতে,' ম্যানটলপীসের ওপর রাখা ছোট একটা হাতির দাঁতের বাক্স দেখালেন লর্ড।

'এখনও আছে?'

'আছে।'

'বারনার জানত?'

'তা-ও জানার কথা না। এ-ঘরে প্রায় ঢুকতই না। এখানে কোন কাজ ছিল না তার।'

'আপনার মেয়ে জানে চাবি কোথায় রাখেন?'

চোখের ওপরের 'ঝোপ-জোড়া' কুঁচকে গেল লর্ডের। 'আমার মেয়েই চুরি করেছে বলতে চান?'

'না, স্যার।'

'কেন করবে বলুন? আমি মারা গেলে ওগুলো তো তারই হত। নিজের জিনিস নিজে কেউ চুরি করে? কিংবা অন্যকে দিয়ে চুরি করায়?'

তা যে করায় না সে-ব্যাপারে কলিনসের সঙ্গে একমত হলো ওমর। 'তাহলে শুধু আপনি আর আপনার মেয়েই জানতেন সেফে কি আছে?'

'হ্যাঁ। আমার তো তাই বিশ্বাস ছিল।'

'পেশাদার অন্য কোন চোরের পক্ষে কি কোনভাবে জানা সম্ভব ছিল?'

'জানলেও পাঁচ বছরের মধ্যে নয়। বছর পাঁচেক আগে একবার পরেছিল আমার স্ত্রী। তারপর তো সে মারাই গেল।'

'হুঁ,' আনমনে বলল ওমর। মুখ তুলল। 'স্যার, শুনলাম, প্লেনে করে নাকি পালিয়েছে চোর?'

'সন্দেহ করছি। বারনার পাইলট ছিল তো।'

ওপরে উঠে গেল ওমরের ভুরু। 'তাই নাকি? ইনটারেসটিং! এখানে যখন থাকত, তখনও প্লেন নিয়ে উড়েছে?'

'মনে হয়, ঠিক বলতে পারব না। চাকরি দেয়ার আগে যখন ইন্টারভিউ নিচ্ছিলাম, তখন বলেছে এভিয়েশন তার হবি। চাকরিতে ঢোকার দু'চার দিন পরেই গিয়ে রোজার ফ্লাইং ক্লাবে যোগ দিয়েছিল। ওটা একটা ফ্লাইং স্কুল, এখান থেকে বারো মাইল দূরে। মোটর সাইকেল নিয়ে চলে যেত ওখানে, ওর সাপ্তাহিক ছুটির দিনে। আমার খানসামা হেনরি বলেছে, বারনারের ঘরে যত বই আছে সব এভিয়েশন, নেভিগেশন আর আদিবাসী মানুষের ওপর লেখা। মনে হয় বইগুলো এখনও ওর ঘরেই আছে। নিয়ে যাওয়ার দরকার মনে করেনি।'

'সময় করতে পারলে দেখব। সূত্র বেরিয়েও যেতে পারে।'

'যখন খুশি দেখতে পারেন। ব্যবস্থা করে দেব। আর কিছু জানতে চান?'

'বারনারের চেহারার বর্ণনা।'

'ছবিই দেখাতে পারি ওর।' টেবিলের ড্রয়ার খুলে চার বাই তিন ইঞ্চি একটা ছবি বের করে দিলেন লর্ড।

অদক্ষ ফটোগ্রাফারের তোলা ছবি। দেখে চোখ বড় বড় হয়ে গেল ওমরের। লম্বা, ছিপছিপে, সুদর্শন এক তরুণের ছবি। পরনে বুশ শার্ট আর শর্টস। হাতের রাইফেলের বাঁট ঠেকে রয়েছে বালিতে। পায়ের কাছে লম্বা হয়ে পড়ে আছে একটা মরা চিতাবাঘ। লোকটার পাশে দাঁড়ানো আরেকজন মানুষ, বেঁটে, ঢোলের মত ফোলা পেটটা দেহের সঙ্গে বড় বেশি বেমানান, পরনে নেংটিও নেই, ছেঁড়া একটুকরো কাপড় দিয়ে কোনমতে লজ্জা ঢেকেছে শুধু।

'এই তাহলে জন বারনার,' তরুণের ছবির ওপর আঙুল রেখে বিড়বিড় করল ওমর।

'নিঃসন্দেহে,' জবাব দিলেন কলিনস।

'ছবিটা ইদানীংকের?'

'দু'তিন বছর আগের।'

'চিতাবাঘটাকে মারার পরে তোলা।'

'দেখে তো তাই মনে হয়।'

'এ রকম একজন লোক চাকরের চাকরি নিতে এসেছিল!'

'আমারও অবাক লেগেছে।'

'এটা যখন দেখাল আপনাকে, কিছু জিজ্ঞেস করেননি?'

'সে আমাকে দেখায়নি। ও চলে যাওয়ার পর পেয়েছি। আমার মেয়ের একটা বইয়ের ভেতর। বইটা তুললাম, ভেতর থেকে পড়ল ছবিটা। কোন্ পর্যন্ত পড়েছে,

ছবিটা দিয়ে তার চিহ্ন রেখেছিল হয়তো।'

'তারপর আপনি এনে রেখে দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'মেয়েকে বলেননি?'

'না।'

'কেন?'

'আমি চাই, ও-ই এসে আমাকে জিজ্ঞেস করুক ছবিটা দেখেছি কিনা। তাহলে তাকে কয়েকটা প্রশ্ন করার সুযোগ পাব। কিন্তু নিনাও ওটার কথা তোলেনি, আমিও কিছু বলিনি।'

'ছবিটা নিশ্চয় বারনার আপনার মেয়েকে দিয়েছিল?'

'বোধহয়। এখন বলুন তো, ছবি দেখে কি মনে হচ্ছে আপনার?'

'চাকরের চাকরি যে কেন নিল বারনার, সেটাই অবাক লাগছে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল ওমর। 'ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে দুনিয়ার অনেক দুর্গম এলাকায় ঘুরেছি আমি, স্যার। বড় হয়ে একা একাও অনেক জায়গায় গেছি। ছবি দেখে আমার যা মনে হচ্ছে, এটা তোলা হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার দুর্গম কোনও জায়গায়। সম্ভবত কালাহারি মরুভূমিতে।'

'কি করে বুঝলেন?'

'সঙ্গের লোকটা একজন বুশম্যান। কালাহারি ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না ওদের।'

'গিয়েছিলেন নাকি ওখানেও?'

'হ্যাঁ। বহুদিন আগে, একবার।'

'ঠিকই ধরেছেন আপনি, মিস্টার ওমর। কালাহারিতেই তোলা হয়েছে ছবিটা। শুধু বুশম্যানই নয়, আরেকটা ব্যাপার লক্ষ করেছেন? চিতাটার গায়ের ফুটকি। ওরকম দাগ শুধু কালাহারির চিতাবাঘেরই থাকে।'

'ওখানে তৃতীয় আরেকজন ছিল তখন, যে ছবিটা তুলেছে। আচ্ছা, বারনার কি কখনও বলেছে আপনাকে, সে আফ্রিকায় গিয়েছিল?'

'না।'

ছবিটা কমোডোরের দিকে বাড়িয়ে দিল ওমর। 'এর সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানতে হবে।'

'দেখুন, আগেই বলেছি,' বললেন কলিনস, 'বারনারের ব্যাপারে, মানে, চোরটার ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহ নেই। আমি শুধু আমার অলংকারগুলো ফেরত চাই।'

'চোরাই মালের সঙ্গে চোরের ব্যাপার জড়িত থাকবেই,' শুকনো কণ্ঠে জবাব দিলেন এয়ার কমোডোর। 'চোরকে ধরার চেষ্টা করব আমরা। তবে কাগজে যাতে আপনার নাম না ওঠে, সেদিকে কড়া নজর রাখা হবে।'

এতক্ষণ চুপচাপ শুনেছে শুধু কিশোর, কিছু বলেনি। কলিনসকে বলল, 'আপনার মেয়ের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই, স্যার, আপনার আপত্তি না থাকলে।' কমোডোরের দিকে তাকাল সম্মতির আশায়, 'একা, শুধু আমি।'

অবাক হলেও মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালেন কমোডোর।

লর্ড বললেন, 'নিশ্চয়। আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু লাভ হবে না। আমাকেই কিছু বলেনি নিনা। কিছুই বের করতে পারবে না ওর মুখ থেকে।'

'কি ঘটেছে নিশ্চয় জানে আপনার মেয়ে।'

'জানে।'

'কথা তাহলে বলতেও পারে। মুখ ফসকে কোন তথ্য···হয়তো বারনারের ছবিটার ব্যাপারে ইনটারেস্টেড হয়ে কিছু বলে ফেলতে পারে। বারনারের ব্যাপারে আপনার চেয়ে বেশি জানা থাকার কথা তার।'

'আমি তোমার সাথে একমত। তবে, জানলেও বলবে না, আমার মেয়েকে তো আমি চিনি। সিটিং রূমে পাবে ওকে, ওখানেই বেশির ভাগ সময় কাটায়।'

'বারনার চলে যাওয়ায় কি মনে কষ্ট পেয়েছে?'

'দেখে তো মনে হয় না। অবাকই লাগে আমার!'

'কোন রকম ডিপ্রেশনে ভুগছে না?'

'না।'

'খবর পাঠান তাকে, প্লীজ, আমি কথা বলতে চাই।'

'খবর পাঠালে সোজা মানা করে দেবে। তারচেয়ে ঢুকে পড়ো, ভদ্রতার খাতিরেও তখন দু'একটা কথা না বলে পারবে না। এসো আমার সঙ্গে।'

তিন

বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভেজানো দরজায় আলতো টোকা দিলেন লর্ড। তারপর পাল্লা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়লেন কিশোরকে নিয়ে। 'এই যে, নিনা। যাক, আছো। এখানেই পাব ভেবেছিলাম। ও কিশোর পাশা, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে এসেছে, জুনিয়র ডিটেকটিভ। তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চায়।' বলেই আর দাঁড়ালেন না লর্ড। মেয়েকে কোনোরকম প্রতিবাদের সুযোগ না দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে আবার ভেজিয়ে দিলেন দরজাটা।

ধীরে ধীরে সামনে এগোল ওমর। সোফায় আধশোয়া হয়ে আছে নিনা কলিনস, হাতে একটা ম্যাগাজিন। বয়েসের তুলনায় শরীর তেমন বাড়েনি, বাবার স্বাস্থ্য পায়নি, পেয়েছে শুধু কালো চুল আর চোখ। সুন্দরী সন্দেহ নেই, তবে তাতে কেমন এক ধরনের রুক্ষতা। পরনে টুইডের স্কার্ট আর গলা বন্ধ পুলওভার। বিন্দুমাত্র নড়ল না। চোখে বিতৃষ্ণা নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে কিশোরের দিকে। কিশোর কিছু বলার আগেই বলে উঠল, 'কটু কথা বলে অপমান করতে চাই না তোমাকে। তবে অযথা সময় নষ্ট করতে এসেছ। আমি তোমাকে কিছুই জানাতে পারব না।'

'পারবেন না, নাকি জানাবেন না?'

'যা খুশি ভাবতে পারো।'
'মিস নিনা, বাবার ওপর খুব রেগে আছেন মনে হচ্ছে?'
'বাবা আমার ওপর আরও বেশি রেগে আছে।'
'মানে?'
'আমাদের কারও জন্যে কারও কোন দরদ নেই।...দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? বসো।'
'থ্যাংক ইউ। কেন এসেছি, নিশ্চয় বুঝতে পারছেন?'
'পারছি।'
'সিরিয়াস একটা ব্যাপার ঘটে গেছে। একেবারে চুপ করে তো থাকতে পারেন না আপনার বাবা।'
'করতে বলেছে কে? যা খুশি করুক। আমার কোন আগ্রহ নেই।'
'কিন্তু জিনিসগুলো তো এক অর্থে আপনারই।'
'ওসব গহনা-টহনা আমার দরকার নেই।'
হাসল ওমর। 'তারমানে আর দশটা সাধারণ মেয়ের মত নন আপনি। গহনার পাগল নন।'
'হয়তো বা। তোমার প্রশ্ন শেষ হয়েছে?'
'না। নিশ্চয় জানেন, জন বারনারকে চোর সন্দেহ করছে আপনার বাবা?'
'ও চুরি করেনি।'
'সেটা প্রমাণ করতে সাহায্য করুন আমাকে। নইলে সারাজীবন চোর অপবাদ রয়ে যাবে তার ঘাড়ে। আমি ওকে দোষারোপ করতে আসিনি, সত্যটা জানতে চাই শুধু।'
'এমন কিছু আছে এই কেসে, কল্পনাই করতে পারবে না তুমি।'
'যেমন?'
'সেটা আমি বলতে যাব কেন? তুমি গোয়েন্দা, তদন্ত করে জেনে নাও।'
'তথ্য গোপন রেখে বাবা এবং বারনার, দু'জনের ওপরই অবিচার করছেন, মিস কলিনস। বারনারকে রক্ষা করার চেষ্টা করছেন আপনি। কেন?'
জবাব নেই।
'একটা কথার জবাব অন্তত দিন। বারনার আর আপনার বন্ধুত্ব কতদূর এগিয়েছিল?'
'অনেক।'
'প্রেম?'
ঠোঁটের কোণে নরম এক চিলতে হাসি অনেকখানি কোমল করে দিল নিনার চেহারার রুক্ষতা। 'প্রেম? তা এক অর্থে বলতে পারো। প্রেম, ভালবাসা তো কত রকমেরই হয়, তাই না? এই যেমন প্রেমিকের সঙ্গে প্রেমিকার প্রেম, ভাইয়ের সঙ্গে বোনের প্রেম, বাবার সঙ্গে মেয়ের প্রেম, সবই তো প্রেম। কিন্তু সব প্রেম কি এক? শুধু একটা তথ্য দিতে পারি তোমাকে, বারনারের সঙ্গে আমার বিয়ে কখনোই সম্ভব নয়।'
'ও কি বিবাহিত?'

'না।'
'আপনার বলার ঢঙে রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি।'
'জীবনটাই তো রহস্যময়।'
'বড়দের মত কথা বলছেন,' আবার হাসল কিশোর।
'আমাকে কি খুব ছোট মনে হচ্ছে?'
'বারনার এখন কোথায়, জানেন?'
'না।'
'প্লীজ, মিস কলিনস। জানলে দয়া করে বলুন। ঝামেলা অনেক কমবে তাতে। আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন, আপনার জীবন থেকে পুরোপুরি সরে গেছে বারনার?'
'তোমাকে কিছুই বিশ্বাস করতে বলছি না আমি।'
'খুব বন্ধুত্ব ছিল আপনাদের। ওর অতীত জীবন সম্পর্কে নিশ্চয় কিছু বলেছে?'
'অনেক, অনেক কিছু।'
'আফ্রিকায় যে ছিল, সেসব কথাও?'
চোখ বড় বড় হয়ে গেল নিনার। 'আফ্রিকার কথা তো কিছু বলিনি আমি!'
অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়েছিল কিশোর। বুঝে গেল জায়গামত টোকা দিয়েছে। 'না, আমিই বললাম।'
'কেন, আফ্রিকার কথা বললে কেন?'
'কারণ, কোথাও না কোথাও সে নিশ্চয় ছিল আগে, আর সেটা ইংল্যান্ডে নয়। চাকরি নিতে আসার সময় যেসব রেফারেন্স নিয়ে এসেছিল, সব জাল, জানা আছে আপনার।'
'জানতাম না। এখন তোমার কথায় জানলাম।'
'এখানে আসার নিশ্চয় কোন বিশেষ কারণ ছিল তার?'
'থাকতে পারে।'
'বোধহয় জানত লাইব্রেরির সেফের মধ্যে কি আছে?'
'এইবার সত্যি বিরক্তি লাগছে, কিশোর! আমি থট-রীডার নই যে লোকের মনের কথা জানব। আমাকে ফাঁদে ফেলে কথা আদায়ের চেষ্টা করছো?'
'সরি, মিস কলিনস। বোঝার চেষ্টা করুন, প্লীজ, আমি আমার দায়িত্ব পালন করছি মাত্র। বুঝতে পারছি, আপনি আমাকে সাহায্য করবেন না, করতে চান না। তবে আপনাকেও বলি, রহস্য পেলে সেটার জবাব খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত আমার স্বস্তি থাকে না, যেভাবেই হোক এই সত্যটাও আমি খুঁজে বের করবই। অপরাধ করা আর অপরাধীকে সাহায্য করা, দুটোই সমান অন্যায়। পরে আমাকে দোষ দিতে পারবেন না।'
'দেব না।'
'গহনাগুলো কি আপনিই সরিয়েছেন?'
'না।'
উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'বেশ, যাচ্ছি।' দ্বিধা করল। 'তাহলে এই আপনার

শেষ কথা?'
'কিসের শেষ কথা?'
'বারনারকে বাঁচানোর চেষ্টা কি করেই যাবেন?'
'বন্ধুর সাথে কেউ বেঈমানী করে, কিশোর? তুমি করবে?'
'বেঈমানী করলে যদি বন্ধুর ভাল হয়, তাহলে অবশ্যই করব,' দরজার দিকে রওনা হলো কিশোর।
'কি করবে বলে গেলে না কিন্তু?' জিজ্ঞেস করল নিনা।
ফিরে তাকাল কিশোর। 'বারনারকে খুঁজে বের করব।'
'নিরাশ হবে।'
'আপনি অবাক হতে পারেন,' বলে আর দাঁড়াল না কিশোর, বেরিয়ে চলে এল। লাইব্রেরিতে ফিরল।
'লাভ কিছু হলো?' জানতে চাইলেন লর্ড।
'একেবারে হয়নি, একথা বলব না, স্যার।'
'কি কি বলল?'
'প্রায় কিছুই না।'
'শয়তানটার প্রেমে পড়েছে তো?'
'আমার মনে হয় না।'
'তাহলে তার কথা কিছু বলতে চায় না কেন?'
'জানি না। নিশ্চয় কোন কারণ আছে। দু'জনের মাঝে হয়তো কোনও ধরনের চুক্তি হয়েছে, কথা দেয়া-টেয়া হয়েছে, যে জন্যে মুখ খুলছে না আপনার মেয়ে। তবে অনেক কিছু জানে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।'
'পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করার কথা ভাবছে না তো?'
'কি ভাবছে সেটা আপনার মেয়েই জানে। তবে আমাকে বলল বারনারের সঙ্গে তার বিয়ে নাকি কোনমতেই সম্ভব নয়।'
'কেন নয়?'
'জানি না। হতে পারে, বারনার বিবাহিত। আপনার মেয়ে অবশ্য স্বীকার করল না সেকথা।'
'কোথায় গেছে, জানে?'
'বোধহয়।'
'ছবিটার কথা বলেছ ওকে?'
'না।'
উঠে পায়চারি শুরু করলেন লর্ড। 'ভাবছি, চুপ হয়ে যাব কিনা? খোঁজা বাদ দিয়ে দেব!'
উঠে গিয়ে কলিনসের মুখোমুখি দাঁড়ালেন কমোডোর। 'সেটা উচিত হবে না। আর করতে পারবেন বলেও মনে হয় না।'
'কেন নয়?'
'এখন আর ব্যাপারটা শুধু আপনার হাতে নেই, লর্ড। অপরাধের কথাটা পুলিশকে জানিয়ে ফেলেছেন। অ্যাকশন নিতেই হবে-এখন আমাদের।'

'আমি কোন চার্জ না করলেও?'
'হ্যাঁ।'
'কি অ্যাকশন নেবেন?'
'তদন্ত চালিয়ে যাব। আর তাতে অবশ্যই আপনার সহযোগিতা আশা করব। প্রথমেই জানার চেষ্টা করব, আপনার কোন গহনা কারও কাছে বিক্রি হয়েছে কিনা। বারনার হয়তো এদেশ থেকে পালিয়ে গেছে। তাকে খুঁজে বের করাও হয়তো কঠিন হবে। কিন্তু যদি খুঁজে পাই, আর তার কাছে গহনাগুলো থাকে, ওগুলো তো ফেরত আনতে পারব। আর আপনি তো তাই চান, তাই না?'
'হ্যাঁ। আমি শুধু চাই আমার গহনাগুলো। বারনার জাহান্নামে যাক।'
'ধরে নিলাম সে-ই চোর,' পেছন থেকে বলল ওমর। 'অবশ্য না-ও হতে পারে, ধরে নিলাম আর কি। তবে, চোর হোক আর না হোক, ওর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করবে আপনার মেয়ে। আপনার চিঠি আসে কিভাবে?'
'গাঁয়ের পোস্টম্যান ডেলিভারি দিয়ে যায়।'
'কার হাতে?'
'এসে ঘণ্টা বাজায়। যে খোলে তার হাতে দেয়। আমার চাকরানী, কিংবা খানসামা।'
'মিস কলিনস কখনও খোলে না?'
'মনে হয় না।'
'আপনি?'
'না।'
'কিছুদিনের জন্যে আপনি যদি খোলেন, ভাল হয়। সরাসরি যাতে চিঠিগুলো আপনার হাতে পড়ে।'
'নিনার কাছে বারনার চিঠি দেবে ভাবছেন?'
'দিতেও পারে।'
'হুঁ, আপনার উদ্দেশ্য বুঝতে পারছি,' ধীরে ধীরে বললেন লর্ড। 'খামের ওপর স্ট্যাম্পের ছাপ দেখে…'
'হ্যাঁ। আরেকটা ব্যাপার, বারনার কোথায় আছে আপনার মেয়ের জানা থাকলে সে-ও হয়তো চিঠি লিখে এখানকার খবরাখবর জানানোর চেষ্টা করবে। সাবধান করে দেবে, পুলিশকে জানিয়েছেন আপনি। এর অর্থ বুঝতে পারছেন? এই চুরির সঙ্গে সরাসরি জড়িয়ে পড়ছে আপনার মেয়ে। আসামী হয়ে যাচ্ছে।'
'নাহ্, কি করব বুঝতে পারছি না!' হতাশ ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন লর্ড। 'তার নিজের জিনিস কেন একটা চোরকে চুরি করতে দিল নিনা?…বেশ, আমি খেয়াল রাখব। চিঠি আমিই নেব পোস্টম্যানের কাছ থেকে।'
'বলা যায় না, আপনার মেয়েও সেই চেষ্টা করতে পারে। শুনেটুনে যা মনে হচ্ছে, পাকা; বয়েসের তুলনায় একটু বেশিই পাকা, কিছু মনে করবেন না। এই ঠিকানায় বারনারকে চিঠি লিখতে বারণ করে দেয়াটাই স্বাভাবিক। তবু, বলা যায় না, সব দিকেই নজর রাখতে হবে।'
'আর কিছু জানার আছে আমার কাছে?'

'লন্ডনের দোকানটার নাম কি?'
'হ্যারিসন অ্যান্ড হ্যারিসন।'
'ওখানে আঙটিটা দেখেই বাড়ি চলে এলেন, এবং সেফ খুলে দেখলেন জিনিসগুলো নেই?'
'হ্যাঁ।'
'চাবিটা বাক্সেই ছিল?'
'ছিল। নাহলে আমিও সেফ খুলতে পারতাম না।'
'চাবিটা সরানো হয়েছে, এমন কোন চিহ্ন নিশ্চয় দেখতে পাননি?'
'না।'
'আর কোন প্রশ্ন নেই। ভাল কথা ছবিটা নিয়ে যেতে পারি? কপি করেই আবার ফেরত দেব।'
'নিয়ে যান।'
কিশোরের দিকে তাকাল ওমর। 'তোমার কোন প্রশ্ন আছে?'
'না।'
কমোডোরের দিকে ফিরল ওমর। 'হয়েছে, স্যার। এবার যাওয়া যায়।'
'লর্ড কলিনস,' কমোডোর বললেন, 'নতুন আর কিছু ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে জানাবেন আমাদের।'
'নিশ্চয়। সব সময় আমার সাহায্য পাবেন আপনারা। তবে আবারও মনে করিয়ে দিচ্ছি, খবরের কাগজওয়ালারা...'
'ভাববেন না । ওঁরা জানবে না।'
দু'জনকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন লর্ড।
মেইনরোডে বেরিয়ে এল পুলিশ কার। পথের ধারে একটা বড় পার্কমত জায়গায় ওক গাছ কাটছে কয়েকজন লোক।
কিশোরের কৌতূহল লক্ষ করে কমোডোর জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার?'
'তেমন কিছু না, স্যার। বোধহয়, টাকার টান পড়েছে লর্ডের। নইলে তাঁর পজিশনের একজন লোক গাছ বিক্রি শুরু করতেন না।'
'হুম!' একমত হলেন কমোডোর। 'তো, কি বুঝলে?'
'বেশি কিছু না। বাপ-মেয়ের কেউ একজন মিথ্যা বলছে। কিংবা দু'জনেই।'
অবাক হয়ে তাকালেন কমোডোর। 'মেয়ে নাহয় বলল, তার কারণ আছে। বাপ বলতে যাবেন কেন? জিনিসগুলো কি ফেরত চান না?'
'তা চান। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা কেমন ঢেকে রাখতে চাইছেন, দেখলেন না? কেন?'
'বলো?'
'কিছু একটা গোপন করেছেন আমাদের কাছেও। নোংরা কিছু। জানাজানি হয়ে যাওয়ার ভয়ে।'
'মেয়ের নামে স্ক্যান্ডাল হোক, কোনও বাপ চায় সেটা?'.
'তা চায় না।'
ওমরকে জিজ্ঞেস করলেন কমোডোর, 'আর কোথাও যেতে চাও?'

'খিদে পেয়েছে, স্যার। কোথাও থেমে লাঞ্চ সেরে নেব। তারপর আপনি অফিসে চলে যান, আমি কিশোরকে নিয়ে যাব রোজার ফ্লাইং ক্লাবে। আমার বন্ধু ডুমনির কথা মনে আছে, স্যার, আপনার? রোজার ক্লাবের মালিক এখন সে।'
'খোঁজ নিতে যাবে তো?'
'হ্যাঁ, স্যার।'
'তারপর?'
'হ্যারিসন অ্যান্ড হ্যারিসন কোম্পানিতে যাব একবার।'
'আঙটিটা বিক্রি করে ফেলেছে কিনা দেখতে চাও নিশ্চয়? বেশ, যেয়ো। আরও কিছু বিক্রি করেছে কিনা জিজ্ঞেস করো। কি কি চুরি হয়েছে, আমাকে লিস্ট দিয়েছেন লর্ড। তুমি যখন ওঁর মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলে।' কিশোরের দিকে তাকালেন কমোডোর। 'আচ্ছা, মেয়েটার সম্পর্কে কি ধারণা হয়েছে তোমার?'
'বয়েসের তুলনায় বেশি পাকা, এ ছাড়া ভালই। বাপের সঙ্গে বনিবনা নেই। একটা কথা না বলে পারছি না, লর্ডকে মোটেও ভাল লাগল না আমার। ওর জন্যে কাজ করতেই ইচ্ছে হচ্ছে না। মরা জানোয়ারের মাথা আর চামড়া দিয়ে সারা বাড়ি ভরে রেখেছেন। যেন বোঝাতে চান: আমি খুব ভয়ংকর লোক, দেখেছ কি করেছি!'
'ওসব আমাদের মাথা ব্যথা নয়। ওঁর চোরাই মাল বের করে দিতে পারলেই আমরা খালাস।'
'কাজটা এত সহজ হবে না, স্যার। বারনারকে খুঁজে বের করাই হবে মুশকিল। যদি ইংল্যান্ডের বাইরে চলে গিয়ে থাকে কি করে ফিরিয়ে আনব?'
'আগে ওর খোঁজ তো মিলুক, তারপর ভাবব।' গাঁয়ের বাইরে শপ-কাম-পোস্ট-অফিসের সামনে ওমরকে গাড়ি থামাতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন কমোডোর, 'এখানে কি?'
'দেরি হবে না, স্যার, আসছি। অফিসটা যে চালায় তার সঙ্গে কথা বলে আসি।'
পাঁচ মিনিট পরেই ফিরে এল ওমর। মুখে মৃদু হাসি। 'বারনার আর নিনার মাঝে চিঠি বিনিময় হলে এই পোস্ট অফিসের মাধ্যমেই হবে। বলা তো যায় না, বাপের চেয়ে মেয়ে যদি বেশি চালাক হয়ে থাকে!'

চার

লাঞ্চ করার জন্যে একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকল তিনজনে। ঢুকেই অফিসে ফোন করল ওমর, কমোডোরের জন্যে একটা গাড়ি পাঠাতে বলল।
'পোস্ট অফিসে কি করে এলে তুমি, খুলে বলো তো?' জিজ্ঞেস করলেন

কমোডোর।

'বিদেশী পোস্ট অফিসের ছাপ মারা কোন চিঠি ইদানীং নজরে পড়েছে কিনা জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিলাম। ওটা সাব পোস্ট অফিস, ইনচার্জ এক মহিলা। লর্ড কিংবা তার মেয়ের কথা কিছু বলিনি তাকে। ম্যানরের কাছাকাছি যেতে সাহস করবে না বারনার, ফোনও করবে না। কারণ, কে রিসিভার তুলবে বলা যায় না। কিন্তু যোগাযোগ করবেই।'

'ঠিক,' একমত হলো কিশোর। 'চিরকালের জন্যে বিদায় জানায়নি ওরা একে অন্যকে।'

'কিভাবে বুঝলে?'

'মেয়েটার ব্যবহারে। এ রকম একটা ঘটনার পর অস্থির হয়ে থাকা উচিত ছিল, অথচ একেবারে স্বাভাবিক। তার মানে তার জানা আছে বারনার যোগাযোগ করবে।'

'হুঁ!' ওমরকে জিজ্ঞেস করলেন কমোডোর, 'কোনও খামে বিদেশী স্ট্যাম্প কিংবা ছাপ দেখেছে পোস্টমিস্ট্রেস?'

'একটা দেখেছে। গ্রামের কোন এক মিসেস মিলার-এর নামে এসেছে। কোন্ দেশী স্ট্যাম্প বলতে পারল না। খেয়াল করেনি। করার দরকারও মনে করেনি। কত চিঠিই তো আসে-যায়।'

'খেয়াল রাখার কথা বলে এসেছ?'

'না। বলেছি আবার ফোন করব।'

'এত কথা জানতে চাও কেন জিজ্ঞেস করেনি?'

'করেছে। বলেছি, আমি পুলিশ অফিসার। তবে কার ব্যাপারে কি তদন্ত করছি কিছু বলিনি।'

'তাহলে, তোমার বিশ্বাস, বারনার আর নিনা যোগাযোগ করবেই। আর এই সামান্য সূত্রের ওপর ভরসা করেই...'

'এ ছাড়া আর কি করতে পারি? কি করে জানব বারনার কোথায় আছে?'

খেতে খেতে আলোচনা চলল।

গাড়ি নিয়ে হাজির হলো জিম হল নামে এক উনিশ বছরের এক উচ্ছল তরুণ। স্টাফ পাইলট। বিল চুকিয়ে দিয়ে হলের সঙ্গে অফিসে রওনা হয়ে গেলেন কমোডোর।

'আমরা কোথায় যাচ্ছি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'মীলিং অ্যারোড্রোম।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ চিন্তা করার পর কিশোর বলল, 'সব কিছুই কেমন যেন সাজানো মনে হচ্ছে ওমরভাই। মেয়ের সঙ্গে চাকরের প্রেম, চাকরকে মনিবের ধমকানো, তারপর গহনা নিয়ে পালানো...'

'তা ঠিক,' ওমর বলল। 'কোথায় যেন একটা খটকা রয়েছে। বাপ-মেয়ে দু'জনেই কিছু একটা গোপন রাখার চেষ্টা করছে।'

'তারমানে বারনারকে ছাড়া হবে না। তাকে দরকারই?'

'হ্যাঁ।'

'মীলিঙে পাবেন ভাবছেন?'

'না।'

'তাহলে যাচ্ছেন কেন?'

'ওর সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়ার জন্যে। হয়তো কিছু জানতে পারব। ওখান থেকে প্লেনটেন নিয়ে পালিয়েছে কিনা কে জানে। কলিনস ম্যানরের সবচেয়ে কাছের অ্যারোড্রোম ওটাই।'

'পালায়নি। তাহলে আমাদের কাছে খবর আসত।'

'আমিও সেকথা ভেবেছি। তবু, গিয়ে দেখি।'

মোড় নিয়ে আরও খানিকদূর এগোল সরু পথটা। শেষ মাথায় বিশাল খোলা জায়গা। কয়েকটা বিল্ডিং আছে, আর দুটো হ্যাঙ্গার। একটা টাইগার মথ বিমান মেরামত করছে দু'জন লোক। তাদের একজন নিগ্রো, মাঝারি উচ্চতা, মস্ত গোঁফ। গাড়ির আওয়াজে ফিরে তাকাল। ওমরকে নামতে দেখে চওড়া হাসি ফুটল মুখে। 'আরি, আমাদের ওমর আলী যে! পথ ভুল করে নাকি রে?'

'কতবার না বলেছি আমার নাম ওমর শরীফ...'

'ওই হলো। ওমরটা তো ঠিক আছে। হঠাৎ উদয় হলি কেন? হারিয়েছিস নাকি কিছু?'

'না। তুই?'

'না, কিছু হারাইনি তো!'

'গুড। এটাই জানতে এসেছিলাম।...ও হ্যাঁ, এ-হলো আমাদের জুনিয়র ডিটেকটিভ কিশোর হল। কিশোর, ও আমার শত্রু, ড্যানি রোজার। হারামীর একশেষ।'

হা হা করে প্রাণখোলা হাসি হাসল নিগ্রো। 'সময় মতই এসেছিস, দোস্ত। কাজ করতে করতে একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছি। চল এক গেলাস...না না, তুই তো আবার খাস না। ঠিক আছে, তোর জন্যে কোক। এই মিয়া কিশোর, তুমিও কি নিরামিষ নাকি?'

'হ্যাঁ, ভাই,' হেসে মাথা নাড়ল কিশোর, 'আপনাকে নিরাশ করার জন্যে দুঃখিত।'

জোরে কিশোরের কাঁধে এক চাপড় মেরে আন্তরিকতা প্রকাশ করল ড্যানি। 'বুদ্ধিমান ছেলে।'

ক্যান্টিনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ওমরকে জিজ্ঞেস করল সে। "খুলে বল তো-এবার, কিজন্যে এসেছিস? আমি কি হারিয়েছি, ভেবেছিলি?'

'একটা অ্যারোপ্লেন।'

'না, হারায়নি বললামই তো। আছেই মোটে দুটো। একটা হারালেই হার্টফেল করতাম। দিনকাল ভাল না। এত খাটি, তা-ও টাকা আসে না।'

ক্যান্টিনে ঢুকল ওরা। কোণের দিকের একটা টেবিলে বসল। ড্রিংকের অর্ডার দিল ড্যানি। ওমরের দিকে ফিরল, 'চোরটা কে?'

'তোর ক্লাবের একজন মেম্বার। জন বারনার।'

'ছিল। এখন নেই।'

'কোথায় গেছে?'
'জানি না।'
'কিছু জানিস না?'
'নাহ্।'
'ওকে উড়তে শিখিয়েছিস নিশ্চয়?'
'হ্যাঁ।'
'কেমন শিখেছে?'
'আমার ওস্তাদ হয়ে গেছে। বর্ন পাইলট। একেবারে জাত-বৈমানিক।'
'গেছে কোথায় কিছুই বলতে পারবি না?'
এক মুহূর্ত ভাবল ড্যানি। 'অনেক দূরে কোথাও। যাওয়ার পর আর কোন খোঁজ পাইনি।'
ভুরু তুলল ওমর। 'তবে যে বললি প্লেন হারাসনি?'
'না, হারাইনি।'
'তাহলে কি নিয়ে গেল?'
'ওর নিজের প্লেন।'
ভুরু আরও কুঁচকে গেল ওমরের। 'নিজের!'
'হ্যাঁ। চমকে উঠলি যে?'
'অ্যাঁ!··;:না, ও কিছু না। খুলে বলবি?'
'বলার তেমন কিছু নেই। কিছু দিন আগে একটা নতুন টুইন এঞ্জিনড মারটিন বিমান কিনেছিলাম। ভাড়া দেয়ার জন্যে। দিন কয়েক ওটা ওড়াল বারনার। পছন্দ হয়ে গেল। তারপর ওটা নিয়ে রওনা হয়ে গেল দূরে কোথাও।'
'সেই কোথাওটা কোথায়?'
'মনে হয় দক্ষিণ আফ্রিকায়, আমি শিওর না। ও একবার বলেছিল, হালকা প্লেন নিয়ে কেপ টাউনে পাড়ি জমাতে চায়। কাগজ-পত্র জোগাড় করতে লাগল, ওকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম, রাজি হলো না। বলল নিজেই সব করে নিতে পারবে। প্লেনটায় বাড়তি একটা ট্যাংক লাগিয়ে নিল। তারপর এক সকালে তার মোটর বাইক নিয়ে হাজির। বাইকটা ফেলে রেখে প্লেন নিয়ে চলে গেল। ব্যস, গেল তো গেল, আর কোন খবর নেই। বাইকটা ফেলে গেছে তো, সে-জন্যে ভাবছি আবার ফিরে আসবে।'
'সাথে মালপত্র কি নিয়েছে?'
'একটা সাধারণ ক্যানভাসের ব্যাগ। প্লেনে করে যাওয়ার সময় লোকে যা নেয়।'
'টাকাটুকা পাবি ওর কাছে?'
'একটা পয়সাও না। যাওয়ার আগে সব বিল চুকিয়ে দিয়ে গেছে। অনেক টাকা আছে মনে হলো।'
'মারটিনটার দাম দিয়েছে নিশ্চয়?'
'নগদ। কড়কড়ে নোট।'
'অবাক হোসনি?'

'কেন?'
ড্যানির প্রশ্নের জবাব দিল না ওমর। 'প্লেনটার জন্যে কত দিয়েছে?'
'বিশ হাজার। বাড়তি ট্যাংক, ট্যাংক ভর্তি তেল, সব কিছুর দাম নগদ দিয়েছে। ঘটনাটা কি, বল তো?'
একথারও জবাব দিল না ওমর। 'ও কোথায় থাকত, জানিস?'
'জানব না কেন? ভর্তি হওয়ার সময়ই নাম-ঠিকানা দিয়েছে। কাজেই এক লর্ডের বাড়িতে থাকত, কলিনস ম্যানর।'
'ম্যানরটার ব্যাপারে কিছু জানিস?'
'নাহ্,' মাথা নাড়ল ড্যানি। 'এত প্রশ্ন করছিস কেন? বারনার খারাপ কিছু করেছে?'
'এখনও শিওর না। শুধু এটুকু বলতে পারি, হঠাৎ করে ম্যানর ছেড়ে চলে গেছে সে। বাড়ির লোকেরা ভাবনায় পড়ে গেছে।'
সবজান্তার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ড্যানি। 'বাড়ির লোক মানে কি? ওর গার্ল ফ্রেন্ডটা তো? পড়বেই। হয়তো ভাবছে অ্যাক্সিডেন্ট করে কোথাও মরে পড়ে আছে তার প্রেমিক।'
'গার্ল ফ্রেন্ড?'
'মোটর বাইকের পেছনে বসিয়ে প্রায়ই একটা মেয়েকে নিয়ে আসত এখানে।'
'মেয়েটা রোগাটে। বয়েস সতেরো-আঠারো, তাই না?'
'হ্যাঁ। চিনিস নাকি?'
'ঠিক চিনি বলাটা ভুল হবে। একটু আগে ওদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। মেয়েটাও কি উড়ত?'
'একবার কি ওকে দু'বার 'প্লেনে তুলে নিয়েছিল বারনার। কেন, দোষ করেছে?'
'না, বান্ধবীকে প্লেনে তুলেছে, দোষ আর কি?' ড্রিংক শেষ, উঠে দাঁড়াল ওমর। 'যাই, সময় পেলে আবার দেখা করব। ও, আরেকটা কথা, বারনার তোকে অনুরোধ করেনি, কেউ তদন্ত করতে এলে যেন তার সম্পর্কে কিছু না বলিস?'
প্রশ্নটায় রীতিমত অবাক হলো ড্যানি। 'না তো! একথা কেন বলবে?'
'ভাবলাম, হয়তো বলে থাকতে পারে। চালাক ছোকরা। পিছু নেয়ার উপায় রাখেনি। ওর কোন খোঁজ পেলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবি। ঠিকানা জানিস তো?'
'আরি ব্যাটা, ইয়ার্কি মারছিস নাকি? জানাব। তুই কিন্তু কিছুই বললি না। বারনার কোন অঘটন ঘটিয়েছে?'
'বললাম না, শিওর না। কিছু করে থাকলে শীঘ্রি জানতে পারবি। চলি। গুড বাই।'
'বারনার প্লেন কিনেছে শুনে খুব চমকে গিয়েছিলেন মনে হলো?' গাড়িতে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
'যাওয়ার কথাই,' স্টিয়ারিং হুইল ধরে সামনে তাকিয়ে রয়েছে ওমর। 'এটা আশা করিনি। এ রকম কিছু ঘটেছে, কল্পনাও করিনি। চাকরের চাকরি করে প্লেন

কেনার টাকা পেল কোথায়?'

'গহনার দোকানে গেলেই বোঝা যাবে,' বিড়বিড় করল কিশোর।

ঘণ্টাখানেক পর বণ্ড স্ট্রীটের সেই গহনার দোকানটার কাছে পৌছল গাড়ি যেটার কথা বলেছেন কলিনস। পার্ক করার জায়গা নেই সামনের দিকে। পেছনে বেশ খানিকটা দূরে পার্ক করে হেঁটে আসতে হলো। হ্যারিসন অ্যান্ড হ্যারিসন কোম্পানির দোকানের শো-কেসের সামনে এসে দাঁড়াল কিশোর আর ওমর। আগে না দেখলেও আঙটিটা দেখেই বুঝে ফেলল দু'জনে, ওটার কথাই বলেছেন লর্ড। বড় একটা চুনি পাথরকে ঘিরে বসানো ছোট ছোট চকচকে হীরা। দোকানে ঢুকল ওরা।

এগিয়ে এল সেলসম্যান।

আইডেনটিটি কার্ড বের করে দেখিয়ে ওমর বলল, 'আমি পুলিশের লোক। আপনার মালিক আছেন দোকানে? ম্যানেজার থাকলেও চলবে।'

'মিস্টার হ্যারিসনই আছেন। আসুন।'

পুলিশ এসেছে জেনে চমকে গেল হ্যারিসন। ওমরের দিকে তাকাল। 'বসুন, প্লীজ।'

'থ্যাংক ইউ,' বসতে বসতে বলল ওমর। কিশোরও বসল।

'কোন গণ্ডগোল?'

মাথা ঝাঁকাল ওমর। 'আপনার শো-কেসে একটা আঙটি দেখলাম। পুরনো আমলের। চুনি ঘিরে হীরা...'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে?'

'কোথায় পেলেন ওটা?'

'এক লোক বিক্রি করে দিয়ে গেছে।'

'তাকে চেনেন?'

'না। আগে কখনও দেখিনি।'

'তারপরেও কিনলেন?'

'কিনলাম। অনেক পুরনো ব্যবসা আমাদের। জানি, পুরনো মালেই বেশি লাভ। কিনব না কেন? তবে কেনার আগে খোঁজখবর অবশ্যই করি। জানি তো, ঘাপলা থাকে।'

'এটার ব্যাপারেও করেছেন?'

'করেছি। লোকটাকে বললাম, আঙটি রেখে যেতে। এক হপ্তা পরে এসে দাম নিয়ে যেতে। সে চলে গেল। চুরি যাওয়া গহনার লিস্ট পুলিশই দিয়ে যায় আমাদেরকে। ওরকম লিস্ট কয়েকটা আছে আমার কাছে। সবগুলো মিলিয়ে দেখলাম। কোনটাতে আঙটিটার উল্লেখ নেই। ধরে নিলাম, চোরাই মাল নয়। তারপরেও স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে ফোন করে আরও শিওর হয়ে নিলাম। ওরা জানাল, ওরকম কোন আঙটি চুরির রিপোর্ট ওদের ফাইলে নেই।'

'কাকে ফোন করেছিলেন?'

'ইনসপেক্টর হ্যামলিন। এর বেশি আর কিছু করার ছিল কি আমার?'

'না, আপনি ঠিকই করেছেন। তারপর, সাত দিন পর লোকটা এল?'

'হ্যাঁ। জিজ্ঞেস করলাম, কেন বিক্রি করতে চায়। সে জানাল, আঙটিটা তার নয়। এক ভদ্রমহিলার। টাকার টান পড়েছে। লজ্জায় বিক্রি করতে আসতে পারছে না, তাই তাকে দিয়ে পাঠিয়েছে। এ রকম ঘটনা হরহামেশাই ঘটে।'

'মহিলার নাম জিজ্ঞেস করেছিলেন?'

'না। সেটা অভদ্রতা। নাম জানাতে চায় না বলেই তো নিজে আসেনি।'

'লোকটার নাম জিজ্ঞেস করেছেন?'

'করেছি। নাম-ঠিকানা লিখে না রেখে কি আর পুরনো মাল কিনি।'

'কি বলল?'

'ওর নাম জন বারনার। ঠিকানা জানতে চান? তাহলে ফাইলটা আনাতে হবে। ঠিক মনে নেই...'

'কলিনস ম্যানর?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, কলিনস ম্যানর।'

'দাম কত চাইল?'

'চায়নি। আমাকেই বলতে বলল। যা বললাম তাতেই রাজি হয়ে দিয়ে চলে গেল।'

'কত দিলেন?'

'তিরিশ হাজার পাউন্ড।'

'নগদ?'

'না। এত টাকা আজকাল দোকানে রাখি না। ছিনতাইকারীরা কখন ঢুকে পড়ে...চেক দিয়েছি। সেদিনই ব্যাংক থেকে টাকা তুলে নিয়েছে। চেক দেখে ব্যাংকের ম্যানেজার আমাকে ফোন করে শিওর হয়ে নিয়েছিল সত্যিই দিতে চাই কিনা।'

'এরপর আর বারনারকে দেখেছেন?'

'না।'

'আর কিছু বিক্রি করতে আনেনি?'

'না।'

'আরও জিনিস আছে তার কাছে, এ রকম কোন আভাস দিয়েছে?'

'না। বোধহয় ওই একটাই ছিল।'

'দেখলে চিনতে পারবেন?'

'নিশ্চয় পারব।'

পকেট থেকে ছবিটা বের করে ঠেলে দিল ওমর। 'দেখুন তো, এই লোক কিনা?'

এক নজর দেখেই বলে উঠল জুয়েলার, 'হ্যাঁ, এই লোক।'

'শিওর?'

'শিওর। এখন আমার ভয় লাগছে, ইনসপেক্টর। কোন গোলমাল হয়েছে?'

'হয়েছে। আঙটিটা চোরাই মাল।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল হ্যারিসনের চেহারা। 'সর্বনাশ! তিরিশ হাজার যাবে

আমার! শেষ হয়ে যাব, মরে যাব...সত্যি বলছি, ইনসপেক্টর, লোকটাকে দেখে চোর বলে মনেই হয়নি। তারপরেও সব রকম খোঁজখবর করেছি আমি। আমার কোন দোষ আছে, বলুন?'

'মনে তো হচ্ছে না।'

'আঙটিটা কি নিয়ে যাবেন? তাহলে মরেছি!'

'না, আপাতত আপনার কাছেই থাক। তবে শো-কেস থেকে সরিয়ে ফেলুন। নিরাপদ কোন জায়গায় ভরে রাখুন। চোরাই জিনিস, বুঝতেই পারছেন।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়!'

'ওটা কেউ কিনতে এসেছিল?'

'এসেছিল কয়েকজন। তবে দাম শুনেই চুপ হয়ে গেছে। একজন শুধু রাজি হয়েছে, কাল আসবে বলেছে।'

'যা হোক কিছু একটা বলে ফিরিয়ে দেবেন তাকে। বুঝতে পারছেন আমার কথা?'

'পারছি। আচ্ছা, একটা কথার জবাব দেবেন? কি করে জানলেন আঙটিটা আমার কাছে আছে?'

হাসল ওমর। 'কপাল খারাপ আপনার। আঙটির মালিক বাজার করতে এসেছিল এদিকে, শো-কেসে দেখে গেছে আঙটিটা। বাড়ি ফিরে গিয়ে আলমারি খুলে দেখে তার আঙটি নেই। খবর দিয়েছে আমাদেরকে। তো, মিস্টার হ্যারিসন, বারনারের কোন খোঁজ পেলে জানাবেন।'

'তা তো নিশ্চয়ই।'

দোকান থেকে বেরিয়ে এল ওমর আর কিশোর। মনে নানা প্রশ্ন। বারনারই কি চোর? নাকি নিনার হয়ে কাজ করেছে? কিন্তু তার আসল নাম বলতে গেল কেন? ফ্লাইংক্লাবেও সঠিক নাম-ঠিকানা দিয়েছে, জুয়েলারের দোকানেও। ইচ্ছে করলেই তো ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারত? পেশাদার চোর হলে তা-ই করত। আচ্ছা, হঠাৎ এত টাকার দরকার হলো কেন তার? ধরা যাক, প্লেন কেনার জন্যে। কিন্তু প্লেন কিনল কেন? চোরাই মাল নিয়ে পালানোর জন্যে? গেল কোথায়?

একটা ব্যাপারে এখন নিশ্চিত হয়ে গেছে দু'জনে এটা সাধারণ কোন চুরি নয়। এসবের পেছনে অন্য কোন কারণ রয়েছে। সেই কারণটাই জানতে হবে এখন। তবে তার জন্যে বারনারকে দরকার।

পাঁচ

তিন হপ্তা পেরিয়ে গেল। ইতিমধ্যে কিশোরকে সঙ্গে নিয়ে অনেক খোঁজখবর করেছে ওমর। যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে জন বারনার। প্লেনে করেই গিয়েছে

সে। পথে পথে তেল নেয়ার জন্যে নেমেছে। ক্যাসাব্লাঙ্কা, ডাকার, ব্র্যাজাভিল। তারমানে দক্ষিণ আফ্রিকাতেই গেছে। ব্র্যাজাভিলের পরে নিখোঁজ হয়েছে মারটিন বিমানটা। আর কোন খোঁজ নেই। বিমানটার কি হলো, আর বারনারেরই বা কি হলো, কিছুই জানা গেল না।

অফিসে কমোডোরের সঙ্গে কথা হচ্ছে ওমরের। যা যা জেনেছে, জানিয়ে বলল, 'ব্যাস, এইই, স্যার। আর কিছু জানি না।'

'তো এখন কি করতে চাও?' জিজ্ঞেস করলেন কমোডোর।

'করার একটাই আছে। পিছু নেয়া। প্লেনটা খুঁজে বের করা।'

'পারবে?'

'চেষ্টা করতে দোষ কি? একটা বিমান হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে না। কোন না কোন চিহ্ন পাওয়া যাবেই। ঠিকমত খোঁজ করতে পারলে।'

'তা ঠিক। তাহলে যেতেই চাও?'

'আপনি বললে।'

'বেশ, যাও। তোমার কাগজপত্র রেডি করতে বলে দিচ্ছি। একা যেয়ো না, সঙ্গে কাউকে নিয়ে যাও।'

'ও কে, স্যার।'

উঠতে যাচ্ছিল ওমর, হাত তুললেন কমোডোর। 'ও হ্যাঁ, একটা কথা। লর্ড ফোন করেছিলেন। তোমাকে একবার দেখা করতে অনুরোধ করেছেন। আমাকেই যেতে বলেছিলেন, মানা করে দিয়েছি। আমার জরুরী মিটিং আছে। তুমি পারলে এখুনি চলে যাও।'

'আচ্ছা, স্যার।'

ঘণ্টাখানেক পর। ফারনডেল গাঁয়ের মেইন রোড ধরে ধীর গতিতে গাড়ি চালাচ্ছে ওমর। পাশে বসা কিশোর। পথেই পড়বে পোস্ট অফিসটা। ভাবল, পোস্টমিস্ট্রেসের সঙ্গে একবার দেখা করেই যাবে।

পোস্ট অফিসের কাছে এসে গাড়ি থামাল সে। মহিলাকে জিজ্ঞেস করতে গেল। কিশোর বসে রইল গাড়িতে।

কয়েক মিনিট পরেই ফিরে এসে গাড়িতে উঠল ওমর। কিশোরকে জানাল, কলিনস ম্যানরের নামে বিদেশ থেকে কোন চিঠি আসেনি। তবে সেদিনই সকালে এয়ার মেইলে একটা চিঠি এসেছে, বিদেশ থেকে, জনৈক মিসেস মিলারের নামে।

তারপর কলিনস ম্যানরে চলল ওরা।

আবার যে এসেছে সে-জন্যে কিশোর আর ওমরকে ধন্যবাদ দিয়ে শুরু করলেন লর্ড, 'ব্যাপারটা হয়তো কিছুই না। তবু ফোনে বলতে সাহস হলো না। যদি নিনা শুনে ফেলে? তার ঘরেও রিসিভার আছে। তাই আপনাকে কষ্ট দিতে হলো।'

মাথা ঝাঁকাল শুধু ওমর।

'ইদানীং নিনা এমন কিছু কাজ করছে, যা আগে করত না,' বললেন লর্ড।

'রোজ সকালে উঠে নিয়মিত হাঁটতে যায়। ঘণ্টা দুয়েক পর ফেরে। নতুন নিয়ম ধরেছে যখন, আমার ধারণা, নিশ্চয় কোন কারণ আছে।'

'যায় কোথায়?'

'জানি না।'

'পিছু নেননি?'

'না।'

'কাউকে দেখতে পাঠাননি?'

'চাকর-বাকরকে মেয়ের পেছনে পাঠাব! ভাবতেই পারি না।' দীর্ঘ এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন লর্ড। বললেন, 'বনের ভেতরে, কিংবা অন্য কোথাও বারনারের সঙ্গে দেখা করতে যায় না তো?'

'মনে হয় না। ফারনডেল তো দূরের কথা, বারনার ইংল্যান্ডে আছে কিনা তাতেও সন্দেহ আছে। মেয়ে কোথায় যায় কি করে বোঝার কোন চেষ্টাই করেননি?'

'একেবারে করিনি তা নয়। কাল লুকিয়ে চোখ রাখছিলাম। পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।'

'চুপি চুপি? যাতে কেউ না দেখে?'

'তাই তো মনে হলো। তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। এমনভাবে, যেন হঠাৎ করেই সামনে পড়ে গেছি। কথার কথা বলছি, এভাবে জিজ্ঞেস করলাম কোথায় যাচ্ছে? বলল, দোকানে। দু'একটা জিনিস কিনবে।'

'স্বাভাবিক।'

'আমার কাছে স্বাভাবিক লাগছে না। পারতপক্ষে দোকানে কিছু কিনতে যায় না সে। আর গেলেও গাড়ি নিয়ে যায়, হেঁটে নয়। তা ছাড়া কোন কিছুর দরকার হলে চাকরকে পাঠায়, কিংবা দোকানে ফোন করে দেয়। ওরাই লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেয়।'

'হুঁ!' মাথা ঝাঁকাল ওমর।

'আজও বেরিয়েছিল।'

'এমনও তো হতে পারে দোকান নয়, পোস্ট অফিসটাই তার আগ্রহের কারণ। চিঠি আনতে যায়।'

'ভেবেছি সে-কথাও। ওখানে যায় না।'

'কি করে জানলেন?'

'পোস্টমিস্ট্রেসকে ফোন করেছিলাম।'

'চিঠি এলে কি আপনি নিজ হাতে নেন এখন?'

'হ্যাঁ। একটা চিঠিও আসেনি নিনার নামে, আপনার যাওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত।'

উঠল ওমর। 'বলে ভালই করেছেন, স্যার। খোঁজ নেব।'

'পিছু নেবেন নাকি?'

'না, আমি নেব না। আমাকে দেখলে সাবধান হয়ে যাবে। অন্য ব্যবস্থা করব। ও-নিয়ে আপনি ভাববেন না, আমার ওপর ছেড়ে দিন সব।'

ম্যানর থেকে বেরিয়ে এল ওমর আর কিশোর।

কয়েক মিনিট পর। ড্রাইভওয়ে থেকে মোড় নিয়ে গাঁয়ের পথে উঠেই দেখা হয়ে গেল নিনার সঙ্গে। দেখা হলো মানে কিশোর দেখল, মেয়েটা তাকে দেখতে পায়নি। ওমরের বাহুতে হাত রেখে ইঙ্গিত করল কিশোর।

ওমরও দেখল। পুরনো আমলের সুন্দর একটা কটেজের সামনের বাগানের গেট দিয়ে নিনা বেরিয়ে হাত নাড়ল মাঝবয়েসী, ধূসর-চুল এক মহিলার দিকে চেয়ে। মহিলা দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটার দরজায়। গাড়ি থামাল না ওমর, গতি কমিয়ে খুব ধীরে এগিয়ে চলল। চোখ রিয়ারভিউ মিররে। নিনাকে দেখছে।

গাড়িটার দিকে একবার চোখ তুলেও তাকাল না নিনা। সোজা ম্যানরের দিকে রওনা হলো।

নিনা চোখের আড়াল হতেই গাড়ি থামাল ওমর। ভাবতে লাগল, এরপর কি করবে? যাবে নাকি, গিয়ে মহিলার সঙ্গে কথা বলবে? এই সময় একটা ছেলেকে আসতে দেখল। আট-নয় বছরের একটা ছেলে, একটা টেনিস বলকে লাথি মারতে মারতে নিয়ে এগোচ্ছে। কাছে আসতেই ডাকল তাকে ওমর, 'এই খোকা, শোনো?'

নিখুঁতভাবে পা দিয়ে বলটা আটকাল ছেলেটা। জানালার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কি?'

'ওই বাড়িটা কার, জানো?'

'মিসেস মিলারের।'

'অনেক দিন ধরে আছে?'

'আমার জন্মের পর থেকেই দেখছি। কেন?'

সরল প্রশ্ন, কিন্তু ক্ষণিকের জন্যে দ্বিধায় পড়ে গেল ওমর। আমতা আমতা করে বলল, 'ওরকম একটা বাড়ি কেনার কথা ভাবছি। ওটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে।'

'তাহলে ফিরে যান। কিনতে পারবেন না।'

'কেন?'

'মিসেস মিলার থাকেন বটে, বাড়িটা আসলে লর্ড কলিনসের। তিনি বেচবেন বলে মনে হয় না।' দাঁড়াল না আর ছেলেটা। বল তুলে নিয়ে শিস দিতে দিতে চলে গেল।

আরও এক মিনিট বসে রইল ওমর। ভাবল। আবার রওনা হলো পোস্ট অফিসের দিকে। দোকানে খরিদ্দার আছে। ওদের বেরিয়ে যাওয়ার অপেক্ষা করল সে। তারপর গিয়ে দাঁড়াল পোস্টমিস্ট্রেসের সামনে। 'সরি, ম্যাডাম, আবার বিরক্ত করতে এলাম। আপনি বলেছেন, মিসেস মিলারের নামে বিদেশ থেকে চিঠি এসেছে।'

'হ্যাঁ।'

'ওই যে, যিনি লর্ডের কটেজে থাকেন, তিনি তো?'

'হ্যাঁ।'

'স্ট্যাম্পটা কোনদেশী বলতে পারবেন? কিংবা পোস্ট অফিসের ছাপ? আজ সকালে যেটা এসেছিল?'

'না।...স্ট্যাম্পটা কোনদেশী খেয়াল করিনি। তা ছাড়া পোস্টমার্ক লেপটে

গিয়েছিল। তবে প্রথম চারটে অক্ষর সম্ভবত উইন্ড। ডব্লিও আই এন ডি।'

'মাঝে মাঝেই কি বিদেশ থেকে চিঠি পান মিসেস মিলার?'

'না। আগে তো কখনও পেত না। ইদানীং পাওয়া শুরু করেছে।'

'নিশ্চয় চেনেন তাকে?'

'হ্যাঁ। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই কাজ করত ম্যানরে। কয়েক বছর আগে মারা গেছে মিস্টার মিলার, মালীর কাজ করত। তার মিসেস ছিল লর্ডের মেয়ে নিনার নার্সমেইড। মিলার মরে গেছে, তার স্ত্রীও আর কাজ করে না লর্ডের ওখানে। তবু লর্ড কটেজটা ছেড়ে দিয়েছেন মহিলাকে থাকার জন্যে।'

'আচ্ছা, আজ সকালে মিস কলিনস এসেছিল এখানে?'

'কি জানি, এলেও দেখিনি।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। পুলিশকে অনেক সাহায্য করেছেন। আরেকটা কথা, আমি যে এসব প্রশ্ন করেছি আপনাকে, কাউকে বলবেন না। একেবারে চুপ থাকবেন। বুঝেছেন?'

'বুঝেছি।'

'থ্যাংক ইউ এগেন। চলি। গুড মরনিং।'

গাড়িতে এসে উঠল ওমর। মুখে সন্তুষ্টির মৃদু হাসি। মিসেস মিলারের মাধ্যমেই যোগাযোগ রাখছে বারনার আর নিনা, এটা এখন পরিষ্কার। সেকথা কি গিয়ে এখনি বলবে লর্ডকে? ভাবতে ভাবতেই গাড়ির মুখ ঘোরাল সে। ফিরে চলল ম্যানরে।

ড্রাইভওয়েতে আবার দেখা হয়ে গেল নিনার সঙ্গে। দ্রুত বাড়ির দিকে হাঁটছে মেয়েটা। পাশে এসে গাড়ি থামাল ওমর। মুখ বাড়িয়ে দিল কিশোর। 'মিস নিনা, ঘরে যাচ্ছেন? গাড়িতে উঠুন। আমরা আপনাদের বাড়িতেই যাব।'

থামল না নিনা। সামনের দিকে চেয়ে হাঁটছে। 'না, লাগবে না। হেঁটেই যেতে পারব।'

'মিস নিনা, আমার নাম ওমর শরীফ। ডিটেকটিভ ইনসপেক্টর।' নিনার পাশে গাড়ি চালাতে চ;লাতে বলল ওমর। 'মত বদলাননি তাহলে?'

'কোন ব্যাপারে?'

'খুলে বলতে হবে আবার? পুলিশকে বিশ্বাস করাই ভাল।'

'পুলিশ তাদের নিজেদের চরকায় তেল দিলে সবার জন্যেই ভাল।'

'বেশ, চলতে থাকুন নিজের খেয়াল-খুশি মত। পরে বুঝবেন...পস্তাবেন...'

নিনার আগেই ম্যানরের সদর দরজায় পৌছে গেল ওমর আর কিশোর। বেল বাজাতে দরজা খুলে দিল খানসামা। তাকে বলল ওমর, 'লর্ডকে গিয়ে বলো, আমি এসেছি।'

মিনিট খানেক পর ফিরে এসে দু'জনকে লাইব্রেরিতে নিয়ে চলল খানসামা।

ঢুকেই কলিনসকে বলল ওমর, 'কোথায় যায় জেনে এলাম, স্যার। বারনারের সঙ্গে দেখা করে না নিনা।'

'এত তাড়াতাড়ি জেনে ফেললেন! কি করে শিওর হলেন?'

'বারনার এদেশে নেই।'

'আমাকে কি করতে হবে এখন?'

'আমার পরামর্শ শুনবেন আপনি, স্যার? কিছুই করবেন না। তাহলে আমার কাজ অনেকখানি সহজ হবে।'

'নিনা যে হঠাৎ হাঁটাহাঁটিতে আগ্রহী হয়ে পড়েছে, ইগনর করে যাব?'

'হ্যাঁ। দেখেও না দেখার ভান করবেন।'

'ও কি করে, জানতে পেরেছেন?'

'বোধহয়।'

'কি করে?'

'একেবারে শিওর না হয়ে এ-প্রশ্নের জবাব দেব না। তবে, জানতে দেরি হবে না। এটুকু শুধু জেনে রাখুন, ক্ষতিকর কিছু করছে না এখন নিনা। এই সময় আপনি চুপচাপ থাকলে আমার কাজ সহজ হবে।'

'রহস্য করে কথা বলছেন!'

'সরি, স্যার, কিছু মনে করবেন না। আপনার ভালর জন্যেই করছি। আপনার গহনাগুলো বের করে দেবই, একথা জোর দিয়ে বলতে পারছি না। তবে ওগুলো কোথায় গেছে হয়তো জানাতে পারব।'

'বেশ, তাই করুন আগে,' কেমন যেন ভোঁতা শোনাল লর্ডের কণ্ঠ।

অফিসে ফিরে সোজা গিয়ে কমোডোরের রুমে ঢুকল ওমর। কোন রকম ভূমিকা না করে বলল, 'সকালে মেয়ে হাঁটতে বেরোয় দেখে উদ্বিগ্ন হয়েছেন মহামান্য লর্ড। তাঁকে বুঝিয়ে এলাম, এত চিন্তা করার কিছু নেই।'

'করছে কি মেয়েটা, জেনেছ?'

'চিঠিতে যোগাযোগ রেখেছে বারনারের সঙ্গে। চিঠি আসে গাঁয়ের সেই মহিলা মিসেস মিলারের নামে, নিনার নার্সমেইড ছিল এক সময়। একথা অবশ্য মেয়ের বাপকে জানাইনি।'

'আর কিছু?'

'হ্যাঁ। চিঠি আসে আফ্রিকা থেকে। পোস্টমিস্ট্রেস ঠিক করে বলতে পারল না। তবে পোস্টমার্কের চারটে অক্ষরের কথা মনে আছে, খেয়াল করেছে বলেছে। ডব্লিও আই এন ডি। আমার ধারণা, উইন্ডহোয়াক। যদ্দূর জানি দক্ষিণ আফ্রিকায় ওরকম নাম একটাই আছে।'

'হ্যাঁ, কালাহারি মরুভূমির ধারে। বেশি কাকতালীয় হয়ে যাচ্ছে না?'

'হয়তো, হয়তো বা না। আমি ওই লাইনে চিন্তা করছি না।'

'ওখান থেকেই তদন্ত শুরু করতে চাইছ তো?'

'সেরকমই ইচ্ছে। আপনি কি বলেন, স্যার?'

'যাও, গিয়ে দেখো। মিস্টার থারগুডের আদেশ যখন, যেতে তো হবেই। কিন্তু সাধারণ কয়েকটা গহনার জন্যে প্লেন নিয়ে একেবারে আফ্রিকায়!' ক্ষোভ ঢাকতে পারলেন না কমোডোর। 'যাও। একা যেয়ো না। কাউকে সঙ্গে নিয়ো।'

'কিশোরকেই নিই। ওকে নিলেই ভাল হবে।'

'তোমার ইচ্ছে। সব দায়িত্ব যখন তোমার।'

'একটা ব্যাপার, স্যার। বারনারকে খুঁজে পেলে কি করব? জোর করে ধরে

আনা তো সম্ভব না।'

কথাটা ভেবে দেখলেন কমোডোর। 'না, সেটা বোধহয় উচিতও হবে না। দেখো, কি করতে পারো। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবে। লর্ডের বাকি জুয়েলারিগুলো কি করেছে, জেনে নেবে। পারলে ওগুলো উদ্ধারের চেষ্টা করবে। বেশি বাড়াবাড়ি করলে ওখানকার পুলিশের সাহায্য চাইতে পারো। তবে তুমি একা সামলাতে পারলেই ভাল, জটিলতা কমবে। সবই নির্ভর করবে বারনার কি করে তার ওপর। ওখানে গিয়েও বেআইনী কিছু করছে কিনা কে জানে? আগে খুঁজে বের করো ওকে, তারপর দেখা যাবে।'

ছয়

আরও দশ দিন পর। টুইন-এঞ্জিনড এইট-সীটার একটা বিমানে করে উড়ে চলেছে ওমর আর কিশোর। বারনার যে যে পথে গেছে, সেই পথেই এসেছে ওরা। সে যেখানে যেখানে নেমেছে, ওরাও সেখানে নেমে খোঁজখবর নিয়েছে। এগোচ্ছে সঠিক পথেই।

সামনের মরু অঞ্চল দেখিয়ে ওমর বলল, 'ওই যে, জায়গার চেহারা দেখো। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার এই অঞ্চলটার ভারি বদনাম। কত লোক যে এখানে এসে পানির অভাবে মরেছে!'

'কলাহারি!' বিড়বিড় করল কিশোর।

'না, এখনও আসিনি ওখানে। ওটা আরও পুবে। আর ঘন্টাখানেকের মধ্যেই উইভহোয়াকে পৌছব।'

'ওখানে বারনারকে পাবেন আশা করছেন?'

'আল্লাহ্ই জানে কোথায় পাব!, যা বিশাল অঞ্চল; লুকিয়ে থাকলে খুঁজে বের করা মুশকিল। ভরসা একটাই, প্লেন নিয়ে এসেছে সে। আর প্লেন চালু রাখার জন্যে তেল দরকার। তেলের জন্যে এয়ারপোর্টে নামতেই হবে তাকে।'

উইভহোয়াক এয়ারপোর্টের ওপরে বিশ মিনিট চক্কর দিতে হলো ওদের, তারপর পেল নামার অনুমতি। ল্যান্ড করল ওমর। মোট চারটে বিমান দেখা গেল। একটা বড়, দক্ষিণ আফ্রিকান এয়ার-ওয়েজের বোয়িং বিমান। অন্য তিনটে ছোট, তবে ওগুলোর মাঝে একটাও মারটিন নয়।

এয়ারপোর্ট ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করল ওমর। ওখানে আরও একজনকে বসে থাকতে দেখল, উইভহোয়াকের ট্র্যাফিক সুপারিনটেনডেন্ট।

নিজের আর কিশোরের পরিচয় দিল ওমর, আইডেনটিটি কার্ড বের করে দেখাল।

লন্ডন থেকে এতদূরে ওরা কেন এসেছে জানতে চাইলেন সুপারিনটেনডেন্ট।

ওমর বলল, 'একটা লোকের খোঁজ করছি। মারটিন প্লেন নিয়ে এসেছে, একা। ওরকম কোন প্লেন কিছুদিনের মধ্যে ল্যান্ড করেছিল এখানে?'

'এসেছিল,' ম্যানেজার জানাল। 'খুব সুন্দর একটা প্লেন, নতুন। টুইন-এঞ্জিনড।'

'এসেছিল। তার মানে এখন নেই?'

'না,' জবাব দিলেন সুপারিনটেনডেন্ট। 'দিন দুই ছিল এখানে। তারপর চলে গেছে।'

'কোথায়, বলতে পারবেন?'

'না। তবে মনে হয় কেপ টাউনে।'

'জানার কোন উপায় আছে?'

'খোঁজ নিয়ে দেখতে পারি।'

'তাহলে বড় উপকার হয়। অনেক সময় আর ঝামেলা বাঁচবে আমার।'

'বেশ, এখুনি খোঁজ নিচ্ছি,' উঠে বেরিয়ে গেলেন সুপারিনটেনডেন্ট।

ম্যানেজারের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে গেল ওমর। 'পাইলটের নামটা বলতে পারবেন?'

'পারব। জন বারনার।'

'চেনেন ওকে? মানে আগে থেকেই চিনতেন?'

'ঠিক চিনি বলতে পারব না। তবে এ-শহরে দু'একবার দেখেছি। সেটা অনেক দিন আগে, প্রায় বছরখানেক। ইংল্যান্ডে কিভাবে যাওয়া যায় সেকথা জানতে এসেছিল আমার কাছে। তা ব্যাপারটা কি? কোনও শয়তানী করে এসেছে?'

'সেটাই জানার চেষ্টা করছি। ধরতে পারলে জিজ্ঞেস করে জেনে নেব।'

সুপারিনটেনডেন্ট ফিরে এলেন। 'কেপ টাউনের ওরা কিছু বলতে পারল না।'

'তার মানে কি যায়নি ওখানে?' ভুরু কোঁচকাল ওমর।

'তাই তো মনে হচ্ছে। নাম কি লোকটার?'

'জন বারনার।'

'জন বা-বা···!' তুড়ি বাজালেন সুপারিনটেনডেন্ট। 'ড্রেক ডোভারের সঙ্গীটা নয় তো?'

'ড্রেক ডোভার?'

'এখানকার লোকে ওকে ক্যাট ম্যান বলে চেনে।'

'ক্যাট ম্যান? মানে বেড়াল-মানব!' আনমনে বিড়বিড় করল ওমর। বারনারের ছবিটা বের করে ঠেলে দিল, 'দেখুন তো এই লোক কিনা?'

ভাল করে ছবিটা দেখলেন সুপারিনটেনড্রেন্ট। 'না, এ-তো আপনার জন বারনার। ডোভার অন্য লোক।'

ওমরের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন সুপারিনটেনডেন্ট। 'বহু দিন আগে এদেশে এসেছে ড্রেক ডোভার, সেই তখন, কালাহারিতে যখন হীরা খোঁজার ধুম পড়ে গিয়েছিল। আরও অনেকের সঙ্গে সে-ও খুঁজেছে, পায়নি। তার সঙ্গীরা কেউ মারা গেছে, কেউ চলে গেছে, কিন্তু সে রয়ে গেছে। বেছে নিয়েছে অন্য পেশা। জানোয়ার মেরে তার চামড়া বিক্রি করে। বিশেষ করে

কিন্তু ওকে বমাল কখনও ধরা যায়নি। শীতার/চিতাবাঘ। কাজটা এখন বেআইনী। কিন্তু ওকে বমাল কখনও ধরা যায়নি। ভীষণ চালাক। আর শরীরও একখানা, ঝাড়া সাড়ে ছয় ফুট। গালে একটা কাটা দাগ, চিতাবাঘে আঁচড়ে দিয়েছিল। বয়েস সত্তরের কাছাকাছি, কিন্তু দেখলে তা মনে হয় না। ওর সাথে আপনার এই বারনারের পরিচয় আছে, উইভহোয়াকে একসঙ্গে দেখা গেছে দু'জনকে। মাঝে মাঝে আসতো, কেনাকাটা করত, তারপর আবার গায়েব হয়ে যেত।'

'কালাহারিতে?'

'আমার তা-ই মনে হয়।'

'তাহলে মরুভূমিতে নিশ্চয় কোন ঘাঁটি আছে ডোভারের।'

'থাকতে পারে।'

'কোথায়, অনুমান করতে পারেন?'

'এত বড় এলাকা, কোন জায়গার কথা বলি, বলুন? ইটোশা প্যান-এর কাছাকাছি হতে পারে, কারণ, ওটা একটা গেম রিজার্ভ। জন্তুজানোয়ারের ভিড় বেশি। তবে ডোভারের কথা কিছুই বলা যায় না। আরও অনেক দূরেও থাকতে পারে সে, এমন কোন জায়গায়, যেখানে চিতাবাঘের ছড়াছড়ি। আমরা জানি না, হয়তো ও জানে। এখনও হীরা খোঁজে কিনা তাই বা কে বলতে পারে?'

'বারনার তার সঙ্গে কাজ করে?'

'করে বলিনি। বলেছি, উইভহোয়াকে একত্রে দেখা গেছে দু'-জনকে। এটা অবশ্য বারনার ইংল্যান্ডে যাওয়ার আগের কথা।'

'ইংল্যান্ড থেকে নতুন বিমান নিয়ে আসতে দেখে অবাক হননি?'

'মিথ্যে বলব না, হয়েছি। এটাও ভেবেছি, হয়তো সত্যি সত্যি হীরার খনি খুঁজে পেয়েছে ডোভার। ওই পাথরই নিয়ে গিয়ে ইংল্যান্ডে বিক্রি করে প্লেন কিনে এনেছে বারনার।'

'তাহলে তাকে ধরলেন না কেন?'

'কাগজপত্র চেক করেছি, পরিষ্কার। কোন্ দোষে আটক করব?'

'হুঁ। আচ্ছা, তার অতীত সম্পর্কে কিছু জানেন?'

'যা যা জানি, সব বলেছি।'

'ও। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।'

দীর্ঘ এক মুহূর্ত নীরবতা। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন সুপারিনটেনডেন্ট, 'কালাহারিতে খুঁজতে যাবেন নাকি ওকে?'

'এতদূর যখন এসেছি, একবার অন্তত না দেখে ফিরে যাই কি করে? হ্যাঁ, দেখব। বারনারকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবই।'

'খুব কঠিন কাজ? এতবড় মরুভূমি…'

'তবু চেষ্টা করব।'

'ডোভারের ব্যাপারে হুঁশিয়ার থাকবেন। মানুষ খুন করে বসলেও অবাক হব না। ওই আইরিশগুলোকে কোন ব্যাপারেই বিশ্বাস নেই।'

'সাবধানেই থাকব।'

সাত

অনেক পথ পেরিয়ে এসেছে। বিমানটাকে পুরো ওভারহলিঙের জন্যে এয়ারপোর্টে রেখে একটা হোটেলে এসে উঠল ওমর আর কিশোর।

পরদিন সকালে হোটেল থেকে বেরোনোর মুখে দেখা হয়ে গেল একটা লোকের সঙ্গে। রোদে পোড়া চামড়া, গায়ে গাঢ় নীল জ্যাকেট, পরনে হালকা নীল প্যান্ট–দক্ষিণ আফ্রিকার পুলিশের পোশাক। এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'আপনিই নিশ্চয় মিস্টার ওমর?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে।'

'বলুন।'

'এখানেই? চলুন, ভেতরে বসি।'

'আসুন।'

'আপনার কথা শুনলাম কাল,' চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল পুলিশ অফিসার। 'অপরিচিত কেউ এলেই তার সম্পর্কে খোঁজখবর করি আমরা, চোখ রাখি। বুঝতেই পারছেন, দুনিয়ার সব জায়গা থেকেই লোক আসে এখানে, সবাই কোন না কোন কারণ দেখায়।…না না, আপনাকে ক্রিমিন্যাল ভাবছি না…'

'আমরা এসেছি কি করে জানলেন?'

'মিস্টার ক্রেইগের কাছে।'

'কে?'

'এয়ারপোর্ট ম্যানেজার। নতুন কেউ এলেই থানায় লিস্ট পাঠায়, এটা তার দায়িত্ব। শুনলাম, লন্ডন থেকে এসেছেন আপনারা, ডিটেকটিভ, ড্রেক ডোভারের ব্যাপারে ইনটারেস্টেড।'

চালাক লোক, বুঝতে পারল ওমর। সরাসরি না চেয়ে, ঘুরিয়ে বলছে কাগজপত্র দেখানোর কথা।

বের করে দেখাল ওমর আর কিশোর।

'আসলে,' কার্ড আর কাগজ ফেরত নিতে নিতে বলল ওমর, 'ডোভারের কথা এখানে এসে শুনলাম। আমরা এসেছি জন বারনার নামে একটা লোকের খোঁজে। আপনাদের ট্র্যাফিক সুপারিনটেনডেন্টের মুখে শুনলাম ডোভারের কথা।'

'বারনারকে কেন খুঁজছেন জানতে পারি? ওর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ?'

'সরি, সেটা বলা যাবে না। গোপন সূত্রে আমরা জেনেছি, একটা মারটিন প্লেন নিয়ে সে কালাহারিতে এসেছে। তাকে খুঁজে বের করে জিজ্ঞেস করব, সে কি করছে।'

'তাকে কোথায় পাওয়া যাবে?'

'জানলে তো এতক্ষণে ধরেই ফেলতাম। আপনার কি মনে হয়? বেআইনী কিছু করছে?'

'ডোভারের সঙ্গী যখন, করছে তো কিছু নিশ্চয়। আবার নতুন প্লেন কিনে এনেছে। প্লেন থেকে উটপাখি শিকার করা খুব সহজ।'

বিস্ময় চাপতে পারল না ওমর। 'মানে? উটপাখি শিকারের জন্যে এতসব করতে যাবে কেন?'

'হীরার জন্যে।'

'হীরা! বুঝলাম না।'

'বছর কয়েক আগে একজন শিকারী কালাহারিতে একটা উটপাখি গুলি করে মেরেছিল। সে জানেছে, খাবার হজম করার জন্যে খাবারের সঙ্গে ছোট ছোট পাথরও গিলে ফেলে উটপাখি। সত্যি কিনা জানার জন্যে পাখিটার পেট কাটল শিকারী। সাধারণ পাথর তো পেলই, সঙ্গে বেরোল কিছু দামী পাথর। অনেকগুলো হীরা। ছড়িয়ে পড়ল এই খবর। দলে দলে ছুটে এল শিকারীরা। পাইকারী হারে উটপাখি মারতে শুরু করল। অনেক কষ্টে তাদের ঠেকানো হলো; তবে কিছু শিকারী সরে গেল কালাহারির ভেতরে, দূরে। তাদের বিশ্বাস, একমাত্র কালাহারির উটপাখির পেটেই হীরা মিলবে। মার খেয়ে খেয়ে পাখিগুলোও গেল চালাক হয়ে। শিকারী দেখলেই ভাগে। পায়ে হেঁটে গিয়ে এখন ওদের গুলি করা প্রায় অসম্ভব। সে-জন্যেই বলছিলাম, প্লেন থেকে খুব সহজ।'

'আই সী।' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল ওমর।

'সাথে বন্দুক এনেছেন?' আচমকা প্রশ্নটা যেন ছুঁড়ে দিল অফিসার।

'শুধু পিস্তল। আত্মরক্ষার খাতিরে।'

'লাইসেন্স আছে?'

'আছে। দেখবেন?'

এক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে ওমরের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল খড়িরাঙ অফিসার। তারপর হাসল। মাথা নাড়ল। 'না, দরকার নেই।...আচ্ছা, বারনারকে কিভাবে খুঁজে বের করবেন ভাবছেন?'

'ওর প্লেন। খোলা মরুভূমিতে নামলে লুকাতে পারবে না। আকাশ থেকে চোখে পড়বেই।'

'খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার চেয়েও কঠিন। যাকগে, সেটা আপনার ব্যাপার। আরেক কাজ করলেও তো পারেন? ডোভারের জীপ আছে। জিনিসপত্র কিনতে শহরে আসে মাঝে মাঝেই। ও এলে ওর ওপর চোখ রাখুন।'

'কবে আসবে তার কোন ঠিক আছে? কতদিন বসে থাকব? ওর জীপ থাকায় বরং আরেকটা সুবিধে হলো। আকাশ থেকে জীপটাও চোখে পড়বে।'

'বলছি আপনাদের ভালর জন্যেই। ডোভার ডেঞ্জারাস লোক। তবে তারচেয়ে ডেঞ্জারাস ওর বুশম্যান বন্ধুরা। বন্দুকের গুলি খেলেও বাঁচার আশা থাকে, কিন্তু বুশম্যানদের তীর খেলে নিশ্চিত মৃত্যু। মারাত্মক বিষ মাখানো থাকে। ওই বিষের কোন প্রতিষেধক নেই।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'থ্যাংক ইউ, অফিসার। হুঁশিয়ার থাকব আমরা।'

'ডোভার কিংবা বারনারকে ধরতে পারলে, সোজা ধরে নিয়ে আসবেন থানায়। তারপর আপনাদের যত রকম সাহায্য লাগে, আমরা করব।'

'তাহলে তো খুবই ভাল হয়। আচ্ছা, এখানে পুলিশের প্লেন নেই?'

'দরকার করে না। সড়ক, রেল আর বিমান যোগাযোগ রয়েছে প্রতিটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গার সঙ্গে। ইচ্ছে করলেই চলে যাওয়া যায়। আর মরুভূমিতে গেলে সাধারণত জীপ ব্যবহার করি আমরা।'

'অনেক তথ্য জানা গেল আপনার কাছে। তা পুলিশ হেডকোয়ার্টারে আপনাকে ফোন করতে হলে কি নাম বলব?'

'জোনস। ডিলার জোনস।'

বিদায় নিয়ে উঠে চলে গেল পুলিশ অফিসার।

বিমান বন্দরে যাওয়ার পথে কিশোর বলল, 'ব্যাটা ভাল ভাল কথা বলে গেল বটে, আমাদের ওপর থেকে সন্দেহ যায়নি।'

'না যাক। হাজার হোক, পুলিশ। কারও ওপর থেকে আমাদের সন্দেহও কি সহজে যায়?'

আরও আধঘণ্টা পর প্লেন নিয়ে আকাশে উড়ল ওরা। রওনা হলো পুব দিকে। শুরুতে কিছু ফসলের খেত, তারপর থেকে শুরু হয়েছে খোলা প্রান্তর। ধীরে ধীরে পেছনে পড়তে লাগল রাস্তা, রেললাইন, বাড়িঘর। মুছে গেল বসতির চিহ্ন। মাঠে এখন আর ঘাসও নেই। শুধু রুক্ষ, ঊষর মাটি, তারই মাঝে কদাচিৎ কিছু কাঁটাঝোপ।

'এই তাহলে মরুভূমি?' বলল কিশোর।

'আসল মরুভূমি নয়। সেমি-ডেজার্ট বলা যায় এটাকে। এখানেই এই অবস্থা, সামনে কি আছে বোঝো! ওখানে গিয়ে যদি হঠাৎ এঞ্জিন বিকল হয়ে যায় অবস্থাটা কি দাঁড়াবে?'

পাঁচ হাজার ফুট ওপর দিয়ে উড়ছে প্লেন। এই উচ্চতা থেকে চারপাশে অনেক দূর দেখা যায়। আবার এত বেশি ওপরেও নয়, যে এখান থেকে মাটিতে থাকা প্লেন কিংবা জীপ চেনা যাবে না। মাঝে মাঝে ম্যাপের দিকে তাকাচ্ছে ওমর, ইংল্যান্ড থেকে আসার সময়ই এটা নিয়ে এসেছে। ম্যাপ যেমন শূন্য, সামনে আর আশপাশের জমিও তেমনি শূন্য। কোথাও কিছু নেই।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত জীবনের কোন চিহ্ন চোখে পড়ল না। কোথাও কোন নড়াচড়া নেই। শুধু খাঁ খাঁ করছে যেন বিষণ্ণ শূন্যতা। মানুষ তো দূরের কথা, অন্য কোন জানোয়ারও নেই। পুরো অঞ্চলটাই মৃত। কিশোরের মতে 'কেকের চ্যাপ্টা পেটের মত খালি'!

প্রথম উটপাখিটাকে দেখে যেন চমকে উঠল ওরা। তারপর আর একটা-দুটো নয়, ঝাঁকে ঝাঁকে। বিমানটার দিকে কোন নজরই দিল না পাখিগুলো। আরও কিছুদূর এগিয়ে অন্যান্য জানোয়ার দেখা গেল। রোদে পোড়া কিছু কিছু ঘাস আছে এখানে, আর আছে এক ধরনের কাঁটাগাছ। জেব্রা আর ওয়াইল্ডবীস্টের খাদ্য। ওই দু'জাতের

প্রাণী আছেও ওখানে প্রচুর। গরুর পালের মত চরছে। ওগুলোর মাঝে রয়েছে অ্যান্টিলোপ আর জেমসবক হরিণ। বাঘ-সিংহ চোখে পড়ল না। দূরে একবার একটা জানোয়ারকে দেখে ওমর মনে করল বুঝি সিংহ, কিন্তু কাছে গিয়ে দেখা গেল ওটা হায়েনা। ওটার কিছু দূরে শুকনো কতগুলো হাড় চাটছে একটা শেয়াল।

ওই এলাকায় অনেকক্ষণ ঘোরাফেরা করে অবশেষে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ওমর। 'নাহ্, একটা চিতাবাঘও দেখলাম না। চিতার চামড়ার ব্যবসা করে, তারমানে এখানে ডোভারের থাকার কথা নয়। আমার মাথায় ঢুকছে না, এতগুলো দামী গহনা চুরি করে এই মরুভূমিতে মরতে এসেছে কেন বারনার।'

জবাব দিতে পারল না কিশোর।

'আজকে যা দেখলাম,' ওমর বলল, 'তারচেয়ে খারাপ জায়গা আছে, ভাল জায়গাও আছে। সব মিলিয়ে প্রায় পঁচিশ হাজার বর্গমাইল।'

'এত বড় এলাকায় এভাবে খুঁজে লাভ হবে না,' কিশোর বলল।

'তাই তো মনে হচ্ছে। জন্তু-জানোয়ারেরা থাকে পানির কাছাকাছি। পানি ছাড়া বাঁচতে পারে না কেউ। বুশম্যানদের দরকার জানোয়ারের মাংস। ওরা থাকবে জানোয়ারের কাছাকাছি। আর ভিন্ন কারণে ডোভারও থাকবে ওদের কাছাকাছি। তা ছাড়া, যা দেখলাম, এসব এলাকায় প্লেন কিংবা জীপ লুকানোর জায়গা নেই। জীপের চাকার দাগও দেখলাম না। না, এদিকে নেই ওরা।'

ধীরে ধীরে প্লেনের নাক উত্তরে ঘোরাল ওমর। শহরে ফিরে যাবে। 'প্রায় দুশো মাইল দেখলাম। আজকের জন্যে যথেষ্ট।'

ওপরে খোলা আকাশের দিকে তাকানো যায় না, চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। বাতাস এত গরম, সাংঘাতিক হালকা হয়ে গেছে। ফলে বাম্প করছে প্লেন। গোত্তাতে গোত্তাতে চলেছে আহত জানোয়ারের মত।

এয়ারপোর্টে ফিরে এল ওরা।

ওখানে ওদের জন্যে একটা খবর রয়েছে। ডিলার জোনসের কাছ থেকে। আশেপাশে যতগুলো এয়ারপোর্ট আছে সবগুলোতে খোঁজ নিয়েছে সে। উইন্ডহোয়াক, কীটম্যানশপ, ইউপিংটন, ম্যাফেকিং, মাহালাপাই, জোহ্যান্সবার্গ, সব জায়গায়। কোনটাতেই বারনারের ল্যান্ড করার কোন রেকর্ড নেই।

'আরও শিওর হলাম,' মেসেজটা পড়ে বিড়বিড় করল ওমর, 'কালাহারিতেই কোথাও রয়েছে বারনার! মরুভূমির মাঝে!'

আট

পরের তিনটে দিন প্রায় একনাগাড়ে খুঁজল ওরা। সকালে উঠে বেরোয়, তেল ফুরালে ফেরে। দিনের আলো থাকলে তেল নিয়ে আবার বেরোয়। কিন্তু

বারনারের প্লেন কিংবা ডোভারের জীপের কোন চিহ্নই দেখতে পেল না।

চারদিনের দিন সকালে বেরোনোর আগে ওমর বলল, 'বোধহয় পণ্ডশ্রম করছি আমরা।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে,' জবাব দিল কিশোর। 'এই অঞ্চলে নেই ওরা।'

'তাহলে গেল কোথায়?...এক কাজ করি, চলো। জোনসের সঙ্গে গিয়ে আলাপ করে দেখি নতুন কোন তথ্য পেয়েছে কিনা।'

পুলিশ স্টেশনে চলে এল ওরা। জোনসের ডিউটি আছে তখন, অফিসেই পাওয়া গেল তাকে। নিজেদের ব্যর্থতার কথা জানাল ওমর।

ইটোশা প্যানে অনুসন্ধান চালিয়েছে কিনা জানতে চাইল জোনস।

ওমর জানাল, ওদিকে যায়নি। ওরা মরুভূমির উত্তর প্রান্ত থেকে শুরু করে উত্তরাঞ্চল চষে বেরিয়েছে আগের দিন পর্যন্ত।

'আপনার কি মনে হয়,' জিজ্ঞেস করল ওমর, 'ডোভার ওদিকে আছে?'

'ওর সম্পর্কে শিওর হয়ে কিছুই বলা যায় না।'

'থাকতেও তো পারে। বললেন না সেদিন, ওখানে জন্তু-জানোয়ার বেশি।'

'থাকলে ড্যাম হারবার্টের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। কড়া নজর রাখে ড্যাম।'

'লোকটা কে?'

'ইটোশার গেম ওয়ার্ডেন। কমিশনারও। বিশেষ দরকার না হলে শহরে বড় একটা আসে না। মরুপাগল কিছু লোক আছে না, ড্যাম তাদের একজন।'

'তাহলে গেল কোথায় বারনার আর ডোভার? আমরা যখন ওদের খোঁজায় ব্যস্ত, এই সুযোগে পালিয়ে চলে গেছে অন্য কোনখানে? হয়তো এই শহরের ভেতর দিয়েই গেছে।'

'অসম্ভব। কড়া নজর রাখছি আমরা।'

'একটা কথা আপনাকে বলতে ভুলে গেছি, মিস্টার জোনস, চিঠি পোস্ট করার জন্যে এখানে আসবেই বারনার। ইংল্যান্ডে একটা মেয়ের কাছে পাঠায়। চিঠি পাঠিয়ে যোগাযোগ রাখার জন্যে আবারও আসবে সে।' নাক চুলকাল ওমর। 'একটা ব্যাপার ভারি অদ্ভুত লাগছে, এভাবে খোলাখুলি প্লেন নিয়ে ঢুকল কেন বারনার? লুকোছাপার চেষ্টাও করল না!'

'প্লেন চালাতে তেল দরকার। লুকাবে কিভাবে?'

'ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারত।'

'কাগজপত্র?'

'জাল করা যায়, ভাল করেই জানেন।'

'তাহলে পাসপোর্ট? পাসপোর্টও জাল করা যায়, তবে সেটা বড় বড় চোরডাকাতদের কাজ। বারনারও কি তেমন কেউ?'

'অসম্ভব কি?' এক মুহূর্ত দ্বিধা করল ওমর। 'তবে, একথাটা কিন্তু তলিয়ে ভাবিনি। আমি ধরেই নিয়েছিলাম, ব্রিটিশ পাসপোর্ট নিয়ে এসেছে। আসার আগে লন্ডনে পাসপোর্ট অফিসে খোঁজ নেয়ার কথা একবারও মনে হয়নি।'

'অসুবিধে নেই, বসুন, জেনে নিচ্ছি।' ফোনের দিকে হাত বাড়াল জোনস।

এয়ারপোর্টে ফোন করল সে। খানিকক্ষণ কথা বলে রিসিভার রেখে তাকাল

ওমরের দিকে। 'যা সন্দেহ করেছিলাম। ব্রিটিশ পাসপোর্ট নিয়ে আসেনি। সাউথ আফ্রিকান। তারমানে দক্ষিণ আফ্রিকার নাগরিকত্ব রয়েছে তার।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেছে ওমরের। বিশ্বাস করতে পারছে না। মাথা নাড়ল অনিশ্চিত ভঙ্গিতে। 'আমি একটা গর্দভ! লন্ডনে খোঁজ নিলেই...'

'ভুল আমরা সবাই করি, মিস্টার ওমর,' ধীরে ধীরে বলল জোনস। 'একটা কথা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন এখন, ইচ্ছে করেই আসার চিহ্ন গোপন করেনি বারনার। সে চেয়েছে তাকে অনুসরণ করা হোক।'

'কিন্তু কেন?' নিজেকেই প্রশ্নটা করল ওমর।

'সেটা আপনিই ভাল বুঝবেন। ও আপনাকে এখানে টেনে আনতে চেয়েছে, তার বেশি না। আপনিও এসেছেন, সে-ও বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে।'

'ঠিক বলেছেন আপনি, মিস্টার জোনস। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে, অনেক সাহায্য করেছেন।' কঠোর হলো ওমরের চেহারা। 'তবে পালিয়ে বাঁচতে পারবে না। আমি তাকে খুঁজে বের করবোই!'

'উইশ ইউ গুড লাক।'

পুলিশ স্টেশন থেকে বেরিয়ে এল কিশোর আর ওমর।

'গরু ভাবছে আমাদেরকে জোনস,' বাইরে বেরিয়েই বলল কিশোর।

'গরুর মত কাজ করেছি, আর কি ভাববে? শুরু থেকেই সন্দেহ হচ্ছিল আমার, সব কিছু বড় বেশি সহজ ভাবে ঘটে যাচ্ছে। গুরুত্ব দেইনি...'

'কিন্তু এসব কেন করছে বারনার?'

'হয়তো কাউকে বাঁচানোর জন্যে।'

'কাকে?'

'নাম তো একটাই মনে আসছে। মিস নিনা কলিনস।'

'কেন? কেন নিজের বাপের জিনিস, যা তার নিজের জিনিসও বটে, চুরি করে আরেকজনের হাতে তুলে দেবে?'

'এই প্রশ্নের জবাব জানলে তো আরও অনেক কিছুই জেনে যেতাম।'

সেদিন অবস্থার পরিবর্তন হলো।

ওড়াটা শুরু হলো অন্যান্য দিনের মতই। উত্তরে এগোল ওরা। অনেকখানি এগিয়ে বাঁয়ে ঘুরে লম্বা চক্কর নিয়ে ফিরে আসতে লাগল এয়ারপোর্টে। প্রথম চোখে পড়ল কিশোরের। চেঁচিয়ে উঠল, 'আরি দেখুন দেখুন! ওটা কি?'

প্লেন ঘোরাল ওমর। দূর থেকে কিশোর যা দেখেছে, সেটাকে আরও কাছে থেকে দেখতে চলল। একটা ধ্বংসস্তূপ। বাড়িঘর ছিল ওখানে একসময়।

'ম্যাপে তো কিছুই দেখছি না!' ওমর বলল। বলতে বলতে আরও নিচে নামাল প্লেন, স্তূপটার একশো ফুট ওপরে নিয়ে এল। ধীর গতিতে চক্কর মারতে লাগল জায়গাটার ওপর।

'নেমে দেখবেন নাকি?'

'এখান থেকেই তো দেখা যাচ্ছে, নেমে আর কি হবে? প্লেন, জীপ কোন কিছুর চিহ্নই নেই। ফিরে গিয়ে জোনসকে জিজ্ঞেস করতে হবে জায়গাটার কথা।'

আবার ওপরে উঠিয়ে আনল প্লেন। মাটির কাছাকাছি গরম বেশি, অনেক

বেশি বাম্প করছিল বিমান। হাজার ফুট ওপরে উঠে শান্ত হয়ে এল, কমে গেল ঝাঁকুনি। আর ওপরে উঠল না। নিচে নজর রেখে এগিয়ে চলল সোজাসুজি, ধ্বংসস্তূপ পেছনে ফেলে উইন্ডহোয়েক এয়ারপোর্টের দিকে। যতদূর চোখ যায়, জীবনের কোন চিহ্নই দেখা গেল না।

মিনিট পনেরো পরে, পঞ্চাশ-ষাট মাইল পেরিয়ে এসে আবার চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। হাত তুলে দেখাল। অনেকখানি জায়গা জুড়ে জন্মে রয়েছে ঝোপঝাড়। জীবজন্তু অনেক আছে। গত কয়েক দিনে একই জায়গায় এত জানোয়ার আর দেখেনি কোনখানে। তারমানে, কাছাকাছিই কোথাও রয়েছে পানির উৎস।

'ওটা কি?' হাত তুলে দেখাল কিশোর। 'দুর্গ না মন্দির?'

কাছাকাছি প্লেন নিয়ে গেল ওমর। প্রায় এক একর জায়গার ওপর তৈরি হয়েছে দালানটা। হু হু বাতাস আর বালির সাগরের মাঝে কেমন যেন নগ্ন, বিষণ্ণ, নির্জন। 'এটাও তো নেই ম্যাপে! দাগ দিয়ে রাখো।'

'কিন্তু এখানে এই বাড়ি কারা বানিয়েছিল? কেন?'

'পুরনো কোন দুর্গ-টুর্গ হবে। বাবারে বাবা, কত বড়!'

'কারা বানিয়েছিল? প্রাচীন মিশরীয়রা?'

'মনে হয় না। মিশরীয়রা এদিকে এসেছে বলে শুনিনি। তা ছাড়া বাড়িটা ততো পুরনো লাগছে না। দেখছ না, সিমেন্ট আর কংক্রীটে তৈরি?' আরও নিচে নেমে এসে বাড়িটার ওপরে চক্কর দিতে লাগল ওমর। 'আরেকটা ব্যাপার লক্ষ করেছ? জানোয়ারগুলো ওটার কাছে ঘেঁষছে না। ভয় পায় মনে হচ্ছে।'

'নামবেন?'

আশপাশের মাটি দেখল ওমর। 'চেষ্টা করলে ল্যান্ড করানো যায়। কিন্তু দেখছি না তো কিছু। নেমে কি হবে? জোনসকে জিজ্ঞেস করব। নিশ্চয় ওর জানা আছে।'

মিনিট পাঁচেক পর। ঝোপঝাড়ের মাঝে এক জায়গায় জটলা বেঁধে রয়েছে চ্যাপ্টা-মাথা কয়েকটা বড় বড় গাছ। তার ওপর দিয়ে চলেছে বিমান, হঠাৎ তীক্ষ্ণ একটা শব্দ হলো। কি যেন আঘাত করল বিমানের গায়ে। দ্রুত কন্ট্রোলে চোখ বুলিয়ে নিল ওমর। দু'পাশের ডানা দেখল। না, যন্ত্রপাতিতে তো কোন অসঙ্গতি নেই! ডানাও ঠিক আছে, কোন গোলমাল হয়েছে বলে মনে হয় না। তাহলে?

'কি ব্যাপার?' কিশোরও সতর্ক হয়ে উঠেছে।

জবাব দিল না ওমর। আরেকবার চোখ বোলাচ্ছে কন্ট্রোল প্যানেলের ওপর।

'আওয়াজটা কিসের?' আবার প্রশ্ন করল কিশোর।

'মনে হলো রাইফেল!'

'বুলেট! আমাদেরকে সই করে গুলি করেছে? কোত্থেকে করেছে? কেন?'

'তিনটে প্রশ্নের একটার জবাব দিতে পারব। গুলি করেছে ওই গাছগুলোর আড়াল থেকে। কোথায় লেগেছে বলতে পারব না। আর কেন...' কি মনে হতে কথাটা শেষ না করেই উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল ওমর, 'জলদি ফিরে যেতে হবে। তেলের ট্যাংকে লেগে থাকলে সর্বনাশ হবে! কোনমতেই ঘোরাঘুরির রিস্ক আর নিতে পারব না এখন!' গতি বাড়িয়ে দিল সে। প্লেনের নাক উঁচু করে শাঁ করে উঠে এল ওপরে।

পথে আর কোন বিপত্তি ঘটল না। নিরাপদেই এয়ারপোর্টে ফিরে এল ওরা। ল্যান্ড করেই ককপিট থেকে নেমে এল ওমর। কিশোরও নামল।

গুলির ছিদ্রটা খুঁজে বের করল ওমর। বাঁয়ের ডানায় গোল ছোট একটা ছিদ্র। গম্ভীর হয়ে বলল সে, 'বুলেটই। ক্ষতি কিছুই হয়নি...'

'তারমানে, সত্যি ছিল কেউ ওখানে।'

'গাছের আড়ালে এমনভাবে লুকিয়েছিল, যাতে ওপর থেকে দেখা না যায়। আর ব্যাটার নিশানা বড় সাংঘাতিক। উড়ন্ত প্লেন সই করে একটামাত্র গুলি ছুঁড়ল, আর সেটাই লাগিয়ে দিল!'

'তারমানে ইচ্ছে করলে আমাদেরকে খতম করে দিতে পারত?'

'তা পারত। প্রথমবার হুঁশিয়ার করে ছেড়ে দিল আমাদের। বুঝিয়ে দিল, নাক গলাতে গেলে ভাল হবে না।'

'কে? বারনার?'

'হতে পারে। কিংবা তার দোস্ত ডোভার। বুশম্যানেরা নয়, এটা শিওর। ওরা রাইফেল ব্যবহার করে না। চলো, জোনসের সঙ্গে কথা বলে আসি।'

নয়

এবারও অফিসেই পাওয়া গেল জোনসকে।

'আবার এলাম বিরক্ত করতে,' ওমর বলল।

'করুন।'

'কিছু জিনিস দেখে এলাম আজ। কালাহারিতে।'

'কি এমন দেখলেন?'

'প্রথমত, একটা শহর। মানে শহরের ধ্বংসাবশেষ। ম্যাপে ওটা দেখানো থাকলে অবাক হতাম না।'

মৃদু হাসি ফুটল জোনসের মুখে। 'হুঁ। আপনারাও তাহলে সেই হারানো নগরী দেখে এসেছেন।'

'হারানো নগরী!' উৎসুক কণ্ঠে জানতে চাইল, 'কারা হারাল? কবে?'

'জানা যায়নি। কফি চলবে?'

মাথা কাত করল ওমর আর কিশোর দু'জনেই।

'আফ্রিকায় হারানো শহর আর হারানো গোত্রের অনেক কাহিনী চালু আছে,' বলতে শুরু করল জোনস। 'আপনারা যেটা দেখেছেন, ওটা আরও কয়েকজনে দেখেছে বলে দাবী করেছে। বছর কয়েক আগে দু'জন দুঃসাহসী প্রসপেক্টর গরুর গাড়িতে করে কালাহারি পাড়ি দেয়ার চেষ্টা করেছিল। আসলে ওরা গিয়েছিল হীরা আর সোনার খোঁজে। পাড়ি দেয়ার কথাটা পুরোপুরি মিথ্যে, ধাপ্পাবাজি। ওরা

রওনা হয়েছিল বৃষ্টির পরে। মাঝে মাঝে বৃষ্টি এখানেও হয়, খুবই কম। কিছু কিছু গর্তে পানি জমে ছিল। ফলে অনেক দূর এগোতে পেরেছিল ওরা। চলে গিয়েছিল একটা শুকনো নদীর কিনার পর্যন্ত, সম্ভবত ওটা কোন মরা নদী। ফিরে এসে জানাল ওই নদীর পাড়ে একটা শহরের ধ্বংসস্তূপ দেখে এসেছে। দেখে নাকি ওদের মনে হয়েছে, অনেক প্রাচীন শহর ওটা, ধ্বংস হয়েছে ভূমিকম্পে। কেউ বিশ্বাস করেনি তাদের কথা।'

'কেন?' প্রশ্ন করল কিশোর। 'করল না কেন? মিথ্যে বলে ওদের কি লাভ?'

'আমি কি জানি। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করেনি লোকের, করেনি। দু'জনের একজনের কাছে একটা ক্যামেরা ছিল। ছবি তুলে এনেছে স্তূপটার। ক্যামেরাটা পুরনো আমলের, গরমও ছিল ভীষণ, ফলে প্লেট গিয়েছিল নষ্ট হয়ে। ছবি যা এসেছিল, দেখে কিছুই বোঝার উপায় ছিল না। লোকে একনজর দেখেই বলে দিল : শহর না কচু, আসলে পাথরের স্তূপ।'

'আপনার কি ধারণা?'

'বিশ্বাস হয়, আবার হয়ও না। তবে থাকতে পারে ওরকম স্তূপ। ধুলোঝড়ের ঠিক-ঠিকানা নেই মরুভূমিতে। যখন ঝড় বয়, ঢেকে যায় স্তূপ। ঝড়ের পরে আবার কয়েক দিনের বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায় বালি, বেরিয়ে পড়ে স্তূপ। এ-জন্যেই কেউ দেখে, কেউ দেখে না। ঝড়ের পর পরই যারা যায় তারা দেখে না, বেশ কিছুদিন পার করে দিয়ে যারা যায় তারা দেখে। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ব্যাপারটাও বোধহয় সে-কারণেই আসে।'

'পুলিশ না হয়ে আর্কিওলজিস্ট হওয়া উচিত ছিল আপনার,' হেসে বলল ওমর। 'আমরা যে দেখে এসেছি সেকথা বিশ্বাস করছেন তো?'

'করছি এ-কারণে, আপনারাও আমার মতোই পুলিশ। কিন্তু গেছিলেন তো চোর ধরতে, পুরনো শহরের ব্যাপারে আগ্রহ কেন?'

'প্লেন কিংবা জীপ লুকানো থাকতে পারে ওসবের আড়ালে।'

'কোন চিহ্ন দেখেছেন?'

'না।' কাপের অবশিষ্ট কফিটুকু দুই চুমুকে শেষ করল ওমর। 'ফেরার পথে আরও একটা জিনিস দেখলাম। একটা বাড়ি।'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল জোনস, 'এই একটা জায়গায় কোন রহস্য নেই। পুরনো দুর্গ। জার্মান। বিশ্বযুদ্ধের আগে আর যুদ্ধ চলাকালে প্রচুর বানিয়েছিল জার্মানরা। মরুভূমিতে মাঝে মাঝেই দেখতে পাবেন ওরকম দুর্গ। ঠিক কোথায় দেখেছেন, বলুন তো?'

ম্যাপ খুলে দেখাল কিশোর।

'হুঁ,' মাথা দোলাল জোনস, 'ফোর্ট শুয়ার্জ। আমি দেখিনি কখনও, এত দূরে যাইইনি। জার্মানদের বানানো দুর্গগুলো প্রায় সবই একরকম। তেমন কিছু দেখার নেই। চারকোনা বাড়ি, ভেতরে কুয়া কেটে পানির ব্যবস্থা। এখন আর কোন দুর্গেই মানুষ থাকে না, সব পোড়ো।'

'আমার তা মনে হলো না,' শুকনো গলায় বলল ওমর।

'মানে? দেখেছেন নাকি কিছু?'

'দেখিনি, তবে আমাদের দেখেছে। দুর্গের খানিক দূরে গাছের আড়াল থেকে। গুলিও করেছে।'

হাসি মুছে গেল জোনসের মুখ থেকে। 'কি বলছেন?'

'ঠিকই বলছি। গুলির আওয়াজ শুনেছি, প্লেনের গায়ে গুলি লেগেছে সেটাও টের পেয়েছি। তারপর এয়ারপোর্টে ফিরে ছিদ্রটাও দেখেছি।'

গম্ভীর হয়ে গেছে জোনস। 'হুঁ! শ্বেতাঙ্গ তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কে?'

'বারনার আর ডোভার ছাড়া আর কেউ আছে?'

'আর কারও কথা তো জানি না। পুব থেকে আসা কোন শিকারী হতে পারে। কিংবা উত্তরের পর্তুগীজ এলাকা থেকে আসা কেউ।'

'বুশম্যান নয়, এটা শিওর তো?'

'হ্যাঁ। বুশম্যানরা বন্দুক পছন্দ করে না। আদি ও অকৃত্রিম তীর-ধনুকই তাদের প্রিয়। আধুনিক অস্ত্রের ওপর ভরসা করতে পারে না। যা-ই হোক, ওই ফোর্টের কাছে আর না যাওয়াই উচিত।'

'কেন? আমার তো মনে হয় যাওয়াই উচিত। এতো দিন তো খালি খালি ঘুরেছি, এই প্রথম একটা ঘটনা ঘটল।'

'কি, আবার যেতে চান ওখানে?'

'চাই।'

'দেখুন, যাওয়ার আগে ভাল করে ভেবে দেখবেন। আমাদের প্লেন নেই। যদি কোন বিপদে পড়ে যান, আমাদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার আশা করবেন না।'

'এর আগেও অনেকবার ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেছি আমরা মিস্টার জোনস। এরচেয়ে কোন অংশেই কম বিপজ্জনক ছিল না ওগুলো।'

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল জোনস। 'কখন রওনা হতে চান?'

'কাল।'

'নামবেন ওখানে?'

'নামব।'

'বেশ। ফিরে না এলে এটুকু অন্তত জানা থাকল আমার, কোথায় মিলবে আপনাদের লাশ!'

দশ

পরদিন সকাল সকালই আকাশে উড়ল দুই বৈমানিক। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করার জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে ওমর। অনেক সময় ব্যয় করে ফেলেছে ছোট্ট একটা কাজের জন্যে। যে-কোন দিন ডেকে পাঠাতে পারেন এয়ার কমোডোর। কাজ শেষ না করেই ফিরে যেতে হবে তখন। আর এটা ওমরের স্বভাব-বিরুদ্ধ।

কোন কাজে হাত দিলে সেটা শেষ না করা পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই।

সোজা ফোর্ট শুয়ার্জের দিকে চলল ওরা। এই সকাল বেলায়ই ভীষণ কড়া হয়ে উঠেছে রোদ। মেঘ-শূন্য নীল আকাশ থেকে নিচের পাথুরে মাটিতে যেন আগুন ঢালছে সূর্য।

বুনো জায়গাটার ওপর চলে এল বিমান। ঝোপঝাড়ের মাঝে খাটো জাতের গাছই বেশি। আর বড় যা আছে, সব অ্যাকেইশা। অ্যাকেইশার একটা জটলা থেকেই গুলি ছোঁড়া হয়েছিল আগের দিন। আজ জন্তু-জানোয়ার বিশেষ চোখে পড়ল না, সব যেন কোন যাদুর ছোঁয়ায় গায়েব হয়ে গেছে। ছড়ানো-ছিটানো কয়েকটা উটপাখি পরিবারকে শুধু দেখা গেল। বিমানের শব্দ শুনেই ভয় পেয়ে দিল দৌড়।

গাছপালাগুলোর ওপর সাবধানে চক্কর দিতে লাগল ওমর। নিচে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে। রাইফেলের নিশানা হতে চায় না। 'কিছু দেখছ?'

মাথা নাড়ল পাশে বসা কিশোর। 'কিছু না। প্লেন বা জীপ থেকে থাকলে ঢেকে রাখা হয়েছে। ওপর থেকে চোখে পড়বে না।'

ঘুরে ঘুরে একশো ফুটের মধ্যে বিমান নামিয়ে আনল ওমর। মস্ত ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছে। রাইফেল নিয়ে অপেক্ষা করে বসে থাকলে সহজেই এখন শেষ করে দিতে পারে তাকে, লোকটার যা নিশানা!

কিন্তু কিছুই ঘটল না। কিছু নড়ল না।

'এখানে নামবেন?'

'না,' জবাব দিল ওমর। 'দেখি, সামনে কোথাও। বাড়িটার কাছে। নিশ্চয় বনের ভেতরে বাস করে না বারনার বা ডোভার। থাকলে ওই ফোর্টেই থাকবে।'

বাড়িটার কাছে এসে ঘুরতে লাগল ওমর। ল্যান্ড করার জন্যে সুবিধেমতো জায়গা খুঁজছে। খোলা অঞ্চল। কিন্তু শুধু খোলা হলেই চলবে না, প্লেন নামাতে হলে ভূমি সমতল হতে হবে। এক ধারে গভীর একটা খালমতো দেখা গেল, পানি নেই। হয় মরা নদী, নয়তো শুকনোর সময় বলে এখন পানি নেই ওটাতে। বৃষ্টি এলে ভরে যাবে, তীব্র স্রোত বইবে, দু'পাশের মাটিকে ভিজিয়ে দিয়ে আবার শুকিয়ে যাবে দেখতে দেখতে। ভেজা মাটিতে কিছু উদ্ভিদ জন্মাবে, তারপর ধুঁকতে থাকবে আরেকটা বর্ষা আসার অপেক্ষায়। বাড়িটা আগের মতোই নির্জন। জীবনের চিহ্ন নেই। প্লেন কিংবা জীপের চাকার দাগও চোখে পড়ল না। দ্বিধা দেখা দিল ওমরের চোখে। অযথাই কষ্ট করছে না তো? ভাবল অনেক। শেষে ঠিক করল, এসেই যখন পড়েছে, না দেখে যাবে না। কিছু পেলে পেল না পেলে নেই, শিওর তো হওয়া যাবে।

দুর্গের একধারে বাড়িটা থেকে খানিক দূরে সমতল জায়গা রয়েছে, পাথর নেই, বালি বেশি। ল্যান্ড করা সম্ভব। দক্ষ পাইলট ওমর। সহজেই নামিয়ে ফেলল। এঞ্জিন বন্ধ করল না, সীটে বসে রইল চুপচাপ। ফোর্টের সদর দরজার দিকে চোখ। কোন রকম বিপদ দেখলেই আবার উড়াল দেবে।

এক মিনিট কাটল। দুই…তিন…না, কেউ বেরোল না। এঞ্জিন বন্ধ করে দিল ওমর। কিশোরকে বলল, 'বসে থাকো। আমি নামছি। না বললে নামবে না।'

লাফ দিয়ে নামল ওমর। গেটের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে।

অপেক্ষা করল আরও কয়েক মিনিট। তারপর ডাকল কিশোরকে, 'নেমে এসো।'

গেটের দিকে এগোল দু'জনে। কোন নড়াচড়া নেই, নেই কোন শব্দ। শুধু হু হু করে বয়ে যাচ্ছে মরুর মাতাল হাওয়া, দুর্গের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে আর ফাঁক-ফোকর দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বিচিত্র আওয়াজ তুলছে। গেটটা এতো চওড়া, ইচ্ছে করলে ওমররা যে রকম বিমানে করে এসেছে, ওই সাইজের বিমান ট্যাক্সিইং করে গেটের ভেতরে ঢুকিয়ে নেয়া যায়।

পাথরের মত শক্ত মাটি। একটা ব্যাপার লক্ষ করেছে ওমর আর কিশোর দু'জনেই, প্লেনের চাকার দাগ প্রায় পড়েইনি। খুব সামান্য। সেটাও বালিতে ঢেকে গিয়ে দ্রুত মুছে যাচ্ছে। কাজেই প্লেন যদি এখানে নেমেই থাকে, চিহ্ন থাকার কথা নয়। গাড়ির চাকার দাগও থাকবে না।

ভেতরে ঢুকল ওরা। বিরাট এক চত্বর, প্যারেড গ্রাউন্ড, এককালে প্যারেড করা হত ওখানে। এখন মৃত্যুপুরীর মত নীরব।

জোনস সত্যিই বলেছে, দেখার কিছু নেই। মূল বাড়িটা, দুর্গের হেডকোয়ার্টার ছিল যেটা, সেটাই শুধু দোতলা। অনেকটা মধ্যযুগীয় দুর্গের মতো দেখতে। ঢোকার একটিমাত্র দরজা, হাঁ হয়ে খুলে রয়েছে। দুইতলায় দুই সারি জানালা, ওগুলোতে মোটা লোহার গরাদ। নিচতলায় জানালা থেকে কিছু গরাদ খুলে নেয়া হয়েছে। নিশ্চয় বুশম্যানদের কাজ, অনুমান করল ওমর। ছুরি আর তীরের ফলা বানানোর জন্যে খুলে নিয়েছে।

প্যারেড গ্রাউন্ডের এক প্রান্তে সারি সারি ঘর; স্টোর রুম, আস্তাবল, এসব। একটা ঘরের সামনে বড় একটা লোহার পাত্র পড়ে আছে, পাশে রয়েছে মরচে ধরা পাম্প। পানি তোলার ব্যবস্থা। পাম্প দিয়ে পানি তুলে পাত্রে রাখা হতো। এখন শুকনো। পাত্রটায় এখন পানির বদলে জমে রয়েছে বালি।

আরেক ধারে আরও কিছু বড় বড় ঘর। কোন কোনটার দরজা এতো বড়, সহজেই জীপ ঢোকানো যাবে। তবে প্লেন ঢোকানো সম্ভব না, যতো ছোটই হোক।

একদিকের শেষ মাথায় দেয়ালের গায়ে কালো একটা দাগ দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওমরের। 'ওটা কী?'

'আগুন। পোড়ানো হয়েছে কিছু,' বলল কিশোর। 'চলুন না গিয়ে দেখি।'

পোড়া দাগের পাশে একটা স্তূপ। ইঁট, পাথর, দালানের ভাঙা রাবিশ। বিড়বিড় করল ওমর, 'স্তূপটা নতুন মনে হচ্ছে!'

কাছে এসে নিশ্চিত হলো ওরা, আগুনই লেগেছিল। স্তূপের পাশ দিয়ে আধপাক ঘুরে এসেই চমকে গেল দু'জনে। কিসে আগুন লেগেছিল বুঝতে পেরে। একটা পোড়া বিমানের ধ্বংসাবশেষ পড়ে রয়েছে। ফ্রেমের সবচেয়ে কঠিন ধাতব অংশগুলো পোড়েনি, এঞ্জিন দুটোও মোটামুটি আস্তই আছে। বাকি সব শেষ। অ্যালুমিনিয়ামের বডি গলে পড়ে রয়েছে মাটিতে।

পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। কারও মুখে কথা নেই।

চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা অবশেষে ফোঁস করে ছাড়ল ওমর। 'কি করে পুড়ল!'

'বারনারের মারটিন প্লেনটা?'

'তাই তো মনে হয়। টুইন এঞ্জিন···যাক, পেলাম শেষে···'

'এটা আশা করিনি! কি করে হলো?'

'জানি না,' মাথা নাড়ল ওমর।

'দেয়ালে ধাক্কা লাগিয়েছিল নাকি?'

জবাব দিল না ওমর। ভাবছে।

'কিংবা,' আবার বলল কিশোর, 'এখানে পার্ক করে রেখেছিল। বের করার সময় লাগিয়েছে ধাক্কা।'

পোড়া বিমানটার কাছে এগিয়ে গেল ওমর। 'পাইলটের লাশটা কই? যদি ধাক্কাই লাগিয়ে থাকে?···অবশ্য কেউ বের করে নিয়ে গিয়ে কবর দিয়ে ফেললে···'

'ডোভার?'

'হতে পারে।'

'তাহলে আর এখানে থাকার কোন মানে হয় না আমাদের,' বলল কিশোর। 'বারনার মরে গিয়ে থাকলে গহনাগুলোও গেল। আর পাওয়া যাবে না। বাড়ি ফিরে যেতে পারি আমরা।'

'বারনার যে সত্যি মরেছে, তার প্রমাণ কই? আর অ্যাক্সিডেন্টেই যে প্লেনটা পুড়েছে, একথাও শিওর করে বলা যাচ্ছে না।'

'তাহলে কিভাবে পুড়েছে? আর বারনারই বা কই?'

'এসো, আরও খুঁজে দেখি। কোন সূত্র পাওয়া যেতে পারে।'

কাছের ঘরগুলোর দিকে এগোল ওমর। হাঁটতে হাঁটতে থমকে দাঁড়াল, একটা দেয়ালের ধারে দালানভাঙা রাবিশের আয়তাকার আরেকটা স্তূপ দেখে থমকে দাঁড়াল কিশোর। চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল, 'ওটা কি?'

'পুরনো রাবিশের স্তূপ, আর কি?' ওমর বলল।

ভ্রূকুটি করল কিশোর। 'আকারটা দেখেছেন?'

'দেখছি তো।' মাথা নাড়ল ওমর, 'বুঝতে পারছি না। কী?'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে আপন ভাবনায় ডুবে গেল কিশোর।

জবাব না দিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল ওমর।

একটা ঘরের দরজার সামনে এসে ভেতরে উঁকি দিল। পাল্লা নেই এখন দরজায়, খসে পড়েছে। প্রচুর আলো ঢুকছে ভেতরে। খড় রাখার তাক দেখা গেল। বোঝা গেল ওটা আস্তাবল ছিল। তার পাশের ঘরের দরজায় গিয়ে উঁকি দিল। ওটাতেও কিছু নেই।

'কি খুঁজছি আমরা?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল কিশোর।

তৃতীয় আরেকটা দরজার কাছে এসে থামল ওমর। হাত তুলে দেখাল, 'বোধহয় ওরকম কিছু।'

কিশোরও দেখল, দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে একটা গাঁইতি আর একটা বেলচা।

পরের দরজাটার দিকে এগোল ওমর। কাছে এসে ভেতরে উঁকি দিয়ে থমকে দাঁড়াল আবার। ধাতুর একটা পাত্রের দিকে তাকিয়ে আছে। 'বুঝতে পারছ কিছু?'

'গাঁইতি দেখলাম, বেলচা দেখলাম। এখন এই প্যান। প্রসপেক্টরদের জিনিস। সোনা আর হীরা ধোয়া হয় ওসব প্যানে, না?'

'হ্যাঁ।'
'আমার মনে হয় আরও কোন কাজ হয়। ভাল করে দেখুন।'
'আর তো কিছু বুঝতে পারছি না।'
'কিছুই অদ্ভুত লাগছে না?'
'না তো!'
'পানি রয়েছে ওটাতে। এই গরমে বড়জোর দু'ঘণ্টা লাগবে ওই প্যান থেকে বাষ্প হয়ে পানি উড়ে যেতে...'

'তারমানে একটু আগে কেউ রেখে গেছে।' কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে ফেলল ওমর। সাবধানে তাকাল এদিক ওদিক। নাক কুঁচকাল। একটা বোটকা গন্ধ নাকে আসছে।

গন্ধটা কিশোরও পেয়েছে।

হঠাৎ শিকল ঝনঝন করে উঠল। দরজার পাশে ঘরের আবছা অন্ধকার কোণ থেকে শোনা গেল চাপা গর্জন। লাফিয়ে বেরিয়ে এলো জানোয়ারটা।

চিতাবাঘ!

এগারো

কে যে কার আগে দৌড় দিয়েছে বলতে পারবে না। পিস্তল বেরিয়ে এসেছে ওমরের হাতে। ওরকম একটা জানোয়ারের বিরুদ্ধে এই অস্ত্র কিছুই না। দাঁড়িয়ে গেল হঠাৎ। ফিরে তাকাল। দরজার বাইরে এসে থেমে গেছে বাঘটা। গলায় শিকল বাঁধা, আর এগোতে পারছে না।

মাটিতে পেট ঠেকিয়ে শুয়ে পড়েছে চিতাবাঘ। লাফ দেয়ার ভঙ্গিতে। ঘাড়ের রোম দাঁড়িয়ে গেছে। লেজ দিয়ে বাড়ি মারছে মাটিতে। গলার গভীর থেকে বেরিয়ে আসছে চাপা ঘড়ঘড়। তেড়ে এসে আটকা পড়ায় রাগ অনেক বেড়ে গেছে ওটার।

ওমরের দিকে চেয়ে নার্ভাস ভঙ্গিতে হাসল কিশোর। 'এই রোদ আর গরম মাথা খারাপ করে দিয়েছে!'

'আমারও! সামান্যতেই চমকে উঠছি। মগজ গরম হয়ে গেছে।' চিতাবাঘটার দিকে তাকাল। 'বয়েস হয়নি। বাচ্চা।'

'বাচ্চা হলেও বাঘের বাচ্চা। তেজ দেখেছেন!'

'তা তো দেখছি। কিন্তু কে এনে বাঁধল? ওই পানি ওটার খাবার জন্যেই রেখে যাওয়া হয়েছে।'

'আর কে? নিশ্চয় ডোভার।'

ঘুরল দু'জনেই। আবার আয়তাকার স্তূপটার ওপর চোখ পড়ল ওমরের। 'ওটা দেখে তোমার কি মনে হয়েছে বললে না কিন্তু? কি আছে ওটার তলায়?'

'আপনি যা ভাবছেন আমিও সে-কথাই ভাবছি।'

'লাশ!...মা-মানে...বারনারের...'

ঘুরিয়ে জবাব দিল কিশোর, 'আমাদের জানামতে এদিকে মাত্র দু'জন লোক এসেছে। ডোভার আর বারনার। প্লেনটা যেহেতু বারনারের, কাজেই...।' কথাটা শেষ করল না সে। 'আর ওই প্যানে দেখুন পানি রয়েছে। দিয়ে গেছে কেউ। চিতাবাঘের সঙ্গে কার সম্পর্ক বেশি?'

'ডোভার! তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু কবরের ওপর রাবিশ ফেলার কি অর্থ?'

'বোধহয় হায়েনা। বন্ধুর লাশ কবর দিয়েছে ডোভার। হায়েনারা যাতে তুলে নিয়ে যেতে না পারে সে-জন্যেই ওই ব্যবস্থা করেছে।'

'সত্যি তাহলে ভাবছো ওটার নিচে লাশ আছে?'

'ভাবছি।'

'তাহলে তো দেখা দরকার, তোমার অনুমান ঠিক কিনা। গাঁইতি আছে, বেলচাও আছে, খুঁড়তে অসুবিধে হবে না।'

'এত কষ্টের দরকারটা কি? চুপ করে বসে থাকি না। ডোভার এলে তাকে জিজ্ঞেস করলেই সব জানা যাবে। চিতাবাঘটাকে যখন ফেলে গেছে, ফিরে সে আসবেই।'

অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওমরের দিকে তাকাল কিশোর। 'তা-ই ভাববেন? প্লেনটা কি করে পুড়েছে জানি আমরা? বারনার যদি মরেই থাকে, কিভাবে মরেছে সেটা জানি? তার সঙ্গে দামী জিনিস ছিল। ওগুলোর জন্যে খুন হয়ে যাওয়াটা অসম্ভব নয়...'

'মানে...মানে, তুমি বলতে চাইছ... ডোভার...'

'অসম্ভব নয়,' আবার একই কথা বলল কিশোর।

'কিন্তু পোড়ার সময় যা গরম হয়েছিল, পাথর আর অলংকার সবই পুড়ে নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা...'

'এমনও তো হতে পারে, আগে পাথরগুলো কেড়ে নেয়া হয়েছে। তারপর প্লেনের মধ্যে বারনারকে ভরে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। পুড়ে যাওয়ার পর লাশটা বের করে কবর দেয়া হয়েছে।' ওমরকে চুপ করে থাকতে দেখে বলল কিশোর, 'একটা কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না আমি, বারনারের মত দক্ষ পাইলট আর যা-ই করুক, বের করার সময় ধাক্কা লাগিয়ে প্লেনে আগুন লাগাবে না।'

'লাশটা আগে দেখি, আরও তথ্য পাওয়া যেতে পারে। চলো, জলদি করা দরকার। বলা যায় না, ফিরেও আসতে পারে ডোভার। আমাদেরকে কবর খুঁড়তে দেখে ফেললে বিপদে পড়ে যাব।'

আস্তাবলের দিকে হাঁটতে শুরু করল ওমর।

'ওমরভাই!' পেছন থেকে ডাকল কিশোর।

ফিরে তাকাল ওমর। 'কি?'

'শুনছেন?' কান পেতে রয়েছে কিশোর।

ওমরও শুনতে পেল। এঞ্জিনের শব্দ। দ্রুত এগিয়ে আসছে। এদিকেই।

'চলুন, লুকিয়ে পড়ি!'

'না। দাঁড়িয়ে থাকো। এমন ভাব দেখাবে, যেন কিছুই জানি না আমরা।'

মিনিটখানেক পরে গেট দিয়ে চত্বরে ঢুকল একটা জীপ। দু'জনের খানিক

দূরে থামল। পুরো আধ মিনিট চুপ করে বসে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল ড্রাইভার। তার পাশের সীটটা খালি। জীপের পেছনের অর্ধেকটা বালি-রঙের ক্যানভাসের হুড দিয়ে ঢাকা, ভেতরে কি আছে দেখা যায় না।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে ওমর। কিশোরও। চেয়ে রয়েছে জীপে বসা লোকটার দিকে।

অবশেষে নামল লোকটা। সাড়ে ছয় ফুট লম্বা বিশালদেহী এক দানব যেন। ডোভার ছাড়া কেউ না, বুঝতে অসুবিধে হলো না কিশোর কিংবা ওমরের।

ওদের সঙ্গে কোন কথা না বলে ঘুরে গিয়ে জীপের পেছন থেকে একটা মরা হরিণ টেনে বের করল ডোভার। ধড়াস করে মাটিতে ফেলল। ড্রাইভিং সীটের পাশের সীটে ফেলে রাখা রাইফেলটা হাতে নিয়ে এগিয়ে এল। কোমরের বেল্টে ঝুলছে আরেকটা জিনিস, একটা জ্যামবক, গণ্ডারের চামড়ায় তৈরি খাটো এক ধরনের ভয়ংকর চাবুক।

দরজার বাইরে বেড়ালের মত বসে আছে চিতাবাঘটা। কোমর থেকে চাবুক খুলে ওটার দিকে তুলল শুধু ডোভার। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে গিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকল জানোয়ারটা। বোঝা গেল, জ্যামবকের স্বাদ জানা আছে তার।

লম্বা লম্বা পায়ে এগিয়ে এল ডোভার। যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া, সুন্দর চেহারাটায় খুঁত করে দিয়েছে গালের কাটা দাগ। রোদে পোড়া চামড়ার রঙ সেগুন কাঠের মত। মাথায় হ্যাট নেই, লম্বা কালো চুল এসে পড়েছে কপালের ওপর, হ্যাটের কাজ চালিয়ে নিচ্ছে অনেকখানি। ঘন ভুরুজোড়া নাকের ওপরে মিশে এক হয়ে গেছে। বয়েস অনুমান করা মুশকিল। জোনস বলে না দিলে ওমর ভাবত, চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। আসলে ওরকমই দেখায়। গলাখোলা খাকি শার্ট আর ধুলোয় ধূসর প্যান্ট। শার্টের নিচের অংশ গুঁজে দিয়েছে প্যান্টের মধ্যে। কোমরে গুলির বেল্ট। পায়ে পুরনো রোপসোল ক্যানভাসের জুতো।

'কে আপনারা?' খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন।

'আমার নাম ওমর শরীফ। ও কিশোর পাশা।'

নামগুলো কোন রেখাপাত করল না ডোভারের মনে। 'এখানে কি?' কথার আইরিশ টান পুরোপুরি মুছে যায়নি এখনও।

হাসল ওমর। 'আমিও আপনাকে এই প্রশ্নটা করতে পারি।'

'ট্যুরিস্ট মনে হচ্ছে না আপনাদেরকে।'

'আমরা নইও।'

'প্রসপেক্টরস?'

'না।'

'তাহলে নিশ্চয়ই সারভেয়ার?'

'না, তা-ও না।'

'বেশ, যা খুশি হোন, আরও সাবধানে প্লেন পার্ক করা উচিত ছিল আপনাদের। আরেকটু হলেই ধাক্কা লাগিয়ে আমার জীপের সর্বনাশ করেছিলাম।'

'আমিও সেই কথাই বলতে পারি। আপনি আমার প্লেনের সর্বনাশ করতে যাচ্ছিলেন।'

ভুরু কোঁচকাল ডোভার। 'কি করে জানব ওখানে প্লেন নামানো হয়েছে?'

'আমিই বা কি করে জানব জীপ নিয়ে আসবে কেউ? যাকগে, ওসব তর্ক থাক। আপনি কি মিস্টার ডোভার?'

'হলাম। তাতে কি?'

'আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি। সাহায্যের আশায়। আমি একটা লোককে খুঁজছি, নাম জন বারনার। কিছু দিন আগে কালাহারিতে উড়ে এসেছিল, তারপর থেকে আর কোন খোঁজ নেই।'

'আমি সাহায্য করতে পারব ভাবলেন কেন?'

'আমাকে বলা হয়েছে, বারনার আপনার বন্ধু।'

'কে বলেছে?'

'উইন্ডহোয়াকের পুলিশ।'

'পুলিশকেও মানুষ বিশ্বাস করে নাকি!' মুখ ভেঙচাল ডোভার।

'আমরাও কিন্তু পুলিশ,' হেসে বলল ওমর। 'ইংল্যান্ড থেকে এসেছি।'

'আমি কিছু জানি না,' বদলে গেল ডোভারের কণ্ঠস্বর, কাটা কাটা জবাব। 'বারনার কে, চিনি না। নিজের কাজ করেই কূল পাই না, অন্যের ব্যাপারে নাক গলানোর সময় কোথায়?'

'তাই নাকি? তাহলে পুলিশকে ভুল ইনফরমেশন দেয়া হয়েছে। তারমানে আপনি আমাকে সাহায্য করবেন না?'

'না। অন্য কোথাও গিয়ে খুঁজুন।'

'কোথায় খুঁজব সেটা বলবেন?'

'না।'

'এখানে কি খুব বেশি আসেন আপনি?'

'এলে?'

'বারনার এলে আপনার জানার কথা।'

'প্রায়ই আসি। ওই চিতাবাঘটাকে খাওয়াতে। কাউকে দেখিনি।'

'ওটাকে বেঁধে রেখেছেন কেন?' এই প্রথম মুখ খুলল কিশোর।

'আমার খুশি।' কি ভাবল ডোভার। 'ওর মাকে গুলি করে মেরেছি আমি। ইচ্ছে করে মারিনি, আমাকে মারতে এসেছিল, তাই। বাচ্চাটাকে তো আর মরার জন্যে ফেলে আসতে পারি না। নিয়ে এসেছি।'

'নিশ্চয় চামড়ার জন্যে মা'টাকে মেরেছেন?'

'কি বললেন?' কঠোর হলো ডোভারের দৃষ্টি।

'বাদ দিন চিতাবাঘের কথা,' তাড়াতাড়ি হাত নাড়ল ওমর। 'বারনারের কথা বলুন। সে এখানে আসেনি?'

'এক কথা ক'বার বলব?'

'আশ্চর্য!'

'কী আশ্চর্য?'

'বারনার এখানে এসেছিল, অথচ আপনি তাকে দেখতে পেলেন না...'

'বারনার এসেছিল এত শিওর হলেন কি করে?'

'ওই যে ওখানে,' ধসে পড়া ঘরটার দিকে দেখাল ওমর, 'ওর বিমানটা পুড়ে পড়ে আছে।'

'তাই নাকি? আপনি শিওর?'

'নাহলে আর বলছি নাকি?'

'আশ্চর্য! আমি তো কই, খেয়াল করিনি! নিশ্চয় তাহলে আমি যখন বাইরে ছিলাম তখন ঢুকেছিল। শিকার করতে বেরোই…অন্য কিছু ভেবে বসবেন না আবার। খাবারের জন্যে শিকার করি।'

'আপনি এই মরুভূমিতে একলা কি করেন?'

'এটা কোন প্রশ্ন হলো নাকি? ভাল লাগে, তাই থাকি।'

'আর কেউ আসে এখানে?'

'আমার কাছে আসে না।'

'বারনারের কি হলো বুঝতে পারছি না। প্লেনের ভেতরে ওর লাশ নেই। কেউ সরিয়ে ফেলেছে।'

'সরাতে পারে। তবে আমি নই। এমনও হতে পারে, প্লেন নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর হেঁটে উইন্ডহোয়াকে রওনা হয়ে গেছে বেচারা বারনার।'

মাথা ঝাঁকাল ওমর। 'তারমানে আপনি বলতে চাইছেন কিছুই জানেন না?'

'না।'

'কিশোর, এখানে আর কোন আশা নেই,' বলল ওমর। 'চলো, যাই। উইন্ডহোয়াকেই ফিরে যাব।' ডোভারকে ধন্যবাদ দিল না, গুডবাই জানাল না। গেটের দিকে রওনা হলো সে।

বাইরে বেরিয়ে কিশোর বলল, 'ব্যাটার কথা বিশ্বাস করেছেন?'

'তুমি করেছ?'

'একটা কথাও না। লোকটা জাতমিথ্যুক। অনর্গল বলে গেল…' থেমে গেল কিশোর। ফিরে তাকাল দুর্গের দিকে। 'কি যেন শুনলাম!'

'কী?'

জবাব দিল না কিশোর। তাকিয়ে রয়েছে দোতলা বাড়িটার একটা জানালার দিকে। আস্তে করে বলল, 'কাকে যেন দেখলামও ওখানে। দাড়ি আছে। চেঁচানোর জন্যে মুখ খুলেছিল, যেন কিছু বলতে চেয়েছে!'

বারো

'ঠিক দেখেছ?' প্লেনে উঠে জিজ্ঞেস করল ওমর।

'তাই তো মনে হলো।'

'ডোভার কি কাউকে বন্দি করে রাখল!'

'কেন করবে? কাকে করবে?'

'বারনারকে?'

'নাকি আহত বারনারের সেবাযত্ন করছে ডোভার?'

'কি জানি! করতেও পারে। তবে ডোভার কিছু একটা করছে। চিতাবাঘ মারা ছাড়াও অন্য কিছু…'

'জানার উপায় কি?'

'বন্দি লোকটা। ওকে বের করে আনতে পারলে, কিংবা জিজ্ঞেস করতে পারলে…'

'কিভাবে?'

'সেকথাই ভাবছি। তাড়াহুড়ো করা উচিত হবে না। এখান থেকে গিয়ে কোথাও আগে প্লেনটাকে লুকাতে হবে। তারপর ফিরে এসে চোখ রাখতে হবে দুর্গের ওপর। এখন ডোভারকে বোঝাতে হবে আমরা উইন্ডহোয়াকে ফিরে যাচ্ছি।'

আকাশে উড়ল বিমান। জানালা দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। বলল, 'ব্যাটা আমাদের দিকেই চেয়ে আছে। চত্বরেই দাঁড়িয়ে আছে। এখনও।'

ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে লাগল ওমর। সরে এলো দুর্গের কাছ থেকে। সেই জঙ্গলটার কাছে, যেখানে জন্মে রয়েছে ঝোপঝাড়, বেঁটে গাছের বন আর অ্যাকেইশার জটলা। দুর্গ থেকে নিশ্চয় এখন আর বিমানটাকে দেখতে পাচ্ছে না ডোভার, এঞ্জিনের শব্দও শুনতে পাচ্ছে না।

এই জায়গাটার ওপর দিয়ে কয়েকবার উড়ে গেছে ওরা। কোথায় নামা যায়, আগেই দেখেছে ওমর। ল্যান্ড করল। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগল বটে, তবে প্লেনের কোন ক্ষতি হলো না। ট্যাক্সিইং করে এনে ওটাকে ঢুকিয়ে ফেলল বেঁটে গাছপালার আড়ালে। তারপর এঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে নেমে এলো।

কাছেই একটা চ্যাপ্টামাথা মিমোসা গাছ। তার ছায়ায় বসল দু'জনে। আবার ডোভার আর বারনারের আলোচনা শুরু করল।

পেছনে শোনা গেল ভারি পায়ের আওয়াজ।

ফিরে তাকাল কিশোর। 'হাতিটাতি নাকি?'

'মনে হয় না। হাতির এলাকা নয় এটা। আর হাতিরা থাকে দল বেঁধে, একলা নয়। তবে একআধটা পাগলা হাতি…না, তা-ও মনে হয় না।'

'কিন্তু শব্দ কিসের? কোন একটা বড় জানোয়ার নিশ্চয় আছে। মোষটোষ…' পেছনে মট করে শুকনো ডাল ভাঙতে থেমে গেল কিশোর। হঠাৎ বড় বড় হয়ে গেল চোখ। ফিসফিস করে বলল, 'দেখুন!'

ওদের কাছ থেকে বড়জোর পঞ্চাশ গজ দূরে, গাছের জটলার কিনারে বেরিয়ে এসেছে বিশাল এক গণ্ডার। ভাবসাব সুবিধের ঠেকছে না। রেগে আছে বোঝা যায়। বয়স্ক পুরুষ গণ্ডার, মস্ত তার শিং। পিঠে বসে আছে তিনটে পাখি, টিক বার্ড বলে ওগুলোকে, গণ্ডারের গা থেকে পরজীবী পোকা খুঁটে খায়।

'একদম চুপ!' ফিসফিসিয়ে বলল ওমর। 'পিস্তল বের করেছ কেন? খবরদার, গুলি করবে না!'

সাংঘাতিক সতর্ক পাখিগুলো। ফিসফিসানি শুনেছে, নাকি লোক দু'জনকে

চোখে কোনোটাই বোঝা গেল না। কিন্তু চিৎকার করে হুঁশিয়ারি জানিয়ে উড়াল দিল আকাশে। গণ্ডারটার ওপরে উড়ে উড়ে তীক্ষ্ণ চিৎকার করতে লাগল।

সতর্ক বাণী পেয়ে গেল গণ্ডার। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল। মাথা তুলে কুতকুতে চোখ মেলে তাকাল মরুভূমির দিকে। বাঁয়ে তাকাল, ডানে তাকাল, বিচিত্র ভঙ্গিতে নাড়ল তার খাটো লেজটা। দুশমনকে চোখে পড়লেই হয় একবার—

'নড়বে না!' হুঁশিয়ার করল ওমর। 'চোখে ভাল দেখে না ওরা। শব্দ না পেলে বুঝবে না আমরা কোথায় আছি।'

'প্লেনটা যদি দেখে ফেলে—'

'চুপ!'

খোলা জায়গার দিকে কয়েক গজ দৌড়ে গেল গণ্ডারটা। ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ফেলছে। যেন চোখে কম দেখে, চোখ মিটমিট করল বার কয়েক। জোরে বাতাস টানল নাক উঁচু করে, শত্রুর গন্ধ খুঁজছে।

মূর্তি হয়ে গেছে যেন ওমর আর কিশোর।

পুরো এক মিনিট ধরে সন্দেহ প্রকাশ করল গণ্ডারটা। তারপর শান্ত হয়ে এল। ফিরে এসে তার পিঠে বসল পাখিগুলো। আর কিছু ঘটত না, যদি খুদে একটা মাছি না ঢুকত কিশোরের নাকে। কোনমতেই সামলাতে পারল না সে। 'হ্যাচচো!' করে উঠল। ওই মুহূর্তে অতি সাধারণ হাঁচির শব্দকেই মনে হলো যেন হাজারটা ডিনামাইটের বিস্ফোরণ।

মহা কলরব করে আকাশে উড়ল টিক বার্ডগুলো। আর কি রোখা যায় গণ্ডারকে? দেখে মনে হলো বোলতায় হুল ফুটিয়েছে তাকে। তেড়ে এল ভীষণ বেগে, ঝোপঝাড় দলিত মথিত করে।

লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল কিশোর। দৌড় আর গাছে চড়ার সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ করে গিয়ে একটা উঁচু গাছের ডালে উঠে বসল। এখানে তার নাগাল পাবে না গণ্ডার। কিন্তু ওমর কোথায়?

দেখে চমকে গেল কিশোর। বিমানটার দিকে দৌড় দিয়েছে ওমর। গণ্ডারটাও ছুটে যাচ্ছে সেদিকে।

আক্রমণ করার সময় সোজা ছোটে গণ্ডার। নিশানা ব্যর্থ হলে কিছু দূর গিয়ে থামে, তারপর আবার মুখ ঘুরিয়ে ফিরে আসে।

কোন অলৌকিক কারণে কয়েক ইঞ্চির জন্যে প্লেনের লেজটা মিস করল ওটা। ততোক্ষণে ককপিটে উঠে বসেছে ওমর।

সোজা ছুটে গেল গণ্ডার। কয়েক গজ গিয়ে থমকে দাঁড়াল। ভারি শরীরটাকে এমনভাবে এত দ্রুত ঘোরাল, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

স্টার্ট নিল প্লেনের এঞ্জিন। ছুটে আসছে গণ্ডার। সোজা এখন প্লেনের পেট সই করে।

কিশোরের মনে হলো যুগের পর যুগ পেরিয়ে যাচ্ছে, তবু চালু হচ্ছে না প্লেনের চাকা। হলো অবশেষে। নড়তে শুরু করল প্লেন।

আবার কয়েক ইঞ্চির জন্যে মিস করল গণ্ডারটা, তার শিঙের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল প্লেনের লেজ।

পেছনে ছুটল গণ্ডার।

গতি বাড়ছে প্লেনের। কিন্তু জানোয়ারটার গতি আরও বেশি। প্রায় ধরে ধরে অবস্থা। আর খানিকটা এগোলেই গুঁতো মারতে পারবে। লেগে থাকলে কি হতো বলা যায় না। হয়তো গণ্ডারেরই জিত হতো। কিন্তু থেমে গেল আচমকা। কিশোর বুঝল, প্লেনের এঞ্জিনের এগজস্ট পাইপ থেকে বেরোনো ঝাঁঝাল বিষাক্ত ধোঁয়া সহ্য করতে পারছে না জানোয়ারটা। ছুটন্ত 'আজব জীবটার' দিকে চেয়ে কি ভাবল গণ্ডার কে জানে, মুখ ফিরিয়ে ছুট লাগাল আবার মরুভূমির দিকে। এবার আর থামল না। ছুটতে ছুটতে চোখের আড়াল হয়ে গেল।

ওড়ার দরকার হলো না। গণ্ডারটা চলে যেতেই প্লেনটাকে ঘুরিয়ে এনে আবার আগের জায়গায় রাখল ওমর। নেমে, ঘামতে ঘামতে ফিরে এল সেই মিমোসা গাছটার গোড়ায়।

গাছ থেকে নামল কিশোর। 'সব দোষ আমার। আরেকটু হলেই...'

'না, সবটা তোমার দোষ নয়। গণ্ডারটার ব্যবহারে অবাকই হয়েছি। কেমন যেন অস্থির ভাব। সাধারণত ওরকম করে না।'

'তাহলে?'

'কোন কারণে উত্তেজিত হয়ে আছে।'

'কি কারণ?'

'চলো, খুঁজে দেখি।'

যেখান দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল গণ্ডারটা, সেখানে চলে এল দু'জনে। বনের ভেতরে ঢুকল। কয়েক পা এগিয়ে থমকে দাঁড়াল ওমর। মাটির দিকে দেখিয়ে বলল, 'ওই দেখো।'

'রক্ত!'

'এ-জন্যেই অস্থির হয়ে আছে। আহত।'

'ডোভার।'

'জখম করবে কেন? ও প্রফেশনাল শিকারী। গণ্ডারের শিঙের অনেক দাম। শিং বেচার জন্যে হলে মেরেই ফেলত। ওর কাছে যে রাইফেল আছে, গণ্ডার মারা কিছুই না।'

প্রশ্নের জবাব মিলল না।

প্লেনের কাছে ফিরে এল ওরা। পানির বোতল বের করল ওমর।

'এখন কি করব?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কি আবার? যা প্ল্যান করেছি তা-ই। বসে থাকব। রাত নামলে গিয়ে ঢুকব দুর্গে।'

'ইস্ রাইফেল আনা উচিত ছিল। আমাদের পিস্তল দিয়ে চিতাবাঘও মারা যাবে না, থাক তো হাতি-গণ্ডার। ভুলই হয়ে গেল। আবার যদি ফিরে আসে গণ্ডারটা?'

'এলে তখন দেখা যাবে।'

এক প্যাকেট বিস্কুট আর এক টিন ভাজা সার্ডিন মাছ বের করল কিশোর। দু'জনে খেতে বসল মিমোসার ছায়ায়।

খেতে খেতে আলোচনা চলল। ভবিষ্যতের পরিকল্পনা।

দূরে দুর্গের দিক থেকে ভেসে এল রাইফেলের শব্দ। একটি মাত্র গুলির আওয়াজ।

ওমরের চোখে চোখে তাকাল কিশোর। 'কাকে মারল? বারনারকে?'

'কি করে জানব? বারনার হয়তো রয়েছে সেই রাবিশগুলোর তলায়।'

'তাহলে কাকে?'

'হতে পারে দাড়িওয়ালা বন্দিকে, যাকে তুমি দেখেছ। কিংবা চিতাটাকে। খাও এখন। রাতে গিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে।'

তেরো

গড়িয়ে গড়িয়ে চলল দিনটা। অসহ্য গরম। রোদের আগুনে যেন পুড়ছে মরুভূমি, আর তার মাঝের খুদে ছায়া-ঢাকা একটুখানি বন। ওখানে গাছের আড়ালে থাকতে পারলেও অনেক আরাম হত, কিন্তু ওমর আর কিশোর রয়েছে দুর্গের কাছাকাছি, একটা বড় পাথরের আড়ালে। পাথরের ছায়া আছে বটে, কিন্তু তাপ কম নেই। জায়গাটা যেন একটা অগ্নিকুণ্ড। বার বার বোতল থেকে পানি খেয়েও গলা ভিজিয়ে রাখা যাচ্ছে না।

দুর্গের ওপর চোখ রেখেছে ওরা। কেউ বেরোলে কিংবা ঢুকলে যাতে দেখতে পারে।

কাউকে চোখে পড়ল না। সেই দোতলার ঘরের জানালায়ও না। শূন্য মরুভূমি ছড়িয়ে গিয়ে মিশেছে যেন নীল দিগন্তের সঙ্গে। বাতাস এত গরম, অদ্ভুত এক ধরনের ঝিলিমিলি চোখে পড়ে দূরে তাকালে।

পশ্চিম গগনে ঢলে পড়েছে সূর্য। গরম যেন আরও বাড়ছে। জীবনের চিহ্ন নেই কোনখানে।

'আর বাঁচব না,' এক সময় বলল কিশোর। 'গায়ে ফোসকা পড়ে যাচ্ছে!'

জবাব দিল না ওমর।

সময় যাচ্ছে। মস্ত একটা লাল বলের রূপ নিল সূর্যটা, দিগন্তরেখার কাছে নেমে গেছে। ঠিক এই সময় কোথা থেকে ভেসে এল ভারি গর্জন, মাটি কাঁপিয়ে দিল।

'শুনলেন!' ফিসফিস করে বলল কিশোর।

'হ্যাঁ, সিংহ। ভয় নেই। বহুদূরে রয়েছে ওটা, কয়েক মাইল দূরে। তা ছাড়া বিশেষ কারণ না ঘটলে সাধারণত মানুষ খায় না সিংহ।'

আবার নীরবতা। পশ্চিম আকাশকে লালে লাল করে দিয়ে বালির সমুদ্রে যেন ডুব দিল সূর্য।

'এখনই যাবেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না, চাঁদ উঠুক।'

আবার নীরবতা।

চাঁদ উঠল। উঠে আসতে লাগল দিগন্তের ওপরে। আবার ডেকে উঠল সিংহটা, আরও এগিয়ে এসেছে। কেঁপে উঠল শূন্য বালির প্রান্তর। বড় বড় তারা ফুটেছে আকাশে। চেয়ে চেয়ে দেখছে কিশোর। সূর্য ডোবার পর দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে আসছে হালকা বাতাস। ভালই লাগছে তার।

'চলো, যাই,' বলল ওমর।

বালির সাগরকে রূপালি চাদর বানিয়ে দিয়েছে যেন উজ্জ্বল জ্যোৎস্না। যেদিকে যত দূর চোখ যায়, শুধুই শূন্যতা, ছায়ার লেশমাত্র নেই, শুধু দুর্গের কাছে ছাড়া। এই সাদা শূন্যতার মাঝে প্রকট হয়ে চোখে লাগছে বাড়িটা।

নিঃশব্দে মাঝের খালি জায়গাটা পার হয়ে দুর্গের কাছে পৌঁছে গেল ওরা। এদিকটায় চাঁদের আলো এখনও পৌঁছায়নি, তাই অন্ধকার। গেট দিয়ে ঢোকা উচিত হবে না। এদিক দিয়েই বেয়েটেয়ে কোনভাবে উঠে যেতে হবে।

ওপরে জানালার দিকে তাকাল ওমর। কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে বলল, 'এখানে এসে দাঁড়াও। তোমার কাঁধে উঠে দেখি কার্নিশটা ধরতে পারি কিনা।'

'আপনি যাবেন ? আমি যাই না?'

'না। যা বলছি করো।'

দেয়ালের কাছে ঘেঁষার আগে হঠাৎ কি মনে করে মরুভূমির দিকে তাকাল কিশোর। থমকে গেল। 'ওমরভাই, ওটা কি!'

ওমরও দেখল। বনটা যেদিকে, সেদিক থেকে এগিয়ে আসছে একটা কালো জীব। চাঁদের আলোয় দূর থেকেও দেখা যাচ্ছে। কিছু দূর এগিয়ে থামল। মাটিতে ঝুঁকে বসে কি যেন দেখল, তারপর সোজা হলো আবার। ওদিক থেকেই এসেছে ওমর আর কিশোর, তাদের পায়ের ছাপ পরীক্ষা করল কিনা কে জানে? পাথুরে মাটিতে ছাপ কতখানি পড়েছে, খেয়াল করেনি ওরা। হয়তো পড়েছে খুব সামান্যই, ওদের চোখে হয়তো ধরা পড়বে না। কিন্তু বুনো জানোয়ার আর মানুষের দৃষ্টির মধ্যে তফাত অনেক।

নাক উঁচু করে বাতাসে গন্ধ শুঁকল মনে হলো জীবটা।

'কী?' কিশোর প্রশ্ন করল। 'গরিলা? না শিম্পাঞ্জী?'

'মনে হয় না। ওরা এত উত্তরে আসে না। মনে হচ্ছে মানুষ…বুশম্যান!'

'এত ছোট?'

'বুশম্যানেরা ছোটই হয়।'

খুব সাবধানে দুর্গের কাছে পৌঁছে গেল মানুষটা। ওমর কিংবা কিশোরকে বোধহয় লক্ষ করল না, মিশে গেল ছায়ায়।

'বুশম্যানই।'

'গেল কোথায়?'

'কি করে বলি? হয়তো দুর্গের ভেতরে। পানির খোঁজে এসে থাকতে পারে। আমার অবাক লাগছে, একা কেন? ওরা তো দল ছাড়া চলে না। পরিবারটাকে কি অন্য কোথাও রেখে এল?'

'হয়তো। ডোভারের ভয়ে। লোকটাকে চেনে নাকি। এখন তো আমার মনে হচ্ছে, চাবুক দিয়ে শুধু চিতাবাঘকেই পেটায় না দৈত্যটা, মানুষও পেটায়।'

আর কোন কথা হলো না। যে কাজে এসেছে ওরা তাতে মন দিল। দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল কিশোর। তার কাঁধে উঠে হাত বাড়িয়ে কার্নিশটা ধরে ফেলল ওমর। ওখানে দাঁড়িয়ে নাগাল পেয়ে গেল জানালার। কিন্তু এমনভাবে গরাদ লাগানো, ঢোকা যাবে না। ছাতে উঠে কোন একটা পথ খুঁজে বের করতে হবে।

গরাদ ধরে উঠে গেল ওমর। তারপর হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল পুরনো আমলের নিচু ছাতের কার্নিশ। দু'হাতে ধরে বেয়ে সহজেই উঠে পড়ল ছাতের ওপর। খানিকটা সরে এসে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকাল। কোন নড়াচড়া চোখে পড়ল না। কোন শব্দ নেই। চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকা জীপটা দেখতে পেল। দিনের বেলা দুর্গ থেকে কাউকে বেরোতে দেখেনি। জীপটাও যখন রয়েছে, ভেতরেই আছে ডোভার।

নিচ থেকে ছাতে ওঠার সিঁড়ি নিশ্চয় আছে। আর সিঁড়ির মাথায় ট্র্যাপডোর। সেটা খুঁজতে শুরু করল সে। নিচে, চত্বরে একটা নড়াচড়া চোখে পড়তেই থেমে গেল। লম্বা হয়ে শুয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ছাতের কিনারে এগোল, কি নড়ছে দেখার জন্যে।

দুর্গের চত্বরে একদিকে চাঁদের আলো, আরেক দিকে ছায়া, ওখানে পৌঁছতে পারেনি এখনও জ্যোৎস্না। নড়াচড়াটা ওই ছায়ার কাছে। সেই মানুষটা, বনের দিক থেকে যে এসেছে, বুশম্যান। চিতাবাঘের ঘরটার কাছে। হ্যাঁ, পানির খোঁজেই এসেছে, ভাবল ওমর। সে শুনেছে, দূর থেকেও নাকি পানির গন্ধ পায় বুশম্যানেরা।

আবার ছায়ায় হারিয়ে গেল মানুষটা।

কিছুক্ষণ একভাবে পড়ে থাকল ওমর। আর দেখা গেল না মানুষটাকে। পিছিয়ে এসে উঠে দাঁড়িয়ে আবার খুঁজতে লাগল সিঁড়ির দরজা। খোলা ছাতে ছোট একটা জিনিস পড়ে থাকতে দেখল। নিচু হয়ে তুলে নিল। পুরনো বুলেটের খোসা। তারমানে এখান থেকে গুলি করা হয়েছিল। আরও শিওর হলো ওমর, ছাতে ওঠার কোন না কোন পথ আছেই।

পাওয়া গেল। গোল্ল একটা ফোকরমত। চারকোনা। এককালে হয়তো ট্র্যাপডোর ছিল ওখানে, এখন আর নেই, নষ্ট হয়ে ভেঙে পড়েছে পাল্লাটা। কাছে এসে উঁকি দিয়ে দেখল ওমর, সিঁড়ি নেমে গেছে, আবছা দেখা যাচ্ছে চাঁদের আলোয়। পকেট থেকে পেন্সিল টর্চ বের করে সিঁড়িতে নামল।

দুই ধাপ নেমে থেমে গেল। দ্বিধা করছে। তার আগমন কি টের পেয়েছে ডোভার? রাইফেল হাতে বসে আছে লুকিয়ে? না, সে-রকম কোন সম্ভাবনা নেই। ডোভার দেখেছে, প্লেন নিয়ে চলে গেছে ওরা। কিন্তু যদি ধরা পড়ে যায় এখন ওমর, চুরি করে ঢোকার জন্যে কি কৈফিয়ত দেবে?

'দূর, যত সব আবোল-তাবোল ভাবনা!' নিজেকে ধমক লাগাল ওমর। 'আগে ধরা পড়ুক তো, তারপর দেখা যাবে।'

টর্চের আলো ফেলে নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে চলল সে। সেকালে

বিল্ডিঙের ভেতরেও এরকম কাঠের কিংবা লোহার সিঁড়ি বানানো হত।

ওমরের ভার সইতে পারল না পুরনো সিঁড়ি, খানিকদূর নামতেই ভেঙে পড়ল হুড়মুড় করে।

চোদ্দ

ভাগ্য ভাল, বেশি নিচে পড়েনি, তাই হাড়গোড় সব আস্তই রইল। বড়জোড় আট কি দশ ফুট নিচে পড়েছে। হাড় ভাঙেনি বটে, কিন্তু পাথুরে মেঝেতে পড়ে বেশ ব্যথা পেয়েছে।

নীরবতার মাঝে তার পতনের শব্দ অনেক জোরাল মনে হলো। তাড়াতাড়ি হাঁচড়ে-পাঁচড়ে সরে গেল এক ধারে। দেয়ালে পিঠ ঠেকতেই স্থির হয়ে গেল পিস্তল বের করে তৈরি হয়ে বসে রইল চুপচাপ।

অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেল। কেউ দেখতে এল না।

ওপরের ফোকর দিয়ে চাঁদের আবছা আলো আসছে। ধীরে ধীরে তার চোখে সয়ে এল অন্ধকার। দেখতে পাচ্ছে ঘরের অনেকখানি, অস্পষ্টভাবে। কান পেতে রেখেছে। কোন শব্দ নেই। চত্বরের দিকে জানালাটার দিকে তাকাল। এগোতে যাবে, এইসময় শোনা গেল শব্দ।

পায়ের আওয়াজ। পাথুরে চত্বরে বেশ শব্দ হচ্ছে। পালানোর পথ খুঁজল ওমর। আর এই প্রথম লক্ষ করল, সিঁড়ির নিচের অর্ধেকটা ফ্রেমসহ পুরোপুরি ভেঙেছে। ওপরের অংশটুকু লটকে রয়েছে কোনমতে। নাড়া লাগলেই ধসে পড়বে, বোঝাই যায়। তারমানে ওপথে পালানো অসম্ভব। ওপরের আকাশে বড় একটা তারা যেন তার দিকে চেয়ে ব্যঙ্গ করে হাসছে।

জানালা দিয়ে বেরোনো যাবে না। মোটা শিক লাগানো। পথ একটাই খোলা আছে। নিচে নেমে যাওয়া। কিন্তু সিঁড়িটা কোথায়? পড়ার সময় হাত থেকে ছুটে গিয়েছিল টর্চ, খুঁজে পাওয়া গেল না আর ওটা এখন। খোঁজার সময়ও নেই। এগিয়ে আসছে পায়ের শব্দ।

দেয়াল হাতড়াতে শুরু করল ওমর। একটা দরজা লাগল হাতে। ঠেলা দিতেই খুলে গেল। আরেকটা ঘর, প্রথমটার চেয়ে ছোট। নিশ্চয় এটা অফিসারস কোয়ার্টার ছিল। পাল্লাটা আবার লাগিয়ে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে।

থামল পায়ের শব্দ। কি করছে লোকটা? ভাঙা সিঁড়ি দেখছে? অবাক হয়ে ভাবছে বোধহয়, কি কারণে ভাঙল। এখানে দাঁড়িয়ে শুধু কল্পনা করতে পারছে ওমর, সঠিক বুঝতে পারছে না কিছুই।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, যখন আবার সরে যেতে শুরু করল পায়ের শব্দ। আগের ঘরে ঢুকে জানালার কাছে এসে বাইরে তাকাল ওমর। চত্বরে হেঁটে যাওয়া

লোকটাকে চিনতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হলো না তার। ডোভার। হাতে রাইফেল।

কিন্তু এসে ফিরে গেল কেন? হয়তো ভেবেছে, পুরনো সিঁড়ি আপনা-আপনি ভেঙে পড়েছে। অন্য কিছু ভাবার কিংবা সন্দেহ করার কোন কারণও অবশ্য নেই।

ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল পদশব্দ। হারিয়ে গেল ডোভার, কোন একটা ঘরে ঢুকে পড়েছে বোধহয়।

টর্চটা কিছুতেই খুঁজে পেল না ওমর। ভাঙা সিঁড়ির স্তূপের তলায় কোথাও পড়ে আছে হয়তো। টর্চের চেয়ে এখন বেশি জরুরী বেরিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে বের করা। দেয়ালে হাতড়ে আরেকটা দরজা আবিষ্কার করল সে। দরজার বাইরে করিডর। শেষ মাথায় সিঁড়ি। এটা কাঠের নয়, পাথরের। ভেঙে পড়ার ভয় নেই।

নেমে এল নিচে। ঘেরা দেয়ালের একমাত্র দরজাটার পাশে দাঁড়িয়ে আস্তে মুখ বাড়িয়ে উঁকি দিল চত্বরে। কেউ নেই। চাঁদের আলোর বন্যা বইছে শুধু। স্তব্ধ নীরবতা। বেরোবে? ভাবছে ওমর। ঘাপটি মেরে বসে নেই তো কোথাও ডোভার?

কিন্তু ঝুঁকি নিতেই হবে। উপায় নেই। সাবধানে বেরিয়ে এল দরজার বাইরে। দেয়াল ঘেঁষে এগোল গেটের দিকে।

কিছুদূর এগোতেই বিচিত্র একটা শব্দ কানে এল। গিটারের তারে টোকা দিল যেন কেউ, টুন্ করে উঠল। পরক্ষণেই খুট করে একটা শব্দ, পাশের দেয়ালে, ছোট ঢিল পড়লে যেমন হয়, অনেকটা তেমনি।

থমকে দাঁড়াল বটে ওমর, তবে মুহূর্তের জন্যে। আর কিছু ঘটল না দেখে ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব দিল না। নিরাপদেই এসে পৌঁছল গেটের কাছে। ফিরে তাকাল একবার। কাউকে দেখতে পেল না। বেরিয়ে চলে এল গেটের বাইরে।

ঢুকেছে, সিঁড়ি ভেঙে পড়ে ব্যথা পেয়েছে, তারপর প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। মাঝখান থেকে একটা টর্চ হারিয়ে এসেছে। কাজের কাজ কিছুই হয়নি। কাল সকালে আবার যদি সিঁড়ি ভাঙার কারণ পরীক্ষা করতে যায় ডোভার, আর টর্চটা দেখে ফেলে, কি ভাববে?

উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করছে কিশোর। ওমরকে দেখেই জিজ্ঞেস করল, 'কাজ কিছু হলো?'

'না। খোঁজার সুযোগই পেলাম না। মাঝখান থেকে সতর্ক করে দিয়ে এলাম ডোভারকে। আজ রাতে আর ঢোকা যাবে না।' সব কথা খুলে বলল ওমর।

'বেঁচে যে ফিরেছেন, এই যথেষ্ট। ডোভার দেখতে পেলে শিওর গুলি করত।' এক মুহূর্ত থামল কিশোর। 'আরেক কাণ্ড হয়েছে এদিকে। সেই গণ্ডারটাকে দেখেছি আমি। বনের দিক থেকে এসেছিল, আবার চলে গেছে...'

'ওটাই যে কি করে বুঝলে?'

'তাহলে আরেকটা হবে। তবে একই রকম বড়।'

'হুঁ,' চিন্তিত মনে হলো ওমরকে।

'যা হওয়ার তো হয়েছে, এখন কি করবেন?'

'ডোভার যতক্ষণ ফোর্টে থাকবে, কিছুই করতে পারব না। ফিরে যাব। ও বেরিয়ে গেলে কাল ঢুকব আবার। ওকে ভেতরে রেখে এভাবে ঝুঁকি নেয়ার কোন মানে হয় না।'

'কাল যদি না যায়?'

'তাহলে যেদিন যায় সেদিনই ঢুকব। দরকার হলে উইন্ডহোয়াকে গিয়ে খাবার আর পানি নিয়ে ফিরে আসব।'

'এখন কি করা?'

'ফিরে যাব প্লেনের কাছে।'

'গণ্ডারটা আছে জঙ্গলে!'

'হুঁশিয়ার থাকতে হবে। সাড়া পেলেই দৌড়ে গিয়ে গাছে উঠব।'

'যদি মরুভূমিতে তাড়া করে?'

'এত যদি যদি কোরো না তো! চলো। যা হয় হবে।'

বনের কাছে চলে এল ওরা। গণ্ডারটাকে দেখা গেল না। আসার সময় বার বার পেছনে ফিরে তাকিয়েছে। কাউকে অনুসরণ করতে দেখেনি। তবু বাড়তি সতর্কতা হিসেবে একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে বসে রইল দু'জনে। দুর্গটা যেদিকে সেদিকে তাকিয়ে। মরুভূমি দিয়ে কেউ যদি আসে, স্পষ্ট দেখা যাবে তাকে। আর মরুভূমি ছাড়া আসার কোন পথও নেই।

কেউ এল না।

ঝোপ থেকে বেরিয়ে প্লেনের কাছে ফিরে চলল দু'জনে। আগে হাঁটছে কিশোর। প্লেনটা দেখা গেল। আরও কিছু দূর এগিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল সে, খামচে ধরল ওমরের বাহু। 'ওমরভাই!'

'কী?'

নীরবে প্লেনের দিকে হাত তুলল কিশোর।

ওমরও দেখতে পেল। চাঁদ এখন মাথার ওপরে। উজ্জ্বল আলো। প্লেনের নাকের নিচে শুয়ে থাকা গণ্ডারটাকে চিনতে কোন ভুল হলো না ওমরের! কাঁধ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। বাকি অংশটা ওপাশে, আড়ালে পড়েছে, এখান থেকে দেখা যায় না। মস্ত শিং। তার মনে হলো, দিনের বেলা ওটাকেই দেখেছিল।

'প্লেনের প্রেমে পড়ে গেল নাকি ব্যাটা!' ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'করি কি এখন?'

'গাছ!'

গণ্ডারটার ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে নিঃশব্দে একটা বড় গাছের দিকে পিছাতে লাগল দু'জনে। উঠে পড়ল গাছটায়। গণ্ডারের শিং থেকে ওরা আপাতত নিরাপদ, কিন্তু প্লেনটা? মনে হচ্ছে এখন ঘুমিয়ে আছে জানোয়ারটা, জেগে ওঠার পর যদি কোন কারণে প্লেনের ওপর রেগে যায়? শত্রু ভেবে বসে ওটাকে? ভেঙে গুঁড়িয়ে চুরমার করে ফেলতে সময় লাগবে না।

সারাটা রাত গাছের ডালে বসে রইল ওরা।

সারারাত একইভাবে পড়ে রইল গণ্ডারটাও। সামান্যতম নড়ল না। কিশোর ভাবল, ওভাবেই বুঝি মরার মত ঘুমায় গণ্ডারেরা। কিন্তু ওমরের সন্দেহ হলো।

পুব দিগন্তে আলোর আভাস দেখা দিল, ভোর আসছে। খুক করে কাশল ওমর। আরেকবার, আরও জোরে। অনড় পড়ে রইল গণ্ডার। জোরে জোরে চেঁচাল ওমর। তবুও নড়ল না জানোয়ারটা।

'কিশোর,' বলল সে, 'আমার মনে হচ্ছে ওটা মরা। মরে পড়ে আছে, আমরা ভেবেছি ঘুমিয়েছে।'

'কিন্তু যদি···বলা তো যায় না···'

কিশোরের কথা শেষ হলো না। নামতে শুরু করেছে ওমর।

গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়েই একটা পাথর তুলে নিল। ছুঁড়ে মারল গণ্ডারটাকে সই করে। তারপর আরেকটা বড় পাথর তুলে নিয়ে ছুঁড়ল।

তেমনি পড়ে রইল জানোয়ারটা। আর কোন সন্দেহ নেই। মরেই গেছে।

কাছে গিয়ে দেখা গেল, গণ্ডারটার পেছনের অনেকখানিই নেই। মাংস কেটে নেয়া হয়েছে। মাটিতে রক্তও পড়ে নেই তেমন।

'হুঁ, যা. ভেবেছি,' বিড়বিড় করল ওমর। 'বুশম্যান। পুরো একটা দল ঢুকেছিল, হয়তো এখনও আছে। ওদের তীরের বিষেই মরেছে এটা। দুপুর বেলা অস্থির হয়ে ছিল বিষের জ্বালাতেই। বুশম্যানেরা মাংস কেটে নিয়ে গেছে। আর ওরা আছে বলেই বনের ধারেকাছে ঘেঁষছে না আর কোন প্রাণী।'

ভয়ে ভয়ে চার দিকে তাকাল কিশোর। তার মনে হলো, প্রতিটি ঝোপের আড়াল থেকে তাদের ওপর চোখ রাখছে ভয়াবহ জংলী শিকারীরা। আতঙ্কিত কণ্ঠে বলল, 'চলুন, পালাই!'

'তেমন দরকার পড়লে পালাব,' অভয় দিয়ে বলল ওমর। 'সকাল হোক আগে। দেখিই না।'

পনেরো

প্লেনের ভেতরে বসেই ঘুমিয়ে পড়ল ওমর। মনে ভয় থাকলেও সারা দিনের পরিশ্রম আর সারা রাতের অনিদ্রার ফলে ঢুলতে শুরু করল কিশোর। হঠাৎ চমকে চোখ মেলে সোজা হয়ে বসল। ওমরের গায়ে আস্তে ঠেলা দিয়ে ডাকল, 'ওমরভাই!'

চোখ মেলল ওমর। দিগন্তে উঁকি দিচ্ছে সূর্য। মরুর আকাশ, বালি, সব এখন সোনালি-লাল। 'কি?' ঘুম-জড়িত কণ্ঠে বলেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। আওয়াজটা কানে ঢুকতেই পলকে পুরো সজাগ। এঞ্জিনের শব্দ।

'জীপ!' বলল কিশোর।

'নিশ্চয় ভোজার।' তাড়াতাড়ি দূরবীন বের করে চোখে লাগাল ওমর।

দূরে দেখা গেল জীপটা। এদিকে আসছে না। এগিয়ে চলেছে মরা নদীর দিকে। মিলিয়ে গেল দূরে। পেছনে আস্তে আস্তে মাটিতে নেমে গেল আবার ধুলোর মেঘ।

'এইবার হয়েছে সুযোগ!' তুড়ি বাজাল ওমর। এঞ্জিন স্টার্ট দেয়ার জন্যে হাত বাড়াল।

'চা-টা কিছু খেয়ে নিলে হয় না?'

'পরে। অনেক সময় পাওয়া যাবে। দুর্গে ঢোকার এই সুযোগ আর পাব কিনা সন্দেহ।'

'যদি ভোজার ফিরে আসে?'

'রিস্ক তো নিতেই হবে।'

দুর্গের গেটের সামনে আড়াআড়িভাবে প্লেনটা রাখল ওমর। লাফ দিয়ে নামল ককপিট থেকে। কিশোরও নামল। ভেতরে ঢুকল দু'জনে।

কিছুটা এগিয়ে দূর থেকেই দেখতে পেল চিতাবাঘ বেঁধে রাখার শিকলটা পড়ে আছে ঘরের বাইরে। কলারটা খালি। জানোয়ারটা নেই।

'পাহারা দেয়ার জন্যে ছেড়ে রাখল না তো?' বলল কিশোর।

'মনে হয় না। পোষা নয়, পালাবে। অন্য কিছু করেছে ওটাকে।···কোন্ জানালায় যেন লোকটাকে দেখেছিলে?'

দেখিয়ে দিল কিশোর।

সম্ভাব্য ঝুঁকি এড়ানোর জন্যে সরাসরি চত্বরের ওপর দিয়ে না হেঁটে দেয়ালের ধার ঘেঁষে এগোল ওরা।

চলতে চলতে নিচু হয়ে কি একটা জিনিস মাটি থেকে কুড়িয়ে নিল কিশোর। ওমরকে দেখাল।

চমকে উঠল ওমর, 'ফেলো, ফেলো, জলদি ফেলো! আঁচড় লাগলেও মরবে!' ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার চেহারা। কাল রাতে কতবড় বাঁচা বেঁচেছে, বুঝতে পেরে বুক কেঁপে উঠল তার। বুশম্যানের তীর! তাকে সই করেই ছুঁড়েছিল। যে ছুঁড়েছে আবছা অন্ধকারে নিশানা ঠিক রাখতে পারেনি, কিংবা হয়তো বেশি দূর থেকে ছুঁড়েছে, তাই লাগাতে পারেনি। যা-ই ঘটুক, মস্ত ফাঁড়া কেটেছে ওমরের।

'কি হলো আপনার?' ওমরের চেহারার পরিবর্তন লক্ষ করল কিশোর।

'কাল রাতে আমাকে সই করেই মেরেছিল।'

'কেন? আপনাকে মারতে যাবে কেন?'

'কি জানি! হয়তো আমাকে ভোজার মনে করেছে।'

'ভোজার মনে করলেই বা মারবে কেন?'

'তোমার কথাই ঠিক মনে হচ্ছে এখন, কিশোর। ওই চাবুকটা শুধু চিতাবাঘের জন্যে নয়, বুশম্যানদের পিঠেও চালায় ভোজার। ওদেরই কেউ হয়তো কাল রাতে এসেছিল···'

চলার পথে একটা খোলা দরজার পাশেই চামড়াটা পড়ে থাকতে দেখল ওরা। রক্তাক্ত।

'ওই যে তোমার চিতাবাঘ,' বলল ওমর। 'পাহারার জন্যে ছেড়ে রাখেনি ভোজার।'

লোকটার প্রতি ঘৃণায় তেতো হয়ে গেল কিশোরের মন। গুলি করে মেরে চামড়া ছিলে ফেলেছে ভোজার, শুকিয়ে রাখবে। তারপর নিয়ে গিয়ে বিক্রি করবে।

যে সিঁড়িটা দিয়ে রাতে নেমেছিল ওমর, সেটা দিয়েই আবার দোতলায় উঠল দু'জনে। করিডরের আরেক মাথার দরজা, বন্ধ। ওটার সামনে এসে পাল্লায় থাবা দিল ওমর। 'ভেতরে কেউ আছেন?'

'কে?' সাড়া এল।

ভেজানো রয়েছে পাল্লা, ঠেলা দিতেই খুলে গেল।

প্রাচীন একটা লোহার আর্মি বেডের ওপর শুয়ে আছে একজন মানুষ। এক পায়ে ব্যান্ডেজ। দেখেই বোঝা যায়, অসুস্থ। লম্বা লম্বা চুল, ছাঁটা হয়নি অনেক দিন। গোঁফ-দাড়ি গজিয়েছে, ওগুলোও অনেকদিন কামানো হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও লোকটাকে চিনতে কোন অসুবিধে হলো না ওমরের।

'আপনি জন বারনার,' বলল সে।

'হ্যাঁ। আপনি কে?'

'নাম বললে চিনবেন না। লন্ডন থেকে এসেছি। পুলিশ।'

মলিন হাসি ফুটল বারনারের ঠোঁটে। 'খুঁজে বের করলেনই শেষ পর্যন্ত। কি জন্যে এসেছেন?'

'লর্ড কলিনসের অলংকারগুলো চাই। সেফ থেকে যেগুলো চুরি করে এনেছেন।'

মাথা নাড়ল বারনার। 'ভুল করছেন আপনি, মিস্টার...'

'ওমর। ওমর শরীফ।'

'মিস্টার ওমর, আমি চুরি করিনি।...আপনার কাছে সিগারেট আছে?'

'সরি। সিগারেট খাই না।'

হতাশ হলো বারনার। 'তা বসুন না। ও, বসবেনই বা কোথায়? চেয়ার-টেয়ার তো নেই। কিছু মনে না করলে আমার বিছানাতেই বসুন।'

'চুরি করেননি মানে?' গম্ভীর হয়ে বলল ওমর। 'বন্ড স্ট্রীটের জুয়েলারির দোকানে একটা আঙটি বিক্রি করে আসেননি?'

'করেছি। যার জিনিস সে-ই আমাকে বিক্রি করতে পাঠিয়েছিল।'

'প্লেন কেনার টাকা পেলেন কোথায়?'

'সে-ই দিয়েছে।'

'এই সে-টা কে? কার কথা বলছেন?'

'আমার বোন। সৎ বোন।'

'নাম?'

'লেডি নিনলিনা কলিনস। ডাকনাম নিনা।'

চেয়ে রইল ওমর। 'নিনা, মানে লর্ড উইলিয়াম কলিনসের...'

'হ্যাঁ। তিনি আমারও বাবা।'

'ফারনডেলের লর্ড উইলিয়াম কলিনস?' বিশ্বাস করতে পারছে না কিশোর।

'হ্যাঁ।' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল বারনার।

'তাহলে কলিনস ম্যানরে চাকরের চাকরি নিয়েছিলেন কেন?' জিজ্ঞেস করল ওমর।

'সে এক লম্বা কাহিনী। যদি শুনতে চান...'

'শুনতে তো অবশ্যই চাই। কিন্তু ডোভার যদি ফিরে আসে?'

'মনে হয় না এত তাড়াতাড়ি ফিরবে। হীরা খুঁড়তে গিয়েছে। আর এলে তার জীপের আওয়াজ শোনা যাবে।'

'আপনাকে কি বন্দি করে রেখেছে নাকি এখানে?'

'বন্দি করবে কি? নিজেই তো বন্দি হয়ে আছি। অ্যাক্সিডেন্টে পা ভেঙেছি। এই মরুভূমিতে একশো গজও পেরোতে পারব না। এখানে শুয়ে থাকা ছাড়া আর কি করার আছে? খাবার আর পানির জন্যে ডোভারের ওপরই ভরসা করে আছি।'

'ভাঙলেন কিভাবে? প্লেন ক্র্যাশে?'

'হ্যাঁ।'

'কিভাবে ঘটল ঘটনাটা?'

'গোড়া থেকেই বলি,' চুপ করে দম নিল বারনার। তারপর শুরু করল তার কাহিনী; 'তিরিশ বছর আগে আমার মাকে বিয়ে করেছিল লর্ড কলিনস। দক্ষিণ আফ্রিকায় শিকারে গিয়ে আমার মায়ের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার খনির মালিক ছিলেন আমার নানা, মস্ত ধনী, তাঁরই একমাত্র মেয়ে ছিল আমার মা। এখন আমি বুঝি, টাকার লোভেই আমার মা-কে বিয়ে করেছিল লর্ড কলিনস। মা-কে ইংল্যান্ডে নিয়ে যায় কলিনস। সেখানে আমার জন্ম হয়। তারপর থেকে আমার মায়ের সঙ্গে শুরু হয় কলিনসের দুর্ব্যবহার, মায়ের জীবনটাকে নরক বানিয়ে ছাড়ে। বছর তিনেক কোনমতে সহ্য করেছিল মা, তারপর আর পারেনি, আমাকে নিয়ে ফিরে আসে দক্ষিণ আফ্রিকায়। এখানেই বড় হয়েছি। অনেক বছর মায়ের সঙ্গে বাবার দেখা-সাক্ষাৎ ছিল না, একদিন হঠাৎ করে উকিলের নোটিশ এসে হাজির। মাকে তালাক দিতে চায় বাবা। খুশি-হয়েই তালাকনামায় সই করে দিল মা। ততোদিনে আমি বড় হয়ে গেছি, বুঝি ওসব।'

'তারপর লর্ড কলিনস আবার বিয়ে করল,' বলল ওমর।

'হ্যাঁ, আরেক ধনীর মেয়েকে। আমার সৎ মায়ের ঘরে হলো এক মেয়ে। নিনা। দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গেও আমার মায়ের মতই দুর্ব্যবহার শুরু করল কলিনস। সইতে পারেননি মহিলা, হার্টও ছিল খারাপ, হার্টফেল করে মারা গেছেন। এসব কথা নিনা বলেছে আমাকে।

'যা-ই হোক, আমার মা-ও মারা গেল একদিন। কি করব জানি না। সাফারিতে যাই, শিকারে যাই, ঘুরে বেড়াই সমস্ত মরুভূমিতে। শুনলাম, কালাহারির হারানো শহরের গুজব। বেরিয়ে পড়লাম একদিন খুঁজতে।'

'তখনই নিশ্চয় পরিচয় হয় ডোভারের সঙ্গে?'

'হ্যাঁ। খুব বড় শিকারী সে। তবে তার আসল ব্যবসা পোচিং, আর প্রসপেক্টিং। শুরুতে সম্পর্ক ভালই ছিল আমাদের। আমি গিয়েছিলাম হারানো শহর খুঁজতে, আর সে গিয়েছিল হীরার খনির খোঁজে। দুর্গম অঞ্চল। বুশম্যানদের সাহায্য ছাড়া ওখানে যাওয়াও সম্ভব হতো না, ফিরেও আসতে পারতাম না।

'ডোভারকে খারাপ লোক বলা যাবে না। তবে খুব বেশি ড্রিংক করে, আর মাতাল হয়ে গেলে তার কোন হুঁশজ্ঞান থাকে না, কি করে না করে নিজেই জানে না। মানুষ মনে হয় না তখন ওকে, শয়তান হয়ে যায়। তবে, ভাল অবস্থায়ও বুশম্যানদের মানুষ মনে করত না সে। তাদের সঙ্গে জানোয়ারের মত ব্যবহার করত। যখন-তখন ধরে চাবুক দিয়ে পেটাত, যা খুশি করত। তবে এ-ব্যাপারে শুধু ডোভারকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। অনেক শ্বেতাঙ্গই ওই ব্যবহার করেছে,

সুযোগ পেলে এখনও করে। একটা সময় তো বুশম্যানদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার ঢালাও সরকারী আদেশ ছিল।

'যাকগে, যা বলছিলাম। ডোভারের ধারণা হলো, হীরা কোথায় আছে বুশম্যানেরা জানে। তাদেরকে দিয়ে সেগুলো বের করানোর চেষ্টা শুরু করল। ওর কাণ্ড-কারখানায় বিরক্ত হয়ে গেলাম আমি।'

'হীরা কি পেয়েছিল?'

'তখন পায়নি। আমার সঙ্গে একটা চুক্তি হয়েছিল ওর। হীরা পেলে আধাআধি বখরা। চিতাবাঘ শিকার করে চামড়া বেচে পয়সা যা পেত, খাওয়া-পরায়ই তা চলে যেত। আমাকে ভাগ দিতে চাইল, তার কারণ, হীরা খোঁজার সমস্ত খরচ আমি দেব। কাজেই, বিরক্ত হয়ে মাঝপথেই আমি যখন বললাম, আমি চলে যেতে চাই, ডোভারের মত লোক রাগ করবেই। তার রাগের তোয়াক্কা করলাম না। হাজার হোক, আমার শরীরে কলিনসের রক্ত। বেপরোয়া, বদমেজাজী তো হবই, সব সময় না হোক, অন্তত মাঝে মাঝে তো বটেই। বুশম্যানরা আমাকে পছন্দ করত। তাই আটকে রাখতে পারল না আমাকে ডোভার। ওদের সহায়তায় চলে এলাম সভ্য জগতে। তারপর কি জানি কি হলো, হঠাৎ ঠিক করে ফেললাম, ইংল্যান্ডে চলে যাব। চলে গেলামও একদিন। আর ভাগ্যের কি খেল, লন্ডনে গিয়ে একদিন পত্রিকায় দেখলাম বিজ্ঞাপন, আমার বাবা একজন চাকর চায়। রেফারেন্সের জন্যে কতগুলো জাল কাগজপত্র বানিয়ে নিয়ে গিয়ে ঢুকলাম তার বাড়িতে, চাকরের চাকরি নিয়ে নিলাম। গিয়ে বললেই পারতাম, আমি তার ছেলে। কেন যে বললাম না, সেটা আমিও জানি না। বোধহয় কলিনস ফ্যামিলির রক্তের খামখেয়ালিপনার কারণেই।'

'আপনার বাবাকে জানাননি কখনও?'

'না। এখনও জানে না। ওখানে চাকরি নিলাম। নিনাকে জানালাম আমার পরিচয়। ওর মুখে বাপের কাহিনী শুনে মনটা আরও তেতো হয়ে গেল। বাপের কাছে ছেলে বলে পরিচয় দেয়ার যা-ও বা কিছুটা ইচ্ছে ছিল, একেবারে উবে গেল। এমনকি নিনাও আমার সঙ্গে পালিয়ে আফ্রিকায় চলে আসতে চাইল। বাবাকে তারও পছন্দ না।

'আমাদের মেলামেশাটাকে কলিনস দেখল অন্য চোখে। সে ভাবল, তার মেয়ের সঙ্গে প্রেম হয়েছে আমার। বাজে ব্যবহার শুরু করল। ভাবলাম, এ রকম বেশিদিন চলতে থাকলে আমারও মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে, কোনদিন কি করে বসব ঠিক নেই। তারচেয়ে বেরিয়ে যাব ওই বাড়ি থেকে। তবে নিনার জন্যে ভাবনা হলো আমার। কলিনসের তখন সময় খারাপ। বেহিসেবী খরচ করে, খামখেয়ালিভাবে চলে চলে টাকা পয়সা সব উড়িয়েছে। জমি বাঁধা দিয়ে দিয়েছে ব্যাংকের কাছে। খাওয়া-পরা চালানোর জন্যে গাছ বিক্রি শুরু করেছে। শেষে একদিন হাত দিয়ে বসল নিনার মায়ের গহনাগুলোতে। গোটা দুই গহনা নিয়ে বিক্রিও করে এল। উদ্বিগ্ন হলো নিনা। ওগুলো ছাড়া তার আর কিছুই নেই। কলিনস যে কাণ্ড শুরু করেছে, সব বিক্রি করে মেয়েকে পথের ফকির করে রেখে যাবে।

'আমিই পরামর্শ দিলাম নিনাকে, গহনাগুলো সরিয়ে ফেলা দরকার। তাহলে

অন্তত পথে বসতে হবে না তাকে। কলিনস মরুক গিয়ে, তার জন্যে পরোয়া করি না আমরা। তাকে বাবা বলতেও ঘৃণা হয়।

'নিনা রাজি হলো। কিন্তু কাজটা করব কিভাবে? আমার কাছেও তখন টাকাপয়সা নেই। মায়ের টাকা তো বাবাই সব শেষ করেছে, বাকি সামান্য যা ছিল, খরচ করেছি আমি। আর একেবারে শেষ সম্বলগুলো বিক্রি করে জোগাড় করেছিলাম ইংল্যান্ডে যাওয়ার খরচ। নিনা বলল, একটা আঙটি বিক্রি করে দিয়ে প্লেন কিনে বাকি সব গহনা নিয়ে আফ্রিকায় চলে আসতে। তারপর সময় করে সুযোগ বুঝে সে-ও চলে আসবে আমার কাছে।

'ইংল্যান্ডে গিয়ে প্লেন চালাতে শিখেছি আমি। ওটা অনেকদিনের শখ ছিল আমার। কাজেই, আঙটি বিক্রি করে, প্লেন কিনে নিনার মায়ের গহনাগুলো নিয়ে চলে আসতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হয়নি আমাকে। নিনার যোগসাজশে এ কাজ করেছি, এ কথা জানলে তাকে আস্ত রাখবে না কলিনস। তাই তাকে বারবার অনুরোধ করে এসেছি, কলিনস যা খুশি করুক, আমাকে চোর ভেবে পুলিশে খবর দিক, যা ইচ্ছে করুক, সে যেন মুখ না খোলে। সে যেন নিজের দোষ স্বীকার ন করে। বুঝতে পারছি, আমার অনুরোধ রেখেছে নিনা। নইলে আপনারা আসতে না এখানে।'

'হ্যাঁ, আপনার বাবাই পাঠিয়েছেন। তবে একথাও বলে দিয়েছেন, জিনিসগুলে ফেরত পেলেই তিনি খুশি, চোরের ব্যাপারে তার কোন মাথাব্যথা নেই।'

'স্ক্যান্ডালের ভয়ে, বুঝলেন, বদনাম। ভেবেছে, চোর ধরা পড়লে খবরে কাগজে বেরোবে, তার মেয়ের বদনাম ছড়াবে, সে-কারণে। শয়তান লোক তো শয়তানি ছাড়া ভাবতে পারে না। তার বিশ্বাস তার মেয়ে চাকরের প্রেমে পড়েছে।'

'বুঝলাম। গহনা নিয়ে পালালেন। তারপর এখানে কি করলেন? ডোভারে সঙ্গে আবার দেখা হলো কিভাবে?'

'আমিই যেচে পড়ে তার সঙ্গে দেখা করেছি। কিছুদিন নিরাপদে লুকিয়ে থাকার জন্যে। জানতাম, পুলিশ খোঁজ করবে আমার। ওদের চোখকে ফাঁকি দেয়ার একটাই উপায়, মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়া। ডোভারের আশ্রয় চেয়েই ভুলটা করেছি। আসলে, আমার উচিত ছিল বুশম্যানদের কাছে চলে যাওয়া।'

'কেন, ভুলটা কি করলেন?'

'আগের চেয়ে খারাপ হয়ে গেছে ডোভার। ড্রিংক করে অনেক বেশি। বুশম্যানরা তাকে সাহায্য করে না, তার ছায়া দেখলেও পালায়। এই দুর্গে এসে উঠলাম তার সঙ্গে। একদিন, বোধহয় আমাকে দেখেই আমার সঙ্গে দেখা করতে, কিংবা পানির খোঁজে ঢুকল একজন বুশম্যান। লোকটাকে আমি ভালমত চিনতাম, অনেকবার শিকারে গিয়েছি ওর সঙ্গে। তার কপাল খারাপ, ডোভার তখন ছিল দুর্গে, পাঁড় মাতাল। লোকটাকে ঢুকতে দেখে রক্ত চড়ে গেল মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল তুলে গুলি করে মেরে ফেলল।'

'মেরেই ফেলল!' ভুরু কোঁচকাল কিশোর।

'হ্যাঁ। তারপর যখন ওর হুঁশ হলো, অনেক বকাঝকা করলাম ওকে। টুঁ শব্দ করল না, আমার কথার একটা জবাব দিল না। লাশটার পাশে মাথায় হাত দিয়ে

বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর তাকে কবর দিল। ওপরে বিছিয়ে দিল ইঁট-পাথর, যাতে হায়েনারা তুলে নিয়ে যেতে না পারে। অদ্ভুত এক চরিত্র!'

'হ্যাঁ, দেখেছি কবরটা,' ওমর বলল। 'আমি ভেবেছিলাম, আপনার কবর।'

আগের কথার খেই ধরে বলে গেল বারনার, 'বকাঝকা করেছি, তাতে কিছু মনে করেনি ডোভার। কিন্তু যখন বললাম, এরপর তার সঙ্গে আমি আর থাকছি না, গেল রেগে। ভয় দেখাল, দরকার হলে আমাকেও গুলি করে মারবে। তার ভয় ছিল, আমি গিয়ে পুলিশকে এই খুনের কথা বলে দেব। তার শাসানিতে কান দিলাম না। গিয়ে উঠলাম প্লেনে। এঞ্জিন স্টার্ট দিলাম। আমাকে গুলি করল না বটে সে, তবে প্লেনের ওপর গুলি চালাতে শুরু করল। একটা এয়াররন্ধ্র গেল ভেঙে, সামলাতে পারলাম না, দেয়ালের সঙ্গে ধাক্কা খেলো গিয়ে প্লেন। পা-টা ভাঙলাম তখনই। আমাকে বের করে আনল ডোভার। খুব শান্তভাবে আমার পায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধল। কাঁধে করে বয়ে এনে রাখল এই ঘরে। বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে এসে জানাল, আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে প্লেনটা। আমার বিশ্বাস, ধাক্কা খেয়ে আগুন লাগেনি, লাগলে সঙ্গে সঙ্গেই লাগত। ডোভারই পুড়িয়ে দিয়েছে, যাতে আমি পালাতে না পারি।'

'শুধু পুলিশের ভয়েই আপনাকে আটকে রেখেছে?'

'সেটা অবশ্যই একটা কারণ। তার অনেক কুকর্মের সাক্ষি আমি। মানুষ খুন করেছে। পোচিং করে, খনি থেকে হীরা তুলে নিয়ে গিয়ে বেআইনীভাবে ব্ল্যাকমার্কেটে বিক্রি করে। তবে আসল কারণটা বোধহয় অন্যখানে...'

'আপনাকে ভালবেসে ফেলেছে সে।'

'হ্যাঁ। মাতাল হলে শয়তান হয়ে যায়, কিন্তু সুস্থ অবস্থায় সে আরেক মানুষ। যে বুশম্যানদের দু'চোখে দেখতে পারে না, তাদের একজনের লাশের জন্যেও তার কত মমতা। কবর দিল, হায়েনারা যাতে তুলে নিতে না পারে...'

'হ্যাঁ, মানুষের স্বভাব বড় বিচিত্র! একজনের মধ্যেই যে কত রকম জটিলতা থাকে...'

'ডোভারের ওপর আমি বিরক্ত, ঠিক। তার কাজকর্ম আমার পছন্দ নয়। অনেক খারাপ কাজ সে করে। কিন্তু যা-ই বলুন, আমার বাবা লর্ড উইলিয়াম কলিনসের চেয়ে তাকে অনেক বেশি পছন্দ করি আমি, শ্রদ্ধা করি। কোন মেয়ের সঙ্গে কখনও তাকে সামান্যতম দুর্ব্যবহার করতে দেখিনি।'

'তো, আপনি এখন এখানেই থাকতে চান?'

'মাথা খারাপ। চলে যাব আপনাদের সঙ্গে।'

'চলুন তাহলে। উঠুন। গহনাগুলো কোথায় রেখেছেন?'

দেয়ালের একটা ফোকর দেখিয়ে দিল বারনার।

ফোকরে হাত ঢুকিয়ে ছোট একটা পুঁটুলি বের করে আনল কিশোর। কালো মখমলে বাঁধা।

ওমর আর কিশোরের কাঁধে ভর দিয়ে নিচে নামল বারনার। এইটুকু পরিশ্রমেই হাঁপিয়ে পড়েছে। সিঁড়ির গোড়ায় ভর দিয়ে জিরিয়ে নিল কিছুক্ষণ। তারপর আবার দু'জনের কাঁধে ভর দিয়ে এগোল গেটের দিকে।

একটা ঘরের ভেতর থেকে চত্বরে বেরিয়ে এল ব্রেক ডোভার। মুখে মৃদু হাসি। হাতে রাইফেল। শান্তকণ্ঠে যেন কথার কথা বলল, 'কোথায় যাচ্ছ, জন?'

ষোলো

ডোভারের এই হঠাৎ আবির্ভাবে চমকে গেল তিনজনেই। এল কখন? এদিক ওদিক তাকাল ওমর।

'জীপটা খুঁজছেন তো?' ওমরের মনের কথা পড়ে ফেলল যেন ডোভার। 'আনিনি। ফেলে রেখে পায়ে হেঁটে এসেছি। কাল আমাকে বোঝালেন, চলে গেছেন, যাননি যে খুব ভাল করেই জানতাম। রাতে এসেছিলেন, তা-ও বুঝেছি। আর তার প্রমাণও আছে,' বলতে বলতে পকেট থেকে পেন্সিল টর্চটা বের করে ছুঁড়ে দিল ওমরের দিকে।

খপ করে লুফে নিল ওটা ওমর। 'থ্যাংকস। অন্ধকারে কোথায় যে হারিয়েছিল...যাকগে, মিস্টার বারনারকে উইন্ডহোয়াকে নিয়ে যাচ্ছি আমি। ওঁর পায়ের যা অবস্থা, ডাক্তার দরকার।'

'ডাক্তার দরকার সেটা আপনি ভাবছেন। আমার তা মনে হয় না।'

'আপনি কি আটকাতে চান আমাদের?'

'আরে না না, কি যে বলেন, আপনাদের আটকাব কেন?...উঁহুঁ! উঁহু!' কিশোরের দিকে রাইফেল তুলল ডোভার। 'পিস্তলে হাত দিয়ো না, খোকা। ওটা খুলে আনারও সময় পাবে না...'

ইশারায় কিশোরকে নিষেধ করল ওমর। ডোভারের দিকে ফিরল, 'তা ঠিক। তার আগেই ফুটো করে দেবেন ওর বুক। যা নিশানা আপনার। সেদিন আমাদের প্লেনটাকে গুলি করেছিলেন কেন?'

হাসল ডোভার। 'না, কিছু ভেবে করিনি। ছায়ায় বসে জিরাচ্ছিলাম। সঙ্গে-বোতল যেটা ছিল, শেষ করে ফেলেছি। মেজাজ খারাপ হয়ে আছে। তার ওপর আশেপাশে বুশম্যানগুলোর আনাগোনা টের পাচ্ছিলাম। ওদের একটাকে ধরে পেটাতে পারলে ঠিক হয়ে যেত মেজাজ। তার ওপর বিরক্ত করতে শুরু করলেন আপনারা। মাথার ওপর দিয়ে চক্কর, বিকট আওয়াজ...ভাবলাম, ট্যুরিস্ট। এক আধটা গুলিটুলি করলেই ভয় পেয়ে পালাবেন...সত্যি বলছি, আপনাদেরকে মারার কোন ইচ্ছে ছিল না...'

'সে তো বুঝতেই পেরেছি। তা এখন আটকাচ্ছেন কেন?'

'অনেক কিছু জেনে ফেলেছেন আপনারা, কি করি বলুন...'

সমস্যার সমাধান হয়ে গেল নিতান্ত অযাচিত ভাবেই। টুং করে একটা শব্দ হলো, গিটারের তারে টোকা পড়ল যেন। আঁউক করে উঠল ডোভার, চমকে

উঠল ভীষণভাবে। হাত চলে গেল ঘাড়ের পেছনে। চেঁচিয়ে উঠল, 'ওহ, মাই গড!'

চিতাবাঘটা যে ঘরে বাঁধা ছিল, সে-ঘর থেকে লাফিয়ে বেরোল ছোট্ট একজন মানুষ, পেটটা ঢোলের মত ফোলা। হাতে ধনুক। দৌড় দিল গেটের দিকে।

ঝট করে রাইফেল তুলল ডোভার, তারপর ধীরে ধীরে নামিয়ে নিল আবার। গুলি করল না। অস্ত্রটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, 'আর কোনদিন ওটা দরকার হবে না আমার।'

গেট দিয়ে ছুটে বেরিয়ে চলে গেল বুশম্যান লোকটা।

ডোভারের ঘাড়ে বিঁধেছে ছোট্ট তীর, পেছনটা শুধু বেরিয়ে আছে।

বারনারকে মাটিতে বসিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল ওমর। 'দেখি, খুলে ফেলি।'

আস্তে মাথা নাড়ল ডোভার। 'কেন খামোকা কষ্ট দেবেন? খুলতে গেলে ব্যথা পাব।'

'জলদি চলুন, উইন্ডহোয়াকে নিয়ে যাব আপনাকে। প্লেন তো আছেই...'

'কোন লাভ হবে না।'

'ওখানে ডাক্তার আছে।'

ফ্যাকাসে হয়ে আছে ডোভারের চেহারা। 'বললাম তো, কোন লাভ হবে না,' আশ্চর্য রকম শান্ত ডোভারের কণ্ঠ, অসাধারণ মনোবল লোকটার। 'দুনিয়ার আর কোন ডাক্তারই ভাল করতে পারবে না আমাকে। বুশম্যানদের বিষের কোন অ্যান্টিডোট নেই।'

'কিন্তু তবু...'

'আর কোন কিন্তু নেই। রক্তে ঢুকে গেছে বিষ, টের পাচ্ছি আমি। খুব বেশিক্ষণ লাগবে না। বিষটা তাজা হলে আর বড়জোর এক ঘণ্টা...তবে, উচিত সাজাই হয়েছে আমার, এই-ই হওয়ার কথা ছিল...।' মৃত্যুপথযাত্রী একজন মানুষের এই স্বাভাবিক কথাবার্তা বিস্মিত করল ওমরকে। 'ওদের সঙ্গে যে রকম দুর্ব্যবহার করেছি! এতদিন যে বাঁচিয়ে রেখেছে আমাকে, এটাই বেশি। যে লোকটাকে মেরেছি, ওর দোস্ত ছিল নিশ্চয় এই লোকটা...ওরা কখনও কিছু ভোলে না। ক্ষমা করে না।'

টলতে টলতে গিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল ডোভার। পকেট থেকে ছোট একটা ফ্লাস্ক বের করে মুখ খুলে ভেতরের সবটা হুইস্কি ঢকঢক করে গিলে ফেলল। ছুঁড়ে ফেলে দিল ফ্লাস্কটা। আবার বলল, 'মরা লোকটাকে খুঁজতেই এসেছিল। কাল রাতে কবরটা খুঁড়েছে, শিওর হয়েছে, তারপর থেকেই নিশ্চয় তক্কে তক্কে ছিল...'

'তাহলে আরও আগেই মারল না কেন আপনাকে? অনেক তো সুযোগ পেয়েছে।'

'এর আগে ওদের কাউকে খুন করিনি। শুধু পিটিয়েছি। তার বদলে খাবারও দিয়েছি অনেক, অনেক জানোয়ার শিকার করে দিয়েছি...কিন্তু এইটা নিশ্চয় খুব জেদি ছিল। কে জানে, যেটাকে মেরেছি, হয়তো ভাইই ছিল ওর...'

'আরও সাবধানে থাকা উচিত ছিল আপনার,' ডোভারের পাশে হাঁটু গেড়ে

বসল ওমর। 'দেখি, তীরটা খুলি...'

'বললাম তো, অযথা কষ্ট দেবেন,' হাত নাড়ল ডোভার। 'কত আর সাবধানে থাকব, বলুন? সারাটা জীবনই তো মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করলাম, ভয়ানক শয়তান লোক বলেই বেঁচে থেকেছি এতদিন...আরে, আবারও আ[illegible] তীর খুলছো! আপনি কী, সাহেব? জানেন, এই বিষ হাতি-গণ্ডারকে খতম করে দেয়? যান, সরুন, আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দিন।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও সরে বসল ওমর।

পকেট থেকে চিতার চামড়ার তৈরি ছোট একটা ব্যাগ বের করল ডোভার, তামাক রাখার পাউচের মত। নাড়া দিল। ভেতরে আওয়াজ হলো। বারনারের দিকে ছুঁড়ে দিল সে, 'নাও, রেখে দাও, কাজে লাগবে। হীরা। আমার জীপটা পাবে নদীর ওপারে, নিয়ে নিয়ো। ওটাও তোমাকে দিয়ে গেলাম। আমি যেখানে যাচ্ছি, এগুলো সেখানে আর কোন কাজে লাগবে না আমার।' হাঁপাচ্ছে ডোভার, কপালে ঘাম। রক্ত আরও সরে গেছে মুখ থেকে। 'জন, আমার একটা কথা রেখো। আমাকে এখানেই কবর দিয়ো। পাথর চাপা দিয়ে দিয়ো ওপরে...অন্ধকারে হায়েনারা আসে তো...যদি কখনও দেখতে ইচ্ছে হয়...আমার মত বাজে একটা মানুষকে তোমার মনে পড়ে...চলে এসো...আমি চিরকাল এখানেই অপেক্ষা করব তোমার জন্যে...'

'ওমরভাই!' চেঁচিয়ে উঠল হঠাৎ কিশোর। 'আপনারও মাথা খারাপ হলো নাকি? ও যা বলে বলুক না! ওকে উইন্ডহোয়াকে নিয়ে যেতেই হবে, হাসপাতালে...জলদি করুন।'

সংবিৎ ফিরল যেন ওমরের। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। সে আর কিশোর মিলে প্রায় বয়ে নিয়ে গিয়ে বারনারকে তুলল প্লেনে।

ফিরে এসে দেখল, মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে ডোভার। বেহুঁশ। বয়ে নেয়া ছাড়া উপায় নেই। দু'জনে ধরে তুলে নিল তাকে। ভীষণ ভারি। ধরাধরি করে এনে প্লেনের কেবিনে তুলল অনেক কায়দা কসরত করে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আকাশে উড়ল প্লেন। যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি করছে ওমর। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। পথেই মারা গেল ডোভার।

'শেষ!' সামান্য সময়ের পরিচয়েই ডোভারকে পছন্দ করে ফেলেছিল কিশোর।

'হ্যাঁ,' বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল ওমর। 'ও জানত, বুশম্যানদের তীরের বিষ কি জিনিস! ওর কথা না শুনে অকারণেই চেষ্টা করলাম আমরা।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ কাটল।

উসখুস করছে কিশোর, বারবার তাকাচ্ছে ওমরের দিকে। শেষে বলেই ফেলল, 'ওমরভাই, একটা কথা ভাবছি। এই অ্যাসাইনমেন্টটা আমাদের ফেল করলে হয় না?'

'একেবারে আমার মনের কথাটা বলে ফেলেছ। আমিও ঠিক এটাই ভাবছি। লর্ডকে গিয়ে জিনিসগুলো ফিরিয়ে দেয়ার কথা ভাবতেও খারাপ লাগছে আমার। তা ছাড়া ওগুলো লর্ডেরও নয়, নিনার মায়ের।'

'বারনারের কাছে আছে, ওর কাছেই থাক। বোনকে দিয়ে দেবে।'

'থাক।' বারনারের দিকে ফিরল ওমর, 'দেখুন, আমাদের কথা আপনি শুনেছেন। কথা দিতে হবে...'

'আপনাদের এই বদান্যতার কথা কাউকে কোনদিন বলব না। বলব না, অ্যাসাইনমেন্ট ফেল করেননি আপনারা, এই তো? যান, আপনাদের আলোচনাই শুনিনি আমি। ও-কে!'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল শুধু ওমর।

এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করল প্লেন। ওমর বলল, 'আমি বসছি। জলদি গিয়ে পুলিশকে ফোন করো। অ্যামবুলেন্স আনতে বলো।'

লাশের পাশে বসে আছে বারনার। তার পাশে এসে বসল ওমর।

'অনেকগুলো বছর একসাথে কাটিয়েছি আমরা,' আনমনে বিড়বিড় করল বারনার। 'কত স্মৃতি...' ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল সে।

তার কাঁধে হাত রেখে নীরবে সান্ত্বনা দিল শুধু ওমর। কথা নেই। কি বলবে?

কিশোর এসে প্লেনে ঢোকার কয়েক মিনিট পরই এল পুলিশের গাড়ি। সঙ্গে অ্যামবুলেন্স। গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নামল ডিলার জোনস, একজন পুলিশ সার্জেন্ট আর একজন মেডিক্যাল অফিসার।

প্লেনে ঢুকে ডোভারের ঘাড়ে বেঁধা তীরটা একনজর দেখল জোনস। বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বিড়বিড় করে বলল, 'এ রকমই একটা কিছু ঘটবে, আমি জানতাম!'

দুই দিন পর।

ময়না তদন্ত শেষ করে ডোভারের লাশ ফেরত দিল পুলিশ। সই করে লাশ নিল বারনার। ডোভারের শেষ ইচ্ছে পূরণের জন্যে তাকে কবর দিতে নিয়ে চলল ফোর্ট ওয়ার্জে।

প্লেন চালাচ্ছে ওমর। কিশোর পাশে বসা। বারনার বসে আছে কফিনটার পাশে। সবার পেছনে বসে আছেন একজন পাদ্রী।

দুর্গে পৌঁছে ভাঙা পা নিয়ে কিছু করতে পারল না বারনার, শুধু কফিনটার পাশে বসে চেয়ে চেয়ে দেখল কিশোর আর ওমরের কবর খোঁড়া। কফিন নামানো হলো কবরে। পাদ্রী সাহেব তাঁর কাজ শেষ করলেন।

কবরের ওপর পাথর, ভাঙা ইঁট বিছিয়ে দিতে লাগল কিশোর আর ওমর। এই কাজে তাদেরকে যতটা পারল সাহায্য করতে পারল বারনার। বন্ধুর শেষকৃত্যে কিছুই না করে বসে থাকতে তার ভাল লাগছিল না।

কবর দেয়া শেষ। পশ্চিম দিগন্তে বালির সমুদ্রে ডুব দেয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে লাল টকটকে সূর্য। দূরে কোথাও হেসে উঠল একটা হায়েনা।

'চলুন, যাই,' বারনারের কাঁধে হাত রাখল ওমর।

'হ্যাঁ, চলুন!' ক্রাচে ভর দিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল বারনার।

***